প্রকাশক :
মানবেন্দ্র নাথ পাল
৬, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৯

মুদ্রাকর :
লক্ষ্মীশ্রী প্রেস
১৫।১, ঈশ্বর মিল লেন
কলিকাতা—৬

সূচীপত্র

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

বাঙলা সাহিত্য পরিক্রমা
বাঙলা সাহিত্য প্রবাহ
বাঙলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত
ছন্দ ও অলংকার
অক্ষয় বট (উপন্যাস)
রবীন্দ্র নাট্য প্রসঙ্গ
রবীন্দ্র কাব্যপাঠের ভূমিকা (যন্ত্রস্থ)
সাহিত্য সমীক্ষা (যন্ত্রস্থ)
ঝরা পলাশ (যন্ত্রস্থ)

মীরাকে—

বন্ধুবর শ্রীসুপ্রকাশ রায়ের আগ্রহ ও উৎসাহে বইখানি প্রকাশিত হ'ল। তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। যাঁদের গ্রন্থ থেকে আমি সাহায্য গ্রহণ করেছি—তাঁদেরও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। শ্রীমান মহেন্দ্র নাথ পাল এই গ্রন্থ প্রকাশে যে উৎসাহ দেখিয়েছেন এবং যে কষ্ট স্বীকার করেছেন—তার জন্যে আমি তাঁকে আমার আন্তরিক অভিবাদন জানাই।

প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা, ভোলানাথ ঘোষ

২।৮।৬০

সাহিত্য শিল্প

সাহিত্য প্রসঙ্গে ঃ

প্রাচীন যুগে কাব্য বলতে যা বোঝাত আমরা এখন 'সাহিত্য' কথাটাও সেই অর্থেই ব্যবহার করে থাকি। এই কাব্য বা সাহিত্যের সংজ্ঞা ও উপকরণ নিয়ে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য সেবকরা অনেক আলোচনা করেছেন। কেউ বলেন সাহিত্যের রস অলংকারে, কেউ বলেন রীতিতে, কেউ বলেন ধ্বনিতে—কেউবা বলছেন fact এ নয়—যা ঘটতে পারে এমন কিছুতে—thing's possibleএ—কেউ বা বলছেন 'pleasures of imagination-এ। আচার্য ভরত থেকে আনন্দ বর্ধন, অভিনব গুপ্ত, বিশ্বনাথ ; প্লেটো, আরিস্‌টোটল্‌ থেকে এডিসন, আরনল্‌ড্‌, অস্‌কার ওয়াইল্ড, সুইন্‌বার্ন্‌, কীট্‌স্‌, শেলী, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, ক্রোচ ; মুকুন্দরাম, কাশীরামদাস, আলাওল, বৈষ্ণব মহাজনরা, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ থেকে বর্তমানকাল অবধি নানা রসিক শিল্প ও সাহিত্য সমালোচকরা নানাভাবে সাহিত্যের প্রকৃতি ও মূল্য বিচার করতে প্রয়াস পেয়েছেন। কখনও 'Art for art's sake' মতবাদ fredom of art আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি করছে। কখনও বা 'Art for something else's sake', কখনও 'Art for the people' মতবাদও সামাজিক মনকে নাড়া দিচ্ছে। সাহিত্য-শিল্পে সত্যকে সুন্দর করে প্রকাশ করা—না সুন্দরের সত্যরূপ প্রকাশ করা—এর দ্বন্দ্ব ত লেগেই আছে। আমাদের মনে হয়, সাহিত্যের প্রকৃতি ও মূল্য বিচার এক কথায় হয় না। সাহিত্যে যে সুন্দরের কথা বলা হয় এবং যে সুন্দরকে সাহিত্যের একমাত্র অবলম্বন বলে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছেন—তার প্রতিপক্ষও শুধু আজ নয়—আরও আগেও দেখা দিয়েছে। কেউ সাহিত্যে সুন্দরের সুমহান প্রকাশের কথা বলেছেন, কেউ বা সাহিত্যে বাস্তবের যথাযথ রূপাঙ্কনের কথাও বলেছেন।

স্থূলভাবে সাহিত্য কথাটির অর্থ শুধু কাব্য, গল্প-উপন্যাস, নাটক প্রবন্ধেই সীমাবদ্ধ থাকে না—দর্শন প্রভৃতি প্রায় সবকিছুই এর কোঠায় এসে পড়ে। এক কথায় মানুষের চিন্তা-ভাবনা, স্বপ্ন-কল্পনা, বিচিত্র অনুভূতির বাঙ্ময় প্রকাশই সাহিত্য। এর মধ্যে জ্ঞানের অংশটি বিশেষ একটি অর্থকে প্রকাশ করেই তার দায়িত্ব শেষ করে, কিন্তু রসানুভূতির অংশটিই মানুষের মনে নিত্যকাল প্রশ্ন তথা তৃষ্ণা জাগিয়ে রাখে। ইংরেজিতে যাকে Literature of knowledge বলা হয় সেটিই এই জ্ঞানের অংশ—অন্যটিকে আমরা Literature of power বলতে পারি। তবুও এতেও যেন সবটা বলা হ'ল না। কারণ এ কথা ত সত্য যে বুদ্ধি ও জ্ঞানের ভেতর দিয়ে সমগ্র বিশ্বরহস্য এবং মানবজীবন রহস্য এখনও সম্পূর্ণ ভাবে জানা যায় নি। আবার এও সত্য যে বুদ্ধি ও জ্ঞানের সীমায় আবদ্ধ থাকার জন্যেই ত বিশ্বরহস্য থেমে নেই। নবকিশলয় কবির কাছে যে বারতা বহন করে আনে—উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিদের কাছে সেই বাণীই নিশ্চয় সে বহন করে আনে না। একটির মধ্যে আছে সৌন্দর্যানুভূতি—আর একটির মধ্যে রয়েছে জ্ঞানলাভের সুস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা। বস্তুকে আমরা জ্ঞান, বুদ্ধি এবং হৃদয়ানুভূতির দ্বারাই জানি। এই সবটুকু দিয়ে জানাই যথার্থ জানা। যে ভাবটুকু রয়েছে রূপের মধ্যে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে—অন্যদিকে যে পুতুল রয়েছে তাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করে তাকে প্রতিমা করেও গড়ে তুলতে হবে।

সাহিত্যে Man এবং Moment দু'টিই প্রতিফলিত হয়—এ কথাটি ম্যাথ্যু আর্নল্ড্ যখন বললেন, তখন শিল্পে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব ও যুগধর্ম দুটিই সাহিত্যে অনিবার্যভাবে প্রকাশ পাবে—এ ধরনের একটি আলোড়ন দেখা দিয়েছে। বলতে গেলেই আর্নলড্ থেকেই সাহিত্যে সমাজ-জীবনের স্বীকৃতি একটি বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যপূর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। বিশ্লেষণাত্মক মনোভাব গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই চোখ বুজে সবকিছুকে আর স্বীকার করে নেওয়া হবেনা—এই ভাবটিও শিল্পবিচারের ক্ষেত্রে অভিনব। আরনল্ড্ শিল্পকে মূলত Criticism of life বলেছেন এবং তাঁর মতে শিল্পীর যথার্থ পরিচয় হচ্ছে powerful and beautiful applications of ideas to life—to the question how to liveএ। আমাদের দেশের প্রাচীন রসবেত্তা যে 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'-এর কথা বলেছিলেন তাতে আনন্দদানই যে সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—তা খুবই সত্য কথা। বর্তমান যুগে শুধু এই রসাস্বাদনে আধুনিক মন সন্তুষ্ট হতে চায় না। শুধু পথচলার আনন্দে মেতে থাকলে চলবে না পথের

পরিচয়ও জানতে হবে—জানাতে হবে। সাহিত্য সমাজ-নিরপেক্ষ হবে না—সমাজের চাহিদা তাকেই মেটাতে হবে।

সাহিত্যের সঙ্গে মানব জীবন ও মানব সমাজের যোগ অবিচ্ছেদ্য। রসই বলি আর অলঙ্কারই বলি—তাকে মানুষ ছাড়া উপভোগ আর কে করবে? তবু এই সাহিত্য সম্বন্ধেও মানুষের জীবনে নানা জিজ্ঞাসা জাগে এবং এইরকম জিজ্ঞাসার উত্তরও সাহিত্যকে দিতে হয়। সাহিত্য যেমন শিল্পীর ভাবনা-ধারণার সার্থক প্রকাশ, তেমনই সমষ্টির জিজ্ঞাসা-ভাবনা-ধারণারও সার্থক প্রকাশ। সমষ্টির জিজ্ঞাসা—শিল্পীর জিজ্ঞাসা হয়ে ওঠে। একটি মনের ভালো-মন্দ বিচারের ওপর যেমন সমাজের ভালোমন্দের মান-নির্ধারিত হয় না—হতে পারে না—তেমনই একটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা দিয়ে কখনও সমগ্র সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার মানও নির্ধারিত হয় না। ক্ষুদ্র মানুষের অবাধ-উচ্ছৃঙ্খল ভাব-কল্পনার পথে সমাজ বহু বিধিনিষেধের প্রাচীর গড়ে তুলেছে। সেটা লঙ্ঘন করতে গেলেই অসংযম, অসৌন্দর্য, কুশ্রীতা বেড়ে ওঠে। আমাদের সমাজে এবং শিল্পে যে নীতি বোধ দেখা দিয়েছে তার মূলে সামাজিক মনের সংযত বুদ্ধির পরিচয় রয়েছে।

কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই খবরদারী কতখানি দরকার। কেউ বলেন, সাহিত্যক্ষেত্রে এই নীতিবোধ ততটা প্রয়োজনীয় নয়। সাহিত্যে সমাজ ও জীবন অবিচ্ছেদ্যভাবে থাকলেও সাহিত্য ত শুধু তারই অনুকৃতি নয়। যদি স্বীকার করি সাহিত্য সমাজ ও জীবনকে কেন্দ্র করে রসসৃষ্টির আবেগে তাদেরও ছাড়িয়ে যায়—তা হ'লে একথা মানতেই হয় যে, সামাজিক নীতি-বোধ দিয়ে সাহিত্যকে বাস্তব সীমায় বন্দী করে রাখাও বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ বাস্তব সত্য ও সাহিত্য সত্য যে এক নয় এবং সাহিত্য সত্য যে বস্তু ও ভাবের কল্যাণ মিশ্রণে এক অভিনব সৃষ্টি এ কথা পুরানো দিন থেকেই অনেকবার বলা হয়েছে। সমাজের একটা প্রভাব থাকলেও শিল্পী যদি কেবল সমাজের শাসনের গণ্ডীতে নিজেকে আবদ্ধ রেখে রসসৃষ্টির প্রয়াস পান তা হ'লে সাহিত্য সেখানে কেবল সমাজ-খাঁচায় আবদ্ধ হয়ে উন্মুক্ত আকাশে ডানা মেলে ওড়ার আকুল-প্রয়াসী পাখীর মতো মাথা খুঁড়ে মরবে।

এই জন্যই কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছিলেন, সাহিত্যের আদর্শ ও সামাজিক রীতিনীতির আদর্শের মধ্যে সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্য অনেকখানি। সামাজিক রীতিনীতি সব সময় এক থাকে না। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই

সব রীতিনীতির পরিবর্তন আসতে বাধ্য। সমাজের এই নিত্য পরিবর্তনশীল রীতিনীতির আদর্শকে সাহিত্য সব সময় অনুসরণ করে চলে না। সার্থক শিল্প নীতি-বোধের অনেক উর্ধ্বে। সেখানে ভালোর মহিমা প্রচার করাও হয় না— আবার যা ভালো নয় তাকেও বড়ো করে দেখানো হয় না। মানব জীবনের ভালোমন্দ সুখ-দুঃখ, আঘাত-সংঘাতের রসরূপ সৃষ্টিই তার একমাত্র লক্ষ্য।

কিন্তু এত সব বলা সত্ত্বেও আমরা ত আর্টকে সমাজ-নিরপেক্ষ আর্ট হিসাবে বিচার করি না। আর্টকে কি আমরা সমাজের প্রয়োজনেও ব্যবহার করি না? সাহিত্য সমাজের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি হোক—এও ত আমরা চাই! সমাজের অন্যায় দুর্বল দিকটাও সাহিত্যে প্রতিফলিত হোক—সমাজের জীর্ণ, দীর্ণ সংস্কারের বিরুদ্ধে সাহিত্যে বিদ্রোহের সুর জেগে উঠুক—এও যে কামনা করিনা তাও ত নয়! সাহিত্যের আলোচনার ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রশ্ন এবং মতানৈক্য থেকে বিভিন্ন মতবাদেরও সৃষ্টি হয়েছিল। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে আদর্শবাদ ও বস্তুবাদের দ্বন্দ্ব। আদর্শবাদের মধ্যে সমাজের ভালোমন্দের কথা এবং কোনটা ভালো কোনটা গ্রহণীয় তার কথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে—আর বস্তুবাদে চিরাচরিত সামাজিক সংস্কারের বিরুদ্ধে একটা প্রতিকূল মনোভাব প্রকাশ পায়। আমাদের মনে হয়, এর কোনটাই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। আদর্শ-বাদের মধ্যে যে সমাজকল্যাণ, সমাজনীতির স্বীকৃতি রয়েছে তার মধ্যে এমনিতে বিরোধ ঘটার মতো কোন কারণই খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু শিল্পী শিল্প-রচনার সময় যদি শুধু কল্যাণ ধর্ম সম্বন্ধে অতি-সচেতন হয়ে ওঠেন, তা হ'লে সার্থক শিল্প রচিত হতে পারে না। শিল্পরসটুকু বজায় রেখে শিল্পী যদি সমাজের কল্যাণ-সাধনের আগ্রহকেও দক্ষ রূপকারের মতো রূপায়িত করতে পারেন তবেই শিল্পে সুন্দরের সার্থক প্রকাশ ঘটবে। শিল্প রচনা করতে বসে যদি নীতিজ্ঞানের অতিরিক্ততা দেখা দেয় তাহলে তা অতিরিক্ত মাত্রায় প্রচারধর্মী হয়ে উঠবে। সাহিত্যে যে প্রচার একেবারেই থাকবে না বা থাকতে পারে না তা কখনও বলি না। তবে শিল্পকে গৌণ করে দিয়ে যদি কেবল নীতিই সর্বস্ব হয়ে ওঠে তাহলে আর্টের অপমৃত্যু অনিবার্য।

যাঁরা বস্তুতন্ত্রবাদী তাঁরা নীতিবোধ, সমাজ কল্যাণসাধন প্রভৃতি মনোভাব-গুলিকে ততটা আমল দেন না। তাঁরা বাস্তবতা বলতে অনেক সময় নগ্ন বাস্তব ও কুৎসিত মনোবিকৃতিকে স্বীকার করেন। সাহিত্যে রসের শেষে আর কিছু নেই—নীতিবোধ বা সমাজ কল্যাণের প্রশ্ন—প্রশ্নই নয়। সাহিত্য যেমন

রসসৃষ্টি হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে রূপসৃষ্টিও যে হচ্ছে এ কথা কেউ অস্বীকার করবে না। বস্তুকে এড়িয়ে রসসৃষ্টি যে হয় না এটা সবাই বুঝতে পারে। কিন্তু এই রূপরস সৃষ্টির নাম ক'রে বিভীষিকা সৃষ্টি নিশ্চয় বস্তুতন্ত্রবাদের ফল কথা নয়।

বস্তুর বোঝা—বোঝাই শুধু—বিশেষ করে যদি তা জীবনের রসবোধের পরিপন্থী হয়। বস্তুকে সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর করে প্রকাশ করাকে এবং সমাজ-নীতির পরিপন্থী নয় এমন উপাদানে গঠিত সাহিত্যকে আমাদের অকুণ্ঠায় গ্রহণ করতে বাধা নেই। শুধু বিকৃতি দিয়ে, নগ্ন বাস্তবতা দিয়ে বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য গড়ে উঠতে পারে এমন কথা যথার্থ সাহিত্য পাঠক বা রসিক কখনও বলবেন না। পৃথিবীর সাহিত্যে বিকৃতি, বিভীষিকা প্রভৃতি স্থূলভাব কোথাও বেশিদিনের জন্য স্বতন্ত্র আসন লাভ করতে পারেনি। সমাজ-বিরোধী কোনো কথা বা মানুষের আদিম প্রবৃত্তির কোনো কথা যদি কেউ শিল্পী-জনোচিত মন নিয়ে রচনা করেন তা হলে আপাতদৃষ্টিতে যে সব বিষয়বস্তু অশ্লীল বা অসুন্দর বলে মনে হয় তাকেও সুন্দর করে ব্যক্ত করা যায়। শিল্পীর রচনায় যথার্থ রূপের অতিরিক্ত কিছুও থাকে। এই অতিরিক্ত অংশই তার রচনাকে প্রমূর্ত করে তোলে। তাই মনে হয় সাহিত্যে ব্যক্তিও আছে, বস্তুও আছে, কিন্তু শুদ্ধ বাস্তববাদ বলে তেমন কিছু নেই। যতখানি আছে বলে মনে হয় তা আদর্শবাদ ও বস্তুবাদের মিলিত রূপ। নীতিগত আদর্শবাদ অথবা অবাস্তব আদর্শবাদ সমাজে যেমন অচল—তেমনি উগ্র বাস্তববাদ বা ফরাসী বিদ্রোহের ব্যর্থতার পর ফরাসী দেশে যা দেখা দিয়েছিল—সেই sense of fact (নগ্নবাস্তব)-মনোভাবও অচল।

সাহিত্য চিরন্তন জীবন-সত্যের সুন্দর প্রকাশ ঘটায়। উল্লিখিত উভয় মতবাদের উগ্রতা সাহিত্য-নীতি ও সাহিত্য-ধর্মকে যথাযথভাবে অনুসরণ করে না। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের কথা উল্লেখ করে দেখানো যায়। অনেকের মতে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে অতিরিক্ত মাত্রায় প্রচার কার্য চালিয়েছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই সাহিত্যে 'অতিরিক্ত কিছুর' কথাও বলেছেন। তাঁর রচনার মধ্যে প্রচারের আভাস থাকা অস্বাভাবিক নয়। হাতে ধরে যেখানে জাতিকে শেখাতে হচ্ছে সেখানে একটু প্রচারকার্য চলবেই। রবীন্দ্রনাথের রচনায় রূপরস সমানতালে চলেছে। রস পরিবেষনের আড়ালে কবির একটি বিশেষ বক্তব্য রয়েছে। কিন্তু কলানৈপুণ্যে, প্রকাশ ভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যে

সেই বক্তব্যবিশেষ গীতিধর্মকে ছাড়িয়ে গিয়ে শুধু শুষ্ক তত্ত্বরূপ লাভ করেনি। শরৎচন্দ্রের রচনায়ও প্রচারের দিক রয়েছে। কিন্তু সাহিত্যে তিনি যখন সমাজ-নীতির ঊর্ধ্বে প্রাণের গৌরবকে প্রতিষ্ঠা করতে গেছেন তখনই তার শিল্প-রচনার বাস্তবের ভিত্তিভূমির ওপর সত্য-সুন্দর রূপলাভ করেছে। একটি উদার ও সংস্কার-মুক্ত মন নিয়ে, যথার্থ শিল্পীর দৃষ্টি দিয়ে তিনি সমাজ ও সংসারকে রূপায়িত করে তুলেছেন। বাস্তবে-আদর্শে মিলে তাঁর রচনা একটি নতুন রসরূপ লাভ করেছে। রসোত্তীর্ণ সাহিত্য যুগকে অতিক্রম করে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। সেই সাহিত্য মানব মনের পরিচয় লিপি বহন করে। মানুষ ও তার সমাজকে বাদ দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়। এই মানুষের আদর্শের সঙ্গে সুন্দরের একটি অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। সাহিত্য যখন সমাজ-জীবনকে সেই সুন্দরের আদর্শে তুলে ধরতে পারে তখনই তাকে আমরা সার্থক সৃষ্টি বলে স্বীকার করে নিই।

আর্ট—যে হেতু সমাজ-নিরপেক্ষ নয়—তার প্রকাশে সামাজিক, আর্থ-নীতিক, রাষ্ট্রনীতিক পরিবেশের একটি প্রভাব এসে পড়ে। কিন্তু যখন মহৎ প্রেরণায় এই পরিবেশ সত্য-সুন্দরের মধুর স্পর্শে সাহিত্যে নিত্যতা লাভ করে, তখন সে আর দেশকালের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখে না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিখ্যাত রচনার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। সুন্দর সত্য সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে আর্টকে আরও ব্যাপক করে তোলে। তখন আর বিশেষ দেশ, বিশেষ কাল, বিশেষ দেশ-কালের মানুষের আর্ট নয়—সর্বকালের সর্ব-মানবের আর্টরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিংশ শতাব্দী থেকে সাহিত্যকে কোনো কোনো দেশে প্রয়োজন সাধনের অস্ত্রস্বরূপও ব্যবহার করা হচ্ছে। রাষ্ট্রের প্রয়োজনানুসারে সৃষ্ট সাহিত্য সর্বকালীন সাহিত্য মর্যাদা লাভ করতে পারে না। প্রয়োজন সিদ্ধ হ'লেই সাহিত্যের প্রয়োজনও কমে আসে। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনেরও পরিবর্তন ঘটছে। কাজেই প্রয়োজন সাধনের অস্ত্র যে সাহিত্য—তার মেয়াদও রাষ্ট্রের একটা প্ল্যান বা পরিকল্পনার মেয়াদের সঙ্গে বাঁধা। সাহিত্য রাষ্ট্রকে পথ দেখাবে—মানুষকে পথ দেখাবে। মানুষ যে পথ ধরে চলেছে সে পথের স্বরূপ এবং তার যে পথে চলা শ্রেয়ঃ সে পথের সন্ধান দেবে সাহিত্য। Fact বা Real as it is নয়—as it ought to be বা should be-ই সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। কেউ বলবেন যে সেখানেও ত প্রয়োজন সাধনের কথা এসে পড়েছে। কিন্তু এই প্রয়োজন একটা

বিশেষ কালে এসে থামেনা। ইতিহাস ভূগোলের তথ্য পরিবেশন নয়—সমাজ জীবনকে রসপুষ্ট করে নিত্যকালের যাত্রা পথে সুন্দরের অনুসন্ধানে এগিয়ে দেওয়াই সাহিত্যের প্রধান কাজ।

তার পরেই আমাদের জীবনে প্রশ্ন জাগে সুন্দরের সন্ধানে যে সাহিত্য মানুষকে পথ চলার আবেগটুকু এনে দেবে—সেই সাহিত্যের স্বরূপ কি—কি তার বৈশিষ্ট্য? সে কি একেবারে মাটির পৃথিবীর বাইরে অজানার অভিসারে 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা' বলে শুধু এগিয়ে যাবে- না আকাশ ও মৃত্তিকার মধ্যে একটি মিলনের সেতু নির্মাণ করবে! এই প্রশ্নের আর শেষ নেই এবং এই প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টারও অন্ত নেই।

প্রাচীন যুগ থেকেই সাহিত্য সম্বন্ধে মানুষের একটা কৌতূহল জেগে উঠেছে। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যত দৃষ্টি-পরিবর্তন হচ্ছে ততই প্রশ্ন জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে। শুধু সাহিত্য কেন—বিশ্বভূবনের রহস্য-ময়তা—তার নানা বৈচিত্র্য, মানুষের মনে জানার ইচ্ছাকে ক্রমশ বাড়িয়ে তোলে। বিশ্ব প্রকৃতির আলো অন্ধকার, প্রতিদিনের অপরূপতার বৈচিত্র্য যেমন আমাদের 'আরও আরও'র জন্য অধীর ক'রে তোলে, ঠিক তেমনি মানব জীবনে জগৎ ও জীবন, ধর্মবোধ প্রভৃতি সবকিছু মিলে মানুষের অদম্য পিপাসাকে জাগিয়ে তোলে। সে জানতে চায়, বুঝতে চায়, যা অনুভব করে তাকে প্রকাশ করার আকুলতা তাকে পেয়ে বসে। শিল্পী তাকে রূপ দিতে প্রয়াস পান তাঁর চিত্রে; অধ্যাত্মচেতনা মানুষকে করে তোলে অনাসক্ত সন্ন্যাসী,—জীবন-জিজ্ঞাসার—জীবনের নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে সে কেবল তার সমাধান খুঁজে বেড়ায়। মানুষের ঔৎসুক্যই এই সব কিছুর মূলে রয়েছে। সাহিত্যেও এই ঔৎসুক্যেরই সার্থক প্রকাশ।

জগতের যে লীলারহস্যের কথা আমরা বলি, তা যেমন আমাদের মনে কৌতূহলের সৃষ্টি করে—তেমনি সাহিত্যের জগতেও অনুরূপ কৌতূহলই কাজ করে যাচ্ছে। সৃষ্টির মধুর লীলা অনুভব ক'রে তাকে আরও সুস্পষ্টভাবে জানবার জন্যে বারবার আকুলকণ্ঠে মানুষ বলে 'হে সুন্দর, তোমায় যতখানি দেখতে পাই তার চেয়ে আরও বেশী ক'রে তুমি আমার কাছে প্রকাশিত হও—তোমার সত্যরূপ আমার দিদৃক্ষাকে সার্থক করে তুলুক।' মানব জীবন-

রহস্যের কাছেও আমরা অনুরূপ আকুল আবেদন তুলে ধরি। এই আকুলতাই কাব্য-সঙ্গীত প্রভৃতির ভিতর দিয়ে সার্থকতা লাভের পথে এগিয়ে যায়।

আমরা নানা ভাবে, নানা উপায় উপকরণে সাহিত্য বিষয়ক প্রশ্নের একটা মীমাংসায় আসতে চাই। জীবনের আকুলতার যে প্রতিফলন সাহিত্যে দেখতে পাই—সেই সাহিত্য সম্বন্ধেও আমাদের মনে বহুকাল ধরে প্রশ্ন জেগেছে। ভাব প্রকাশের বাহন এই যে সাহিত্য—তার প্রকৃত স্বরূপ ও সংজ্ঞা কি? আজও পর্যন্ত এক কথায় সাহিত্যের স্বরূপ ও সংজ্ঞা কি—তা নির্দিষ্ট হয়নি। অর্থাৎ সাহিত্য কোনো একটি বিশেষ নিয়মের দ্বারা পরিচালিত নয়। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সাহিত্যিক বা শিল্পরসিক যুগধর্ম ও যুগের রুচি অনুযায়ী সাহিত্যশিল্পকে গড়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন এবং সে দিক থেকে বিচার করে যুগোপযোগী সংজ্ঞা নিরূপণ করতেও চেষ্টা করেছেন।

এরই পাশাপাশি রয়েছে সাহিত্য সম্বন্ধে নানা মতবাদ বা মতাদর্শের ভীড়। বিভিন্ন মতের ভিতর থেকে সাহিত্যের একটি স্থায়ী সংজ্ঞা আমরা নিরূপণ করতে চেষ্টা করি। এ শুধু ভারতীয় সাহিত্যের দিক থেকে বলা যে হচ্ছে তা নয়—পৃথিবীর সকল দেশের সকল সাহিত্যেরই গোড়া থেকেই তার স্বরূপ ও সংজ্ঞা নির্ণয় করার চেষ্টা চলেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মনীষীরা এ বিষয়ে নানাভাবে আলোচনা ক'রে সাহিত্যের সত্যরূপটি সম্পূর্ণভাবে অনুভব করবার—জানবার চেষ্টা করেছেন। সব আলোচনার মূলেই দেখি একটি অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের চিরন্তন প্রতিষ্ঠাই সবার ফল কথা।

মানব জীবনের অপূর্ণতাই বারবার সম্পূর্ণতার ওপরে নিজের অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য দুর্জয় বেগে ছুটে চলেছে। কিন্তু এই সম্পূর্ণতাকে নিজের করে নেবার আকাঙ্ক্ষাও ত মানুষের! তাই মানুষের জীবনটাই সাহিত্যের মুখ্য অবলম্বন হয়ে উঠেছে। মানব জীবনের সৌন্দর্যানুভূতির উৎকণ্ঠাই সাহিত্যের রূপ লাভ করে। মানুষের রসপিপাসা একমাত্র প্রকাশের মাধ্যমেই নিবৃত্ত হতে চায়। সাহিত্যেই মানুষের প্রকাশ ঘটে—সুদূরের পিয়াসী মানুষের আঘাত-সংঘাতপূর্ণ জীবনের সুন্দর ও সার্থক প্রকাশের বাহন—এই সাহিত্য।

রচয়িতার উপর রচনার ভার থাকে। রচয়িতাই বলি আর সাহিত্যিকই বলি—তিনিই প্রকৃত শিল্পী। সৃষ্টিতেই শিল্পীর প্রতিভার যথার্থ বিকাশ ঘটে। সৃষ্টির মধ্যে দুটি ব্যাপার আমরা লক্ষ্য করি, একটি প্রয়োজনের দিক—অন্যটি

আনন্দের দিক। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনের তাগিদে যে সৃষ্টি তাতে আরাম থাকতে পারে—কিন্তু আনন্দ নেই। এখানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একটি কথা মনে পড়ে। তিনি বলছেন—'মন যাহা গড়িয়া তোলে তাহা নিজের আবশ্যকের জন্য। সাহিত্য যাহা গড়িয়া তোলে তাহা সকলের আনন্দের জন্য।' সাহিত্য মানবজীবনের সুখদুঃখের প্রকৃত রূপালেখ্য। বিধাতার গড়া রহস্যের আবরণ খোলার—তার রহস্যময় পর্দাটি তোলার ভার যথার্থ শিল্পীর হাতেই ন্যস্ত থাকে।

শিল্পের ক্ষেত্রও ছোট নয়। পৃথিবীর যতরকম শিল্পধারা রয়েছে, সাহিত্য তার শুধু অন্যতম নয়—সর্বোত্তম ধারাও বটে। শিল্পী যুগপৎ রূপ দ্রষ্টা ও স্রষ্টা। শিল্পীর সৃষ্টিও তাই সজীব ও রূপবান। সাহিত্য রূপকারের প্রাণ দিয়ে গড়া আলেখ্য। এই সাহিত্যকে সত্য সুন্দরের বাঙ্ময় প্রকাশও বলা হয়। একদিকে অনন্ত সৌন্দর্যের রহস্যমধুর প্রকাশের বাহন -- অন্যদিকে তেমনি মানব জীবনের নানা অনুভূতির বাহনও বটে। শিল্পীমন যা দেখলো, যা অনুভব করলো, যা তার জীবনে আরও-জানার কৌতূহলকে জাগিয়ে তুললো তাকেই সে ভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন সাহিত্য-রূপকল্পের ভেতর দিয়ে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে। যা অনির্বচনীয় ছিল তারই বাচনিক প্রকাশটি সাহিত্যরূপ লাভ করে। কিন্তু তার মধ্যে মানবজীবনের অভিজ্ঞতার দিকটি থাকতে হবে। শুধু বাক্সর্বস্ব হলে চলবে না। হাড্‌সন সাহিত্য পাঠের ভূমিকার গোড়াতেই বলেছেন, 'Literature is a vital record of what men have seen in life, what they have experienced of it, what they have thought and felt about those aspects of it, which have the most immediate and enduring interest for all of us. It is thus, fundamentally an expression of life through the medium of language'.

সাহিত্য-মীমাংসার ধারায় কাব্য ও সাহিত্য একই অর্থে প্রযুক্ত হয়। প্রাচীন দিনে কাব্য বলতে সাহিত্যকেই বোঝাত। এই সাহিত্যের স্বরূপ ও সংজ্ঞা নির্ধারণের সযত্ন প্রচেষ্টা প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জগতে সাহিত্যের রস ও অলঙ্কার শাস্ত্র গড়ে উঠেছে। সাহিত্য রসবেত্তারা কখনও শব্দার্থ, কখনও রীতি (style), কখনও বাহ্য অলঙ্কার, কখনও ধ্বনি, কখনও রসাত্মক বাক্য, কখনও Imitation, কখনও Imagination,

কখনও criticism of life, কখনও human passion and human hopes-এর রূপায়ন, কখনও beautiful truth-এর প্রকাশকে সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে ঘোষণা করেছেন। এখানে আমরা তারই আলোচনা করব। তবে এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন। আমরা যে রসের কথা বলেছি, এই রস কি—তাও কেউ এক কথায় বলেন নি। যা আমাদের স্থূল দৃষ্টিকে এড়িয়ে যায়—তাই আমাদের ভাব দৃষ্টির কাছে অপরূপতা লাভ করে, এবং তা-ই রসের ধারার সঙ্গে আমাদের নিবিড় যোগ ঘটায়। বাক্যকে রসায়িত করে তোলার পরেই তা কাব্যরূপ লাভ করে। সাধারণকে ঠিক সাধারণ ক'রে নয়—তাকে অসাধারণ ও চমৎকার করে প্রকাশ করাই কবির কাব্য সাধনা তথা সাহিত্য সাধনার ফল কথা। বিভিন্নদেশের প্রাচীন মনীষীরা ভাবদীপ্ত বস্তুসত্তার বিস্ময়কর রূপ-প্রকাশকে রসরূপ বলে অভিহিত করেছেন। যা কোথাও নেই বা ছিলনা, কবি কল্পনায় তাকেই রূপায়িত করে তোলে। প্রয়োজনের পৃথিবীর উর্ধ্বে এই সুন্দরের অবস্থিতি—গভীর আনন্দের যোগে মানুষ তাকে অনুভব করে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যখন বলেন—

The gleam,
The light that never was on sea or land,
The Consecration, and the Poet's dream.—

তখন তিনি সাহিত্যের রসরূপকে লক্ষ্য করেই বলেন।

শেলী কাব্যসৌন্দর্যের অসীমতার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন :—

All high poetry is infinite ; it is as the first acorn, which contained all oaks potentially. Veil after veil may be undrawn, and the inmost naked beauty of the meaning never exposed. A great poem is a fountain for ever over-flowing with the waters of wisdom and delight; and after one person and one age has exhausted all its divine influence which their peculiar relations enable them to share, another and yet another succeeds, and new relations are ever developed, the source of an unforeseen and unconceived delight.

এই unconceived delight-কে প্রকাশ করার আকুলতা মহান্ সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। আনন্দদান সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য। এই সাহিত্য দু'ভাবে

আমাদের আনন্দ দান করে। রবীন্দ্রনাথের মতে 'এক, সে সত্যকে মনোহর রূপে আমাদিগকে দেখায়; আর, সে সত্যকে আমাদের গোচর করিয়া দেয়।'

এ ত গেল সাহিত্য সম্বন্ধে প্রাচীন কাল থেকে যে মতটি চলে আসছে তার কথা। বর্তমান দিনে মানুষ সাহিত্যের শুদ্ধ রসবস্তুকে নিয়ে আর সন্তুষ্ট থাকতে চায় না। বর্তমান দিনে সাহিত্যের heavenly delight, delightful calm, beautiful imagination 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য,' 'বক্রোক্তি কাব্য-জীবিতম্', 'কাব্যস্যাত্মাধ্বনিরিতি', প্রভৃতি গুণলক্ষণকে 'এহ বাহ্য' বলে অভিহিত করে 'আর কহ' বলে আগামীর দিকে তাকিয়ে আছি। যুগের ক্রমপরিবর্তনের সঙ্গে সাহিত্য বিচারের দৃষ্টিভঙ্গিও পরিবর্তিত হবে। কিন্তু এটা ঠিক যে সাহিত্য বিচারের মূল লক্ষ্যটির বিশেষ কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় নি। কথাটা যতই ভাববিলাসীর উক্তির মতো শোনাক না কেন—'সাহিত্যের মূল লক্ষ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি এবং অনির্বচনীয়কে, মানব জীবনের নানা অনুভূতিকে সুন্দর করে প্রকাশ করাও সাহিত্যের অন্যতম কাজ'—এই কথাটি আমরা কখনও অস্বীকার করতে পারিনা। শুধু প্রশ্ন আসে তখনই যখন দেখি সাহিত্য বলে যা রচিত হচ্ছে তা মানুষের জীবনের সমগ্রানুভূতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে পড়ে থাকছে। কারণ যে সাহিত্য সমাজকে সামনের পথে চালিয়ে নেবে তার সঙ্গে মানবাত্মার নিবিড় সম্পর্কটুকু না থাকলে এই দু'য়ের অপরিচয়ে ব্যবধান কেবল বেড়েই চলবে।

মানবজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত এই সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সাহিত্য কাকে বলে—যথার্থ সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য কি—রসোত্তীর্ণ সাহিত্য বলতে কি বোঝায়—মানব জীবনের সঙ্গে সাহিত্য কতখানি নিবিড় আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধা—তা নিয়ে বিভিন্ন আচার্যদের মতের আলোচনা করলে দেখা যাবে একটি মত বারবার তাঁদের আলোচনার মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে—তা এই, 'যে সৌন্দর্য, যে প্রেম, যে মহত্ত্বে মানুষ চিরদিন স্বভাবতঃই উদ্বোধিত হয়েছে, তার তো বয়সের সীমা নেই;…সাহিত্য সর্বদেশেই প্রমান করে আসছে যে, মানুষের আনন্দ নিকেতন চিরপুরাতন। কালিদাসের মেঘদূতে মানুষ আপন চিরপুরাতন বিরহ বেদনারই স্বাদ পেয়ে আনন্দিত। সেই চিরপুরাতনের চিরনূতনত্ব বহন করছে মানুষের সাহিত্য, মানুষের শিল্পকলা। (সাহিত্যের স্বরূপ—রবীন্দ্রনাথ)। সাহিত্যও যেন

Arnold এর The Youth of Nature কবিতার Nature-এর মতো মানুষের উদ্দেশ্য বলে—

Race after race, man after man,
Have thought that my secret was theirs,
Have dream'd that I lived but for them,
That they were my glory and joy.
They are dust, they are changed, they are gone!
I remain.

সাহিত্য বলতে কি বোঝায় তার স্বরূপ কি এই নিয়ে নানা দেশে নানা কালে নানা মত গড়ে উঠেছে। পাশ্চাত্ত্যের শিল্পদৃষ্টি ও প্রাচ্যের শিল্পদৃষ্টির পার্থক্য যতই থাকনা কেন—সাহিত্যের আনন্দদানের কথা সবাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবেই স্বীকার করেছেন। সাহিত্য জীবন দর্পণ; জীবনের অনুকরণ—সাহিত্যের আত্মা রীতি, রস ইত্যাদি—অনেকদিন ধরেই এই মতগুলি প্রচলিত ও সুপ্রচারিত।

প্রাচীন কালে 'সাহিত্য' কথাটির পরিবর্তে 'কাব্য' কথাটাই আমাদের দেশে ব্যবহৃত হতো, তেমনই পাশ্চাত্ত্যেও Poetry কথাটির প্রচলন ছিল। সাহিত্যের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিয়েও অনেক আলোচনা হয়েছে। সহিতত্ব থেকে সাহিত্য শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে, এই কথাটি এখন সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু প্রশ্ন উঠল কার সহিতত্ব? সাহিত্য কি? তার লক্ষ্য কি? আমাদের দেশে সাহিত্য বিচারে পাশ্চাত্ত্য মতের ওপরই বেশি নির্ভর করা হয়। পাশ্চাত্ত্য মত যে অগ্রাহ্য তা বলা হচ্ছে না—কিন্তু ভারতবর্ষেও যে কাব্যশাস্ত্রের সংজ্ঞার্থ ও স্বরূপ সম্বন্ধে প্রাচীন দিনে নানা সুনিশ্চিত মত গড়ে উঠেছিল সে সম্বন্ধেও আমাদের অবহিত থাকা প্রয়োজন। ভারতীয় আলঙ্কারিকগণ দেশীয় সাহিত্যের ওপর ভিত্তি করেই তাঁদের মতামত জ্ঞাপন করেছিলেন। বর্তমানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সাহিত্য জিজ্ঞাসা আমাদের ভাব ও ভাবনাকে অনেক-খানি এগিয়ে নিয়ে গেছে। তবুও ভারতীয় আচার্যদের বিচারেও সাহিত্যের রসরূপ অনেকপরিমাণে পরিস্ফুট। আচার্য ভরতের নাট্যশাস্ত্র থেকেই ধরা যাক। এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থে পরের দিকে আরও বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে।

আচার্য ভরতের নাট্যশাস্ত্রে কাব্যরসকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। নাট্যশাস্ত্রে বলা হচ্ছে—

যথা বীজাদ্ ভবেদ্ বৃক্ষো বৃক্ষাৎ পুষ্পং ফলং যথা।
তথা মূলং রসাঃ সর্বে তেভ্যো ভাবা ব্যবস্থিতাঃ॥

[বীজ থেকে যেমন বৃক্ষের উৎপত্তি, এবং বৃক্ষ থেকে ফুলও ফলের প্রকাশ, তেমনই রস থেকেও কাব্যের উৎপত্তি]

এবং 'নহি রসাদ্ ঋতে কশ্চিদ্ অর্থঃ প্রবর্ত্ততে।'

[রস ছাড়া কোনো বিষয়ই প্রবর্তিত হয়না]

আচার্য ভরত কাব্যের অলংকার, গুণ, রীতি প্রভৃতির কথাও বলেছেন।

শব্দ ও অর্থের প্রয়োগেই কাব্য সার্থকরূপ লাভ করে—এই মতটি কাব্যলঙ্কার গ্রন্থ রচয়িতা ভামহের মত। তিনি বলেন 'শব্দার্থ সহিতৌ কাব্যম্'। অলংকারকেই তিনি প্রধান বলে মনে করেন। তাঁর মতে 'ন কান্তমপি নির্ভূষং বিভাতি বনিতামুখং' বনিতামুখ দেখতে ভালো হলেও অলংকার ছাড়া তা সুষমাময় হয় না। অলংকার প্রয়োগই কাব্যের কাব্যত্ব প্রকাশ পায়। আরিস্টটল একেই বলেছেন 'Strange expression'। রাজশেখর এবং দণ্ডীও অলংকারকে প্রাধান্য দেন। রাজশেখরের কাব্য মীমাংসায় অলংকার শাস্ত্রকে সপ্তম বেদাঙ্গ বলা হয়েছে। দণ্ডী তাঁর কাব্যাদর্শে বললেন—কাব্যশোভাকরান্ ধর্মান্ অলঙ্করান্ প্রচক্ষতে।

[যে সব ধর্ম কাব্যের শোভা জন্মায়, তারাই অলঙ্কার]

কাব্যালংকারসূত্র প্রণেতা বামন আর একটু এগিয়ে এসে বললেন 'সৌন্দর্যম্ অলঙ্কার:'—সৌন্দর্যই কাব্যের অলংকার। অলংকার আছে বলেই কাব্য সকলের কাছে উপাদেয়। কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন অলংকার দেহ সৌন্দর্যের শোভা বৃদ্ধি করে। দেহ লাবণ্য যখন আর থাকেনা তখন অলংকার পরলেও তার শোভা বাড়ে না। বামন রীতিকেই কাব্যের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য বলেন—এবং তা-ই কাব্যের আত্মা। তার পরেই তিনি গুণকে স্থান দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর মত দাঁড়ালো—রীতিরাত্মা কাবস্য। বিশিষ্টা পদরচনা রীতিঃ। বিশেষো গুণাত্মা। কবির শেষ সন্ধান যে সৌন্দর্য এই কথাটি বামনের আলোচনা থেকে বোঝা যায়। বামন কথিত রীতি এবং style কথা দুইটির সাদৃশ্য কিছুটা আছে। রীতি আরও একটু ব্যাপক। তবু বামনের মতেও style-এর আভাস আমরা পাচ্ছি।

'বক্রোক্তি জীবিত' রচয়িতা কুন্তকের মতে বক্রোক্তিই কাব্যের আত্মা। তিনি রীতিকে স্বীকার করে নিয়ে বলেন রীতি শব্দ ও অর্থ সাপেক্ষ নয়—কবি স্বভাবেই তার উদ্ভব। তাঁর মতে বক্রোক্তিই কাব্যের প্রাণ। অলংকার, রীতি প্রভৃতি বক্রোক্তি-নির্ভর। কাব্য-সৌন্দর্য এই বক্রোক্তির ওপরই নির্ভর করে। তাঁর মতে—

শব্দার্থৌ সহিতৌ বক্রকবিব্যাপারশালিনি।
বন্ধে ব্যবস্থিতৌ কাব্যং তদ্বিদাহ্লাদকারিণি॥

['সহিত অর্থাৎ মিলিত শব্দার্থযুগল কাব্যজ্ঞগণের আহ্লাদ-জনক বক্রতাময় কবিব্যাপারপূর্ণ রচনা বন্ধে বিন্যস্ত হইলে কাব্য হইয়া থাকে।'—অনুবাদ-কাব্যালোক।]

সপ্তদশ শতাব্দীর আলংকারিক জগন্নাথ কাব্য সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে বলেন—

রমনীয়ার্থ-প্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্।

সাহিত্যদর্পণ রচয়িতা কবিরাজ বিশ্বনাথ সাহিত্যের যে সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন সেই সংজ্ঞা সুপ্রচলিত এবং সর্বজনস্বীকৃত। তিনি বলেন 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'—রসাত্মক বাক্যই কাব্য। বিশ্বনাথের এই প্রসিদ্ধ কাব্য-সংজ্ঞাটি যে বিশেষ মতগুলির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তার মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখ যোগ্য হচ্ছে ধ্বন্যালোকের মতটি। ধ্বনিবাদিগণের মতে, কাব্যস্যাত্মাধ্বনিঃ—কাব্যের আত্মাই ধ্বনি। তাঁরা বলেন, কাব্যের আত্মা শব্দও নয়, অর্থও নয়, অলংকারও নয়, রীতিও নয়, বক্রোক্তি নয়—এদের অতিরিক্ত কিছু। নারী দেহের লাবণ্য অলংকার ছাড়াও দীপ্তি পেতে পারে। কাব্য দেহের এই লাবণ্যই ধ্বনিবাদিদের মতে—ধ্বনি। এই ধ্বনির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ধ্বনিকার বলেন—

যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থম্ উপসর্জনীকৃত-স্বার্থৌ।
ব্যঙ্‌ক্তঃ কাব্যবিশেষঃ স ধ্বনিরিতি সূরিভিঃ কথিতঃ॥

যেখানে কাব্যের শব্দ বা অর্থ নিজেদের অপ্রধান করে প্রতীয়মান অর্থকে (Suggested meaning) ব্যঞ্জিত করে, সেই ব্যঙ্গ্যার্থরূপ কাব্যবিশেষকেই পণ্ডিতগণ ধ্বনি বলেন। অভিনব গুপ্ত এই ধ্বনিকেই রস বলেছেন, এবং তাঁর মতে, এই রসধ্বনিই কাব্যের আত্মা। এই মত নিয়ে ভারতীয় আলঙ্কারিকদের মধ্যে আর বিশেষ কোনো দ্বিধা দেখা দেয়নি। যে সব মতের উল্লেখ করা

হ'লো—তাদের শেষ কথাটি পেলাম বিশ্বনাথের 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্' উক্তিটির মধ্যে।

পাশ্চাত্ত্যদেশে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা অনেকদিন থেকেই চলছে। গ্রীকরাই সাহিত্য আলোচনা প্রথম সুরু করেন। প্লেটো, আরিস্টটল থেকেই এই আলোচনার সূত্রপাত। প্লেটো কবিদের ভালো চোখে দেখেননি। তিনি তাঁর রিপাব্লিক থেকে কবি ও কাব্যকে নির্বাসিত করার জন্যে সুপারিশ করেছিলেন। কবিদের বিরুদ্ধে তাঁর সবচেয়ে বড়ো অভিযোগ হচ্ছে—তাঁরা কাব্যের মধ্যে খাঁটি সত্য পরিবেষণ করেননি। তাঁর মতে কাব্য হচ্ছে 'mirror of truth'—বাস্তব-সত্যের যথার্থ অনুকরণ হ'তে হবে কাব্যকে। সত্য বলতে তিনি কল্যাণময় সুন্দরের ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ সত্যের কথাই বলেছেন। তাঁর মতে আর্ট সেই সত্যেরই অনুকরণ। আমাদের দেশেও কবি ও কাব্য বিরোধী একটা মনোভাব প্রাচীন কালে দেখা দিয়েছিল। কবি ও কাব্যকে ভালো চোখে দেখা হতো না বলেই প্রাচীনেরা বলেছিলেন—কাব্যালাপাংশ্চ বর্জয়েৎ—কাব্যালাপ বর্জন করবে। হয়ত তাঁরাও মনে করতেন কবিরা বেশি বাজে বকেন, এবং তাও একেবারে বাস্তববর্জিত।

প্লেটো-শিষ্য আরিস্টটলও Mimesis বা Imitationকে (অনুকরণ) কেন্দ্র করে আর্টের আলোচনা করেছেন। অনুকরণ প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে প্রবল ভাবে বিদ্যমান। এই অনুকরণ তাকে দেয় আনন্দ। শিল্পী, সাহিত্যিক প্রভৃতি প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই এই অনুকরণের ঝোঁক দেখা দেয়। চিত্র, সঙ্গীত, কাব্য প্রত্যেকটির মধ্যেই শিল্পীর অনুকরণের ছাপ সুস্পষ্ট। এই অনুকরণে একটি অনির্বচনীয় আনন্দও আছে। আরিস্টটল যেমন 'Art is imitation' কথাটিকে তাঁর মূল বক্তব্য করে নিয়েছেন, তেমনই প্লেটো কথিত Truthকেও তিনি সরাসরি অস্বীকার করেননি। তবে তাঁর মতে কবিরা শুধু যা ঘটছে বা সচরাচর যা ঘটে তারই বিবৃতি দেবেন না। তাঁরা বলবেন 'of such as might happen, and of things possible, according to probability or necessity'. (Poetics) আরিস্টটলের মতে 'the poet should prefer probable impossiblities to improbable possibilities'. এখানে সম্ভাব্য সত্যের অনুকরণের কথাই বলা হচ্ছে। এই সত্যই

সাহিত্যের সত্য—রবীন্দ্রনাথ এরই কথা বলতে গিয়ে বলেছেন কবির মনোভূমিতেই এই সত্যের বীজ বিহিত থাকে—'ঘটে যা তা সব সত্য নহে।' সাহিত্যের সত্য আর ইতিহাসের সত্য এক নয়। সাহিত্য সত্য ইতিহাসের সত্যের চেয়েও অনেক উর্ধ্বের আনন্দময় সত্য।

আরিস্‌টটলের মত-ই পাশ্চাত্ত্য জগতে এক সময় সর্বজনস্বীকৃত মত ছিল। এই মত উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশেও অশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

সম্ভাব্য সত্যের বা সাহিত্য সত্যের (literary truth) কথা বলেই—সেই সঙ্গে তিনি সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, ঘটনার মধ্যে এমন কিছুই প্রয়োগ করতে পারবে না, যা নিতান্ত অযৌক্তিক—*there* must be nothing irrational.

ইউরোপে নবজাগৃতির ফলে বিশ্লেষণমুখী ও মানব জীবননির্ভর মনের কাছে আর্টের পরিচয় আরও ব্যাপক ও গভীর হয়ে দেখা দিল। কাব্য বিচারে আরিস্‌টটল বিশুদ্ধানন্দের কথা বলেছেন। তাঁর মতে 'The object of poetry, as of all the fine arts, is to produce an emotional delight, a pure and elevated pleasure. (Aristotle's Theory of Poetry and Fine Art—Butcher). এই আনন্দরস আস্বাদন প্রসঙ্গে আরিস্‌টটলের মতের ব্যাখ্যায় বুচার একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিমত প্রকাশ করেছেন। আনন্দরস বলতে আরিস্‌টটল কখনও স্রষ্টা বা শিল্পীর আনন্দ বলে মনে করেননি—স্রষ্টার সৃষ্টির আনন্দ রসগ্রহনের অধিকার দর্শকেরই আছে—'the pleasures of art are not for the artist but for those who enjoy what he creates'. কবির কাব্যরস গ্রহণের আনন্দ সামাজিক হৃদয়ের। নব জাগৃতি বা রেনাশাঁস (Renaissance) আন্দোলনের ফলে—ইউরোপে সামাজিক, রাজনীতিক পরিবেশে, সাহিত্য, শিল্প, :দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতির ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একটি বিরাট গতিবেগও লক্ষিত হয়। পুরানো ঐতিহ্যের ভিত্তির ওপর নতুন আদর্শ এবং তার সঙ্গে নতুন ও পরিবর্তনশীল সামাজিক অবস্থার সামঞ্জস্য স্থাপন করে। এই রেনাশাঁস নবীন জীবনে এমন এক আলোড়ন সৃষ্টি করে যে তার ফলে ঐ নবীনের মধ্যে সৃজনীশক্তির বিস্ময়কর ও অপূর্ব বিকাশ ঘটে। সাহিত্য ও শিল্পে অপূর্ব মানবপ্রীতি ও সৌন্দর্যবোধের প্রকাশ লক্ষিত হয়।

সৌন্দর্যবোধের কথা এর আগে প্রচলিত থাকলেও এই রেণাশাঁসের সময় থেকেই নতুন ভাবে Sense of Beauty গড়ে উঠতে থাকে। ইতালীর ফ্লোরেন্স নগরীত এই রেণাশাঁস জন্মলাভ ক'রে সারা ইউরোপে তার প্রভাব বিস্তার করে। কাগজ, মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতির প্রচলন, নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, সাহিত্য, রাজনীতি ও ধর্ম সম্বন্ধে নতুন ধারণা —এই নবজাগৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। নির্বিবাদে সব মেনে নেবার দিন কেটে গেল। বহুদিনের বন্ধন থেকে মানবতা মুক্ত হলো। রেণাশাঁস দিল বুদ্ধি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করার প্রেরণা। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের শুরু এই যুগ থেকেই। মানবজীবনের সুখদুঃখ বেদনা-বোধের ওপর নির্ভর করে সাহিত্য তখন গড়ে উঠছে। তাতে স্বাধীন চিন্তা শক্তি ও কল্পনার বিকাশ ঘটছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে তার শুরু হলেও—পরের দিকেও সেই স্বপ্নলোকের আনন্দ—সেই কল্পনা বেগ—একই ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। সেক্‌স্‌পীয়র কবি ও কাব্য সম্বন্ধে তাঁর A Mid Summer Night's Dream নাটকে বলেন—

'The poet's eye, in a fine frenzy rolling,
Doth glance from heaven to earth,
from earth to heaven ;
And as imagination bodies forth
The forms of things unknown, the poet's pen
Turns them to shapes, and gives to airy nothing
A local habitation and a name.

কবির লেখনী সাধারণকেও অসাধারণ করে তোলে। বস্তু সত্যের চেয়েও কাব্য অনেক বেশি সত্য—তুচ্ছকে অমূল্য করে তোলার অধিকার তারই—এ ত ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিরও কথা!

ইউরোপে ফরাসী বিপ্লবের গুরুত্বও অনেকখানি। রেণাশাঁসের মতো এই বিপ্লবও ইউরোপের বিভিন্ন জাতীয় জীবনের বিধি ব্যবস্থার বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। বহুদিনের দুঃখবেদনায় জর্জরিত মানুষ সেদিন মরীয়া হয়ে রাজতন্ত্রের 'বাস্‌টিল' ভেঙেছিল। এই ভাঙার মধ্যে সেদিনের মানুষ পেল চিত্ত-মুক্তির আস্বাদ। Equality, Fraternity, Liberty—সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার নির্ভিক ঘোষণার মধ্যে মানুষের অধিকারের কথাই বড়ো করে বলা হয়েছিল। মানুষ নিজের অধিকার—নিজের জীবনের মূল্য সম্বন্ধেও

সচেতন হলো। নানাবিধ অধিকারের দাবীর সঙ্গে আর্টের স্বাধীনতার দাবীও ঘোষিত হলো। সাহিত্য বিশেষ কোনো নিয়মের পথ ধরে চলবেনা সে তার নিজের খেয়ালখুসির পথ ধরেই চলবে। এই Freedom of Art আন্দোলনের মূল কথা হলো 'Art for art's sake'. এতদিন ধরে সাহিত্যের যে কল্যাণরূপের কথা বলা হচ্ছিল—আর্ট-স্বাধীনতাকামী শিল্পীরা তার বন্ধন মানতে রাজি নন। এঁরা শিল্পের আনন্দরস পরিবেষনকেই মুখ্য বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু এই আন্দোলনের গতিবেগ শুরু হয়ে এল ফরাসী বিপ্লবের ব্যর্থতার সঙ্গে সঙ্গেই। সেই ব্যর্থতার অনিবার্য পরিণতি দেখা দিল শিল্পের বিকৃত (perverted) প্রকাশে। Sense of factকে তাঁরা এত বাড়িয়ে দেখছিলেন যে তার জন্যে কুশ্রীতা ও অভব্যতাও সাহিত্যে এসে পড়ে। Art for Art's sake' কথাটি সুইনবার্ন্, অস্কার ওয়াইল্ড্ প্রমুখ সাহিত্যিকদের—প্রাচীন সাহিত্যাদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ফল। ওদেশে কেউ কেউ এই মতের অনুকূলে মত প্রকাশ করেছেন—আবার অনেকে এর প্রতিকূল মনোভাবও ব্যক্ত করেছেন। বাস্তববোধের মাত্রাতিরিক্ততা যে অসুন্দর প্রকাশ-ব্যাকুলতা জাগিয়ে তোলে—শেষোক্ত দলের মনোভাব তারই প্রতিকূল ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে কবি-সমালোচক ম্যাথ্যু আর্নল্ড সাহিত্যকে criticism of life আখ্যা দিলেন। তিনি বলেন '…poetry is at bottom a criticism of life ; that greatness of a poet lies in his powerful and beautiful application of ideas to life—to the question : How to live'. আর্নল্ডের এই মত (সাহিত্য জীবন-সমালোচনা) সাহিত্য-রসিকদের স্বীকৃতি লাভ করেছে। সাহিত্যে যুগচিত্ত ও যুগধর্মের যুগপৎ প্রতিফলনের কথা তিনিই আমাদের সুস্পষ্ট ভাষায় জানালেন। তাঁর Essays in Criticism গ্রন্থের এক জায়গায় তিনি বলছেন—'For the creation of master-work in literature two powers must concern,—the power of the man and the power of the moment—and the man is not enough without the power of the moment.

Art for Art's sake নীতিটি নানা কারণে সে যুগে সর্বজনস্বীকৃতি লাভ করতে পারেনি। আর্ট কল্যাণময় সুন্দরেরই প্রকাশ—এই মত কীট্স্, শেলি, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, লী হান্ট, ক্রোচ, এবারক্রম্বি প্রভৃতি সবাই স্বীকার করেছেন।

সুন্দরই সত্য এবং সত্যই সুন্দর—তাই 'A thing of beauty is a joy for ever' শেলী বলেন 'Poetry is indeed some thing divine', এবং 'All high poetry .is infinite', এবং 'Poetry turns all things into loveliness; it exalts the beauty of that which is most beautiful, and it adds beauty to that which is most deformed.' ক্রোচ Art এবং Beautyকে আলাদা করে দেখেননি—তাঁর মতে দুইই এক। তাঁর মতে Beauty হচ্ছে এক ধরনের প্রকাশ—আর আর্ট সুন্দরের অনুভূত অভিব্যক্তি।

একালের কথা ঃ

রস প্রকাশই যে সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য একথা সর্বকালে স্বীকৃত। প্রাচীনেরা যা বলেছেন তার ওপর নির্ভর করেই পরবর্তী কালের ভাব ও ভাবনা গড়ে উঠেছে। হয়তো উপায়-উপকরণের পার্থক্য রয়েছে। রাজশেখরের—'ভাষা যাই হোক—উক্তি বিশেষই কাব্য'-এই কথাটির অনুসরণে মধ্যযুগের শেষ শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র রসের প্রাধান্য অকুণ্ঠায় স্বীকার করে নিয়ে বললেন 'যে হোক সে হোক ভাষা কাব্য রস লয়ে।' উনবিংশ শতাব্দীতে এসেও আমরা প্রাচীন মতের সশ্রদ্ধ স্বীকার লক্ষ্য করি। তবে তার সঙ্গে পরবর্তীর জিজ্ঞাসাও জড়িত হয়েছে। সাহিত্য কি—প্রশ্নটির আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, 'যাহা প্রকৃতির প্রতিকৃতিমাত্র, সে সৃষ্টিতে কবির তাদৃশ গৌরব নাই। তাহার কারণ সে কেবল প্রতিকৃতি অনুলিপিমাত্র--তাহাকে সৃষ্টি বলা যায় না। যাহা প্রতিকৃতিমাত্র নহে, তাহাই সৃষ্টি। যাহা স্বভাবানুকারী অথচ স্বভাবাতিরিক্ত তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি।' সাহিত্য সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা অনেকখানি পাশ্চাত্য ঘেঁষা। তিনি আরিস্টটলের imitation, literary truth প্রভৃতি কথাগুলি মেনে নিয়েছেন। সাহিত্য যে যুগধর্ম ও যুগচিত্তের প্রতিবিম্ব--তাও তিনি অকুণ্ঠায় স্বীকার করেছেন। সাহিত্যের প্রাচ্য আদর্শকে তিনি সর্বান্তঃকরণে মেনে নিতে পারেননি বলেই মনে হয়। উত্তরচরিতের আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন— 'এ দেশীয় প্রাচীন-আলঙ্কারিকদিগের ব্যবহৃত শব্দগুলি একালে পরিহার্য ; ব্যবহার করিলেই বিপদ

ঘটে; আমরা সাধ্যানুসারে তাহা বর্জন করিয়াছি, এই রস শব্দটি ব্যবহার করিয়া বিপদ ঘটিল। নয়টি বৈ রস নয়, কিন্তু মনুষ্য চিত্তবৃত্তি অসংখ্য। রতি, শোক, ক্রোধ, স্থায়ীভাব; কিন্তু হর্ষ, অমর্ষ প্রভৃতি ব্যভিচারীভাব। স্নেহ, প্রণয়, দয়া—ইহাদের কোথাও স্থান নাই—না স্থায়ী না ব্যভিচারী—কিন্তু একটি কাব্যানুপযোগী কদর্য মানসিক বৃত্তি আদিরসের আকাশস্বরূপ স্থায়ীভাবে প্রথমে স্থান পাইয়াছে। স্নেহ, প্রণয়, দয়াদি পরিবিজ্ঞাপক রস নাই, কিন্তু শান্তি একটি রস, সুতরাং এবংবিধ পরিভাষিক শব্দ লইয়া সমালোচনার কার্য সম্পূর্ণ হয় না। আমরা যাহা বলিতে চাহি, তাহা অন্য কথায় বুঝাইতেছি; আলঙ্কারিকদিগকে প্রণাম করি।'

বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্ত্য মতকে গ্রহণ করলেও সাহিত্যের 'স্বভাবাতিরিক্ত' কথাটি বলতে গিয়ে প্রাচ্যের প্রাচীন-উক্ত সেই রসসৌন্দর্যের কথাই বলেছেন। কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য যে সৌন্দর্য সৃষ্টি এবং এই সৌন্দর্যই যে কাব্যের প্রাণ—তা তিনি স্বীকার করেছেন। বাস্তবনির্ভর সাহিত্যের দিকে তার ঝোঁক থাকলেও তিনি বাস্তবের নগ্ন রূপায়নকে কখনও স্বীকার করেননি। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে—পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের রস সার্থকভাবে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। পাশ্চাত্ত্যের জীবনাদর্শের বলিষ্ঠ রূপটি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। জাতির জীবনে তারই সার্থক প্রতিফলন তিনি কামনা করেছেন। তাই মানুষ হয়েছে তাঁর সাহিত্যের প্রধান উপকরণ। ভারতীয় আচার্যদের অলঙ্কার-সীমায় নিজেকে আবদ্ধ না রেখে বাইরে থেকে আনন্দের রসবস্তু ও ভাবকে নিজের ভাষ ও সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে প্রকাশের প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর আগে বিদ্রোহী কবি মধুসূদনও প্রাচীন আলঙ্কারিকদের উপেক্ষা করে পাশ্চাত্ত্যের সাহিত্যাদর্শকে গ্রহণ করার ইচ্ছা জানিয়েছিলেন। নাটক লেখার প্রসঙ্গে তিনি তাঁর বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে জানিয়েছিলেন যে ভবিষ্যতে আরও নাটক যদি লিখতেই হয় তাহলে 'I shall not allow myself to be bound by the dicta of Mr. Biswanath of the Sahitya Darpan. I shall look to the Great Dramatists of Europe for models'. বিদেশ থেকে model তাঁর প্রায় সব রচনাতেই কম বেশি নেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাঁর রচনারও শেষ কথা রসসৃষ্টি—আনন্দ লাভের আকাঙ্ক্ষায় সাহিত্য সৃষ্টি। ইংরাজি সাহিত্যে যে Pleasureএর কথা বলা হয়েছে সেই Pleasureই আনন্দ এবং তাই সাহিত্যের শেষ লক্ষ্য। কবি মধুসূদনও যাকেই Model করুন না কেন—আনন্দ-

রসোপলব্ধিই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। এর মধ্যেই সুন্দর কথাটি আভাসিত। Shelly কাব্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন 'Poetry is ever accompanied with Pleasure'. এই সেই আনন্দ যার সম্বন্ধে Keats বলেন 'A thing of beauty is a joy for ever'—Croce বলেন 'Pure poetic joy'.

উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্কিমচন্দ্র যে সাহিত্য সংজ্ঞা আমাদের সামনে তুলে ধরলেন—তার ওপর নির্ভর করেই সাহিত্য রচনা ও আলোচনা দুইই চলছিল। তাঁর পরে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের স্বরূপ ও বিষয়বস্তু নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত যখন প্রকাশ পাচ্ছে—তখন আমাদের দেশে সাহিত্য সম্বন্ধে যে ধারণাটি বলবৎ ছিল—তা মুখ্যত পাশ্চাত্ত্য ধারণা। বিদেশী সাহিত্য পঠন-পাঠনের ফলে সাহিত্য সম্পর্কিত মনোভাব একটি বিশেষ গতি লাভ করে। সেই সময় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সম্বন্ধে অভিমত অভিনবত্বে সমুজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়। সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত কোনো বিশেষ সীমায় আবদ্ধ নয়। তাঁর সাহিত্য সংজ্ঞার মধ্যে বিশ্ব সাহিত্যের বৈচিত্র্যের রূপটি বিধৃত। 'সাহিত্য' গ্রন্থের 'বাংলা জাতীয় সাহিত্য' নামক প্রবন্ধে কবি বলছেন—'সহিত শব্দ হইতে সাহিত্য শব্দের উৎপত্তি। অতএব ধাতুগত অর্থ ধরিলে সাহিত্য শব্দের মধ্যে একটি মিলনের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সে যে কেবল ভাবে-ভাবে ভাষায়-ভাষায় গ্রন্থে-গ্রন্থে মিলন তাহা নহে—মানুষের সহিত মানুষের অতীতের সহিত বর্তমানের, দূরের সহিত নিকটের অন্তরঙ্গ যোগ সাধন সাহিত্য ব্যতীত আর কিছুর দ্বারাই সম্ভবপর নহে। যে দেশে সাহিত্যের অভাব সে-দেশের লোক পরস্পর সমাজবন্ধনে সংযুক্ত নহে— তাহারা বিচ্ছিন্ন।'

'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলছেন—'সৌন্দর্য প্রকাশই সাহিত্যের বা আর্টের মুখ্য লক্ষ্য নয়। এ সম্বন্ধে আমাদের দেশে অলংকার শাস্ত্রে চরম কথা বলা হয়েছে : বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।'

'মানুষ নানারকম আস্বাদনেই আপনাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছে বাধা-হীন সীমার ক্ষেত্রে। সেই বৃহৎ বিচিত্র লীলাজগতের সৃষ্টি সাহিত্য।'

সাহিত্য বিচারে 'উপলব্ধি' কথাটির উপর রবীন্দ্রনাথের খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন। মানব জীবনের মধ্যে যখন বেদনা জেগে ওঠে তখন সে চায় প্রকাশের পথ। বিধাতার কাছ থেকে সে পেয়েছে 'অলৌকিক আনন্দের ভার'—কাজেই 'তার বক্ষে বেদনা অপার তার নিত্য জাগরণ'। সাহিত্য বিচারে রবীন্দ্রনাথ যে সত্যের কথা উল্লেখ করেছেন—সেই beautiful এবং literary truth—

এই সত্য আর আরিস্‌টটলের সম্ভাব্য সত্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। এই truth--এর জন্যেই Shellyর কাছে কাব্য হয়েছে 'some thing divine'—আর রবীন্দ্রনাথের কাছে 'সাহিত্য ব্যক্তি বিশেষের নহে, তাহা রচয়িতার নহে—তাহা দৈববাণী।' (সাহিত্যের তাৎপর্য)। তবে রবীন্দ্রনাথ সত্য-সুন্দরের শেষ পরিণত রূপ যে আনন্দ এবং এই 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি—যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই তাঁহার আনন্দরূপ তাঁহার অমৃতরূপ' এই কথাটি নানাভাবে সাহিত্য প্রসঙ্গে বলেছেন। এখা ন অন্যান্য মতের সঙ্গে তার মতের কিছুটা অমিলও রয়েছে।

সাহিত্য-সত্য বাস্তব-সত্যকে অতিক্রম করে এগিয়ে যায়। প্রতিনিয়ত সংসারে যা ঘটছে তার সব সত্য নয়। সাহিত্য সত্যের যথার্থ উপলব্ধিতেই আনন্দ এবং এই আনন্দই সাহিত্য সৃষ্টির প্রধান লক্ষ্য। এরই মধ্যে সেই সুন্দরের ইসারা। সৌন্দর্য সম্পর্কে কবি সংক্ষেপে বলেন, 'সৌন্দর্য প্রয়োজনের বাড়া।' বাহুল্যের মধ্য দিয়ে তার যথার্থ বিকাশ ঘটলেও তার মধ্যে কল্যাণশ্রী বর্তমান। রবীন্দ্রনাথ যে সত্যের কথা বলেছেন—তার সুন্দর ব্যাখ্যাটি পাই 'সাহিত্য' গ্রন্থের সৌন্দর্যবোধ প্রবন্ধে। সেখানে তিনি বলছেন -'সত্য যে পদার্থ-পুঞ্জে স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্য, সেই কথা জানাইবার জন্য অন্য শাস্ত্র আছে—কিন্তু সাহিত্য জানাইতেছে সত্যই আনন্দ সত্যই অমৃত। সাহিত্য উপনিষদের এই মন্ত্রকে অহরহ ব্যাখ্যা করিয়া চলিয়াছে—

রসো বৈ সঃ। রস হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।
তিনিই রস। এই রসকে পাইয়াই মানুষ আনন্দিত হয়।'

সত্য ও সুন্দরের শুভযোগেই এই রসের অনুভূতি জাগে কবি ও সামাজিকের হৃদয়ে। Keatsএর truth ও beautyই রবীন্দ্রনাথের সত্য সুন্দর। এর উপলব্ধিই আনন্দোপলব্ধি। এই আনন্দ প্রকাশের দায়িত্ব সাহিত্যের। 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে Keatsএর Ode to Grecian Urn আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন—

'অসীম একের সেই আকুতি, যা ঋতুদের ডালায় ডালায় ফুলে ফুলে বারে বারে পূর্ণ করেও নিঃশেষিত হল না, সেই সৃষ্টির আকুতিই তো রূপদক্ষের কারুকলার মধ্যে আবির্ভূত হয়ে আমাদের চিত্তকে চিন্তার বাইরে উদাস করে নিয়ে যায়। অসীমের একের আকুতিই সেই বেদনা, যা, বেদ বলেছেন, সমস্ত আকাশকে ব্যথিত করে রয়েছে। সে 'রোদসী', 'ক্রন্দসী'—সে কাঁদছে।

সমস্ত আকাশের সেই কান্নাই একটি সুন্দর জল পাত্রের রেখায় রেখায় নিঃশব্দ হয়েই দেখা দেয়। এই পাত্র দিয়ে অসীম আকাশের অমৃত নির্ঝরের রসধারা ভরতে হবে বলেই শিল্পীর মনে ডাক পড়েছিল; অব্যক্তের গভীরতা থেকে অনির্বচনীয়ের রসধারা।'

পাত্রটি 'বাজে খরচ' বলে যদি কেউ মনে করেন সেই ভেবে কবি এই সঙ্গেই বলে রাখছেন—'সৃষ্টির বাজে খরচের বিভাগেই অসীমের খাস তহবিল।... বিশ্বকবি এই বাজে খরচের বিভাগে তাঁর থলিঝুলি কেবলই উজার করে দিচ্ছেন অথচ রসের ব্যাপারে আজও দেউলে হল না।' এই রসের সঙ্গে সৃষ্টির কথাটিও এসে পড়ে। সৃষ্টি অর্থে আমরা যে প্রকাশকে বুঝি—সেই প্রকাশ সত্য-সুন্দরের রস-প্রকাশ। এই প্রকাশিত সত্য বাস্তব সত্যের চেয়েও বেশি সত্য। এই সত্যের অনুভূতি জাগে কবির হৃদয়ে। তিনি তাই সত্যদ্রষ্টা ঋষি। Heard melodies এর মাধুর্যের সঙ্গে তিনি সুপরিচিত—Unheard melodies এর বারতা তিনি মানুষের কাছে বয়ে আনেন। 'যে গান কানে যায় না শোনা সে গান যেথায় নিত্য বাজে'—'সেই অতলের সভা মাঝে' তিনি প্রাণের বীণা নিয়ে যান। কবির হৃদয়ে যে আবেগ, যে অনুভূতি জাগে তারই বাঙ্ময় প্রকাশ ঘটে সাহিত্যে। তবে সেই প্রকাশ নিশ্চয়ই রসাশ্রিত হতে হবে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন—'সাহিত্য ও আর্টের একটি ব্যাপক ভূমিকা আছে। সাহিত্য ও আর্টে কোনো বস্তু যে সত্য তার প্রমাণ হয় রসের ভূমিকায়। অর্থাৎ সে বস্তু যদি এমন একটি রূপ-রেখা-গীতের সুষমাযুক্ত ঐক্য লাভ করে যাতে ক'রে আমাদের চিত্ত আনন্দের মূল্যে তাকে সত্য বলে স্বীকার করে, তাহলেই তার পরিচয় সম্পূর্ণ হয়। তা যদি না হয় অথচ যদি তথ্য হিসাবে সে বস্তু একেবারে নিখুঁত হয় তা হলে অরসিক তাকে বরমাল্য দিলেও রসজ্ঞ তাকে বর্জন করেন।' (তথ্য ও সত্য—সাহিত্যের পথে)।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য সম্বন্ধে যে মত পোষণ করতেন—তার স্বাতন্ত্র্য অনস্বীকার্য। পৃথিবীর সর্বত্র সাহিত্যের যে প্রকাশ ঘটছে এবং যে অবস্থার মধ্যে তার প্রকাশ ঘটছে তার সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। ঐতিহাসিক নানা দুর্যোগ বিপর্যয় নানা জাতির জীবনে যে অস্থিরতা, যে যন্ত্রণা জাগিয়ে তুলেছিল এবং তার জন্যে তাদের মধ্যে মুক্তির যে আকুলতা জেগে ওঠে—তার প্রকাশ বিভিন্ন যুগের সাহিত্যের মধ্যে লক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই যুগ-সত্যের প্রকাশকে মেনে নিয়েও —সাহিত্যের বিষয়বস্তুর মানব জীবন-নির্ভরতাকে অস্বীকার না করেও—পরের

দিকে সাহিত্যে যে মাত্রাতিরিক্ত বাস্তব-বোধ দেখা দিয়েছিল তাকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি। অনেক সময় তাকে অস্বীকারও করেছেন। এই অস্বীকার করার অর্থ জীবনকে অস্বীকার করা নয়। মানব জীবন যে কাব্যকে রসসিক্ত করে তোলে রবীন্দ্রনাথ সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত। মানব জীবনের মহিমা তিনি নানা ভাবে তাঁর সাহিত্যের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সুন্দরের পূজারী রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে অতি-বাস্তবের নগ্নতাকে অস্বীকার করেছেন। তাঁর সাহিত্য সম্পর্কিত মতে বাস্তবের অস্বীকৃতি নেই, আছে বাস্তবের নামে রুঢ়তা ও বর্বরতার অস্বীকৃতি। সাহিত্যের মূল্য প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন—

'জীবন মহাশিল্পী। সে যুগে যুগে দেশে দেশান্তরে মানুষকে নানা বৈচিত্র্যে মূর্তিমান করে তুলছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের চেহারা আজ বিস্মৃতির অন্ধকারে অদৃশ্য। তবুও বহুশত আছে যা প্রত্যক্ষ, ইতিহাসে যা উজ্জ্বল। জীবনের এই সৃষ্টি কার্য যদি সাহিত্যে যথোচিত নৈপুণ্যের সঙ্গে আশ্রয় লাভ করতে পারে তবেই তা অক্ষয় হয়ে থাকে। সেই রকম সাহিত্যই ধন্য—ধন্য ডন্ কুইক্‌সট্, ধন্য রবিনসন ক্রুশো। আমাদের ঘরে ঘরে রয়ে গেছে; আঁকা পড়ছে জীবনশিল্পীর রূপরচনা। কোনো-কোনটা ঝাপসা, অসম্পূর্ণ এবং অসমাপ্ত, আবার কোনো-কোনটা উজ্জ্বল। সাহিত্যে যেখানেই জীবনের প্রভাব সমস্ত বিশেষ কালের প্রচলিত কৃত্রিমতা অতিক্রম করে সজীব হয়ে ওঠে সেখানেই সাহিত্যের অমরাবতী। কিন্তু জীবন যেমন মূর্তিশিল্পী তেমনি জীবন রসিকও বটে। সে বিশেষ করে রসেরও কারবার করে। সেই রসের পাত্র যদি জীবনের স্বাক্ষর না পায়, যদি সে বিশেষ কালের বিশেষ মাত্র প্রকাশ করে বা কেবলমাত্র রচনা কৌশলের পরিচয় দিতে থাকে তাহলে সাহিত্যে রসের সঞ্চয় বিকৃত হয় বা শুষ্ক হয়ে মারা যায়। যে রসের পরিবেশনে মহারসিক জীবনের অকৃত্রিম আস্বাদনের দান থাকে সে রসের ভোজে নিমন্ত্রণ উপেক্ষিত হবার আশঙ্কা থাকে না। (সাহিত্যের স্বরূপ)। সার্বভৌমিকতার অভাবের জন্যে তিনি পাশ্চাত্যের সাহিত্যের আধুনিক রস সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি।

সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্বেই আমাদের দেশে পাশ্চাত্যের বস্তুনির্ভর সাহিত্যের স্বরূপ সম্পর্কে সাহিত্যিকদের মধ্যে কিছুটা সচেতনতা দেখা দেয়। Freedom of Art, Art for Art's sake—সত্যের নগ্নরূপায়ণ প্রভৃতি উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে এমন কি তার কিছু আগেও পাশ্চাত্য জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। আমাদের দেশে

উক্ত মতগুলি সহজ গতিলাভ করার আগেই আমাদের দেশের চিন্তানায়করা সাহিত্যের বিশুদ্ধ সংজ্ঞা—অন্তত আমাদের জাতীয় জীবনোপযোগী সংজ্ঞা বেঁধে দিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'সাহিত্য স্বভাবানুকারী আবার স্বভাবাতিরিক্তও বটে' বললেন। সাহিত্য সম্রাটের এই বক্তব্যটির সঙ্গে আরিস্টটল প্রদত্ত সাহিত্য সংজ্ঞার সাদৃশ্য আছে। রবীন্দ্রনাথ সত্যের মধ্যে সুন্দরের আভাস পেলেন—অপ্রত্যক্ষ তাঁর কাছে প্রতীয়মান হ'লো, 'অব্যক্তের গভীরতা থেকে, অনির্বচনীয়ের রসধারা' প্রবাহিত হ'লো। এই রসধারা যখন সহৃদয় পাঠকের মনে অনুরনণ জাগায় তখন সাহিত্যে সার্থক হয়ে উঠে। কবি তাই বলেন—

তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ
তবে সে কলতান উঠে ;
বাতাসে বনলতা শিহরি কাঁপে
তবে সে মর্মর ফুটে।

সত্য সুন্দরের মধ্যেই আনন্দের সার্থক বিকাশ। তাই কবির কাছে শুনতে পাই 'সত্যের যথার্থ উপলব্ধি মাত্রই আনন্দ তাহাই চরম সৌন্দর্য।' কবি-সমালোচক ম্যাথ্যু আর্নলড্-এর মতে এই কাব্যই হচ্ছে 'a criticism of life under the conditions fixed for such a criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty.'

আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথের পর প্রমথ চৌধুরী (বীরবল), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি অনেকেই সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। পাশ্চাত্ত্যের সাহিত্যাদর্শ আমাদের সাহিত্যনায়ক-দের মধ্যে সাহিত্যের প্রকৃত স্বরূপ চেনার ব্যাপারে ভাবনা ধরিয়ে দেয়। এঁদের মধ্যে কেউ সাহিত্যে আদর্শকে—কেউ বা বাস্তবকে বড়ো করে দেখেছেন। কিন্তু সবারই শেষ লক্ষ্য হচ্ছে রসসৃষ্টি। এর জন্যে কেউ রীতি, কেউ বা শব্দার্থ পূর্ণ বাক্‌ভঙ্গির কথা বলসেন। সাহিত্য মানব জীবনের নানা অনুভূতির সার্থক প্রকাশের বাহন বলে স্বীকৃত হলো। কেউ প্রত্যক্ষ অনুভূতিকে সাহিত্য সৃষ্টির মূল বলে বলছেন। অপর দিকে পাশ্চাত্ত্য জগতের অনেকে সাহিত্যকে জীবনের অভিব্যক্তি-স্বরূপ বলছেন। হাড্‌সন বলেন 'Literature is a vital record of what men have seen in life, what they have exprienced of it, what they have thought and felt about those aspects of it, which have the most immediate and

enduring interest for all of us. It is thus fundamentally an expression of life through the medium of language.' আলোচনা প্রসঙ্গে হাড্‌সনের এই কথাগুলি পূর্বেও একবার উল্লেখ করেছি। গুরুত্ববোধে দ্বিতীয়বার উদ্ধৃত হলো। মানব জীবনের সঙ্গে সাহিত্য ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু যুগ-প্রভাবকে সব সময় স্বীকার করে নিতে হয়। বিশেষ যুগ, সে যুগের মানুষ এবং তার যুগোচিত রূপটি সাহিত্যিক আমাদের সামনে তুলে ধরেন। তবুও একটি সত্য মেনে নিতে হয়—তা এই যে, অনেক সময় সাহিত্য-রচনা দেশ কালকে অতিক্রম করে নিজের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখে। পৃথিবীর সাহিত্যে বাল্মীকি, হোমার, কালিদাস, সেক্‌স্‌পীয়র, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একথা জোর করে বলা যেতে পারে। এর কারণ দেখাতে গেলে বলতে হয় যে মহৎ সাহিত্য কখনও দেশকালে সীমায় আবদ্ধ থাকে না—সে দেশকাল অতিক্রম করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এই ধরনের সাহিত্যে এমন একটি সত্য আভাসিত হয়—যার আবেদন সকল দেশে, সকল কালে। এই ধরনের সাহিত্যকে আমরা নিত্য-সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করতে পারি। যুগের পরিবর্তন হোক, মানুষের রুচির ও দৃষ্টিভঙ্গির হোক—তবুও এ ধরনের সাহিত্যে বা সাহিত্যরসের কোনো পরিবর্তন নেই। এই সব রচনার মধ্যে এমন একটি ভাবধারা প্রবাহিত - যা কেনো কালেই শুকিয়ে যায় নি এবং যাবেও না। এদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থে বলেন—'সাহিত্য সর্ব দেশেই এই কথাই প্রমাণ করে আসছে যে, মানুষের আনন্দ নিকেতন—চিরপুরাতন। কালিদাসের মেঘদূতে মানুষ আপন চিরপুরাতন বিরহ বেদনারই স্বাদ পেয়ে আনন্দিত। সেই চিরপুরাতনের চিরনূতনত্ব বহন করছে মানুষের সাহিত্য, মানুষের শিল্পকলা।'

শেষ পর্যন্ত সাহিত্য কি -তাই নিয়ে অনেক বলা সত্ত্বেও—নানা সংজ্ঞা দেওয়া সত্ত্বেও, সাহিত্য জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা নিয়ে আলোচনা শেষ হয়নি। প্রাচীন আলঙ্কারিক বললেন, 'রসেই সাহিত্যের সার্থক পরিচয়।' কেউ অলঙ্কার, কেউ সৌন্দর্য, কেউ রীতি, কেউ ধ্বনিকে সাহিত্যের শেষ কথা বলে ব্যাখ্যা করলেন। রসের কথাটি চূড়ান্ত রূপ ধরল 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্' শ্লোকটিতে। কাব্য থেকে যে আনন্দ আমরা লাভ করি—তার কথা বলতে গিয়ে সাহিত্যদর্পণকার বললেন, 'ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরঃ'। বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্ত্য আদর্শে সাহিত্য 'স্বভাবানুকারী, হয়েও স্বভাবাতিরিক্ত' বলে মত প্রকাশ করলেন।

আধুনিক কালেও আমাদের রবীন্দ্রনাথ বললেন 'যে প্রকাশ চেষ্টার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আপন প্রয়োজনের রূপ-কে নয়, বিশুদ্ধ আনন্দরূপকে ব্যক্ত করা, সেই চেষ্টারই সাহিত্যগত ফলকে আমি রসসাহিত্য নাম দিয়েছি।' পাশ্চাত্য জগতের রসবেত্তারা কেউ কেউ Imitation, Literary বা Probable truth, কেউ বা Interpretation of life, কেউ বা Pleasures of imagination (Addision), কেউ বা 'the art of uniting pleasure with truth by calling immagination to the help of reason', (Johnson), কেউ বা 'the suggestion, by the imagination, of noble grounds for the noble emotions' (Ruskin), কেউবা criticism of life বললেন। সবাই নিজের মতো করে বললেও প্রত্যেকের বক্তব্যে কোন না কোন ভাবে সত্য সুন্দর, আনন্দ প্রভৃতি কথা আভাসিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যে অপ্রত্যক্ষ, অসীমের কথা বলেছেন—ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, তার কথা বলতে গিয়েই বলেছেন—

The gleam,
The light that never was on sea or land···

সাহিত্যের নানা কথা নানা জিজ্ঞাসার ভীড়ে এই কথাটি সবাই মেনে নেবেন যে, সাহিত্য মানবজীবন নির্ভর। সেই মানবজীবনের রসরূপ সাহিত্যে প্রকাশিত। কবি-সমালোচক মোহিতলাল রস অর্থে Expression কথাটি ব্যবহার করেছেন। Croce-এর Beauty is expression মত অনুসরণ করেই তিনি তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন। আমরা আগেই বলেছি—মানবজীবনের সার্থক অনুভূতির বাঙ্ময় প্রকাশই সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ সুদৃঢ় ও সুস্পষ্টভাবে বললেন '···সাহিত্য রসরূপের সৃষ্টি। সৃষ্টিমাত্রের আসল কথাই হচ্ছে প্রকাশ।' বর্তমানকালে আমরা সাহিত্যের তথা art-এর সংজ্ঞা নিরূপণ করতে বসে সমাজ ও কালের দিকে দৃষ্টি রেখেই বিচার করতে চাই। বর্তমানযুগ—বিজ্ঞান ও যুক্তি প্রাধান্যের যুগ। সব জিনিসকে বিচার ক'রে তবে মেনে নেওয়াই এ কালের নিয়ম। তবুও এ কালের সাহিত্যিকের ওপর 'স্বর্গটি রচিবার' ভার থাকে বং তিনি 'মনের মোহের মাধুরী মিশায়ে' ভাবকে রূপায়িত করেন। জীবন থেকে দূরে নয়—জীবনের মধ্যে থেকেই—তার অনুভূতিযোগে সাহিত্য বাণীরূপ লাভ করে। সাহিত্যের এই রূপই রসরূপ।

নহি তচ্ছূন্যং কাব্যং কিংচিদস্তীতি। ধ্বন্যালোক (টীকা)
[রসহীন কোন কাব্য নেই।]

সাহিত্যে বক্তা ও শ্রোতা ঃ

ধন্যালোকে বলা হয়েছে—

'আলোকার্থী যথা দীপশিখায়াং যত্নবান জনঃ।

তদুপায়তয়া তদ্বদর্থে বাচ্যে তদাদৃতঃ॥

আলোকার্থী লোকের দীপশিখাই জ্বালতে হয়—তবে সে পায় আলো। কবির চরম লক্ষ্য রস হলেও তাঁকে 'কাব্যের শব্দার্থময় কথ বস্তু' সৃষ্টি করতে হয়। কবি রস সৃষ্টি করেন—সহৃদয় পাঠকের মনে সেই রস সঞ্চারিত করার সযত্ন প্রয়াস তাঁর আছে। কাব্য সৃষ্টির মূলেই সহৃদয় পাঠকের মনে রসসঞ্চার করা কবির অন্যতম বড়ো কাজ। কাব্যে যে ভাবটি প্রকাশ পায় কবির মনেই তার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে। তাকে যখন বাইরে দশের সামনে তিনি তুলে ধরেন তখন তাঁর লক্ষ্য থাকে মানবহৃদয়। কবি হৃদয় ও পাঠক হৃদয়—এই দুয়ের সহযোগে কাব্যরস বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হয়। কবি যে বিশেষ ভাবকে কাব্যরূপ দেন তা যদি পাঠকের হৃদয়ে কোনো রসের উদ্রেক না করে—তা হলে সামাজিক মনের কাছে সেই কাব্যের মূল্য নেই। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন '…আমাদের কথা শ্রোতা ও বক্তা দুইজনের যোগেই তৈরি হইয়া উঠে।"

কবির কাব্য সৃষ্টির মূলে যে ভাবগুলি রয়েছে সেগুলি শুধু কাব্যকে আশ্রয় করেই থাকে না—শুধু শিল্পীর সৃষ্টি পরিচয়েই তাদের পরিচয় সীমাবদ্ধ নয়—যারা তাঁর রস গ্রহণ করবেন তাঁদের হৃদয়ের সঙ্গেও তাদের যোগ রয়েছে। ভগবান আলো দিলেন, ফুল দিলেন, ফল দিলেন—অর্থাৎ তিনি এদের সৃষ্টি করলেন এবং তাঁর সৃষ্টির আনন্দটুকু গ্রহণ করার জন্য—তার রস উপভোগ করার জন্য এই আলো, ফুল, ফল আমাদের দিলেন। এখানে 'সৃষ্টি করা' ও 'দেওয়া' দু'টিই স্রষ্টার অভিপ্রেত। কবিও স্রষ্টা—অপার কাব্যসংসারে তিনিই প্রজাপতি ব্রহ্মা। তিনি সৃষ্টি করেন—সৃষ্ট-বস্তুর রসধারাও সহৃদয় সামাজিকের গ্রহণের জন্য প্রস্তুত রাখেন। অনেক সময় তাকে ভোক্তার দিকে দৃষ্টিও রাখতে হয়। তাই রবীন্দ্রনাথের মতে 'সাহিত্যে লেখক যাহার কাছে নিজের লেখাটি ধরিতেছে, মনে মনে নিজের অজ্ঞাতসারেও তাহার প্রকৃতির সঙ্গে নিজের লেখাটিও মিলাইয়া লইতেছে। দাশুরায়ের পাঁচালী দাশরথির ঠিক একলার

নহে; যে সমাজ সেই পাঁচালী শুনিতেছে তাহার সঙ্গে যোগে এই *পাঁচালি রচিত।'*

'এক' যখন বহুতে পরিণত হয়েছিলেন তখন সেকি শুধু তাঁর নিজের আনন্দটুকুর নিজেই আস্বাদ পাবার জন্তে! তার সঙ্গে বহুকে আনন্দ দেবার মহতী ইচ্ছাও কি তাঁর মধ্যে ছিল না! এই 'পাবার' ও 'দেবার' আনন্দ শিল্পসৃষ্টিতেও বর্তমান। শিল্পী যে প্রেরণায় শিল্পসৃষ্টি করেন তার মধ্যে আনন্দরস আস্বাদন ব্যাপারটি যেমন আছে তেমনি ভোক্তার জন্তেও আনন্দরস প্রকাশের দিকও থাকে। প্রকৃত শিল্পী শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেন। মহৎ শিল্পে শিল্পীর আত্মপ্রকাশ ঘটবেই। শিল্পী তার শিল্পকর্মে আনন্দ উপভোগ করেন। আবার ভোক্তার জন্তেও আনন্দরস জোগান দেন। এখন প্রশ্ন এই যে ভোক্তার হৃদয়ে আনন্দ রসোপলব্ধি ঘটানোও কি শিল্পীর উপর নির্ভর করে? শিল্পীর ওপর 'স্বর্গটি রচিবার ভার' যেমন আছে—ঠিক তেমনি স্বর্গ-সুষমা অনুভব করার জন্তে মন রচনার ভারও কি থাকে? উত্তরে বলা যায়—থাকে বৈ কি। সহৃদয় পাঠক সাহিত্য থেকে যে আনন্দরস লাভ করে সেই আনন্দের অনুভূতি সাহিত্যের অনুশীলনেই সম্ভব হয়। সাহিত্যিক যদি সেই রস প্রতীতি এনে দিতে না পারেন তাহলে তাঁর রচনাই যে ব্যর্থ হয়ে যায়। কেউ যদি বলেন, রস গ্রহণ যোগ্যতা যদি পাঠকের না থাকে তা হলে রচনা যত সার্থকই হোক না কেন পাঠকের মনে সে কোনো অনুভূতি জোগাতে পারে না—আর তাতেই রচনার ব্যর্থতা প্রমাণিত হয় না। এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে পাঠক বলতেও আমরা 'রসিক হৃদয়ের' কথাই বলছি। অরসিকের কাছে রস নিবেদন যাতে করতে না হয় তার জন্তে বররুচি চতুরাননের কাছে আকুলভাবে প্রার্থনা জানিয়েছেন। রসিক-হৃদয় কবির কাব্যের রস আস্বাদন করেন। কবি যে আনন্দ লাভ করেন রসিক পাঠক সেই আনন্দ লাভ করুক—তাও কবির কাম্য। তাঁর কাব্যের মধ্যে এই আশাটি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই প্রকাশ পায়। রসিক পাঠকের মনকে তিনি আনন্দরস আস্বাদনের জন্য প্রস্তুত করে তোলেন। বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে রচনার মাধ্যমে তথা রচনার রস গ্রহণের মাধ্যমে ব্যবধান অনেকখানি ঘুচে যায়। শ্রোতার মন বক্তার বক্তব্যের দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে। কবিহৃদয় পাঠকহৃদয়কে তাঁর প্রতিরূপ করে তোলেন। কবি যে বিষয়বস্তু অবলম্বন করেন—তার মধ্যে তাঁর নিজের পরিচয়

যেমন আছে—তেমনিই তাতে পাঠকের পরিচয়ও রয়েছে। কবি ও পাঠক উভয়েরই পরিচয়ের বাহন—এই সাহিত্য। রামায়ণে বাল্মীকিও আছেন, আদর্শ পুরুষ রামও আছেন—সেই সঙ্গে বাল্মীকির যুগ ও সর্বযুগের মানুষের সুখ-দুঃখ, ন্যায়-অন্যায়, ধর্মাধর্ম, সত্য-মিথ্যা প্রভৃতির বিচারও রামায়ণে রয়েছে। আদি কবি যে কাব্য সৃষ্টি করেছেন তাতে তাঁর নিজের আনন্দানুভূতির সঙ্গে পাঠক হৃদয়ের আনন্দানুভূতির শুভ সংযোগ ঘটেছে। তাঁর নানা ভাব ও ভাবনা মিলিয়ে তাঁকেও যেমন ঐ মহাকাব্যে পাচ্ছি—তেমনি তিনি যে আদর্শ মানুষ নিয়ে মানুষের জন্য রসকাব্য রচনা করেছেন—সেই মানুষের জীবনের রূপ-রসানুভূতির সার্থক পরিচয়ও কাব্যখানি বহন করে।

সৃষ্টিকৌশল ঃ

কবি যে কাব্য সৃষ্টি করেন—তার রসের উৎপত্তি সামাজিকের হৃদয়ে। কবিও সামাজিক—পাঠকও সামাজিক। বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবজীবন থেকে রসের উপাদান সংগৃহীত হয়। কবি তাদের নিজের করে নিয়ে, রঙে রসে অপূর্বতা দান করে, দশের রসগ্রাহী করে প্রকাশ করেন। কবি যে কাব্য সৃষ্টি করেন—তার মূল রহস্যটি কি অর্থাৎ কি ভাবে কোন্ কৌশলে কাব্য সৃষ্টি হয়—তা নিয়ে প্রাচীনকাল থেকে রসবেত্তারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করেছেন। কুন্তক শ্রেষ্ঠ কাব্যের লক্ষণ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বললেন 'অর্থঃ সহৃদয়াহ্লাদকারি-স্বস্পন্দ সুন্দরঃ'- কাব্যের অর্থটি সহৃদয়ের আনন্দের কারণ স্বরূপ এবং (এই অর্থ) নিজের ভাবেই সুন্দর হয়। যে বিষয়টি সামাজিকের কাছে তুলে ধরা হবে তা অবশ্যই আহ্লাদের কারণ হবে। কিন্তু বিষয়টিকে রমণীয় করে তোলার কৌশল কি? পাশ্চাত্ত্যের সাহিত্য রসিকেরা নানাদিক থেকে এই কৌশলের ব্যাখ্যা করেছেন। প্লেটো শিল্পকলাকে 'সত্যের মুকুর' বলেছেন। সেই মুকুরে প্রকৃত সত্য প্রতিফলিত হয়। শিল্পী তার ভেতর দিয়ে প্রত্যক্ষ সত্যকে সবার সামনে তুলে ধরেন। সত্যের রূপালেখ্য যে শিল্পকলার একটি বৈশিষ্ট্য তা অস্বীকার করা হয় না। কিন্তু সাহিত্যের সত্য 'যেমনি আছ তেমনি এসো' রূপে আমাদের সামনে ধরা দেয় না। তাইতো প্লেটোর

সত্য—প্রশ্নাতীত সাহিত্য-সত্য হ'ল না। প্লেটো truth বলতে moral truth-এর কথা বললেও বাস্তবের যথাযথ রূপায়ণ সাহিত্যের সত্য রূপে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি পায়নি। সাহিত্যে যাঁরা বস্তুবাদী তাঁরা তো প্লেটোর সত্যকে মানলেও আর্ট ও নীতিকে পরস্পরসাপেক্ষ বলে মানেন নি। আর্টের স্বাধীনতাই তাঁদের প্রধান বক্তব্য। তাঁদের সত্য-সচেতনতা তার নগ্ন প্রকাশের দাবী জানায়। সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে এই উপায়টি সর্বজনস্বীকৃত নয়।

কবি যা সৃষ্টি করেন—তার সত্য প্রধানত তাঁর চিন্তা, কল্পনা প্রভৃতির ওপর নির্ভর করে। কবি যা দেখেন—তাকে কল্পনার রঙে রসে সুন্দর ক'রে প্রকাশ করেন। দেখার ফলে তাঁর মধ্যে কতকগুলি image-এর সৃষ্টি হয়। কল্পনার আনন্দযোগে তাই আর্ট-রূপ লাভ করে। কবি নিজে থেকেই কোনো ভাব বা বাস্তবকে যে রূপায়িত করতে অগ্রসর হন—তা নয়। নানা image তাঁর জীবনে যে জিজ্ঞাসা জাগায়—তাকেই ভাব ও ভাবনার উপাদান উপকরণে তিনি রচনা করেন। বস্তুসত্য থেকে কবির মনে ভাবের উদ্রেক হয়। সেই ভাবোদ্রিক্ত সত্য যখন কাব্যে প্রতিফলিত হয় তখন বস্তু-সত্য ভাব-সত্যরূপ লাভ করে। বস্তু-সত্যের রূপ কবির মানসলোকে কখনও প্রত্যক্ষ দেখার মাধ্যমে কখনো বা পরোক্ষ দেখা বা শোনার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। Yarrow Visited-এর সত্য এবং Yarrow Unvisited-এর সত্য এই ধরনের ব্যাপার। আবার কখনও দেখতে পাই অপ্রত্যক্ষ সত্য বিশুদ্ধ কল্পলোকেই রসরূপ লাভ করে। বাস্তবে কোথাও তাকে পাইনে। একমাত্র মানবজীবনের একটি উপলব্ধির অস্তিত্ব থেকেই তার অপূর্ব রূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সে রূপ নিত্যকালের—তাকে পুরানোও বলিনা নতুনও বলিনা—সে 'চিরাপুরাতন' হয়েও 'নিত্য নূতন'। কবির শিল্পকর্মে এই ধরণের সৃষ্টি 'কোটিতে গোটিক' মেলে। মেঘদূত কাব্য তার উজ্জ্বল নিদর্শন। কাব্যটি ভাবও ভাবনা সমৃদ্ধ। কোথায় সে অলকা আর কোথায় সে রামগিরি! ভূগোলে একটির পরিচয় পাওয়া গেলেও দু'টিই কবির মানস লোকের চিহ্নিত স্থান। এই দু'য়ের বিরাট বিচ্ছেদের ব্যবধানের হ্রাসকল্পে মেঘের সেতু রচিত হয়। বর্ষার দিনে কোনো নারীর সঙ্গে দুঃসহ বিচ্ছেদের গুরুভারের অনুভূতির আনন্দময় প্রকাশ এই মেঘদূত কাব্য। কবি যে ভাব-সত্যটিকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন তার মধ্যে মানবমনের নিত্যকালের বিচ্ছেদ বিরহ সত্যের আবেদনটিই মুখ্য। তাও বিরহের অনুলিপি মাত্র হয়নি—তাকে পূর্ণতা দান

করবার জন্তে কবি কালিদাস নিত্যকালের সকল বিরহীর মনের প্রতীকস্বরূপ বিরহীর ও বিরহানুভূতির রসালেখ্য অঙ্কন করেছেন।

পূর্ণতর শিল্পরূপ দেবার জন্তে মানস ব্যাপারটির সঙ্গে অন্যান্ত কয়েকটি কৌশলও রয়েছে। ভাব-সত্যকে রূপ দিতে গেলে তার প্রকাশভঙ্গিটিও সৃষ্টি-কৌশলের অঙ্গীভূত করে নিতে হয়। সার্থক অর্থযুক্ত শব্দ প্রয়োগের দ্বারা বাক্য নির্মাণ—উপযুক্ত ভাবে ও ভঙ্গীতে তাকে প্রকাশ করা—এবং তার জন্তে বাস্তবে যা পাওয়া গেল তাকে বাড়িয়ে তোলা, অনেক কিছুকে অনাবশ্যকবোধে বাদ দেওয়া—এমন কি শিল্পসৃষ্টির প্রয়োজনে কিছুটা পরিবর্তন করা প্রভৃতি দ্বারা কাব্য সার্থকরূপ লাভ করতে পারে। শিল্পী কখনও বস্তুসত্যের যথাযথ অনুকরণ করেন না। বস্তুর গভীরে যে ভাবটি রয়েছে তাকেই তিনি রূপ দান করেন। লৌকিক বিষয় ও ভাবকে আদর্শ রসঘন রূপ দেওয়া—তাকে আনন্দ-সমৃদ্ধ করে তোলাই শিল্পীর প্রধান কাজ। কবির অক্ষমতা বলতে কি বোঝায় সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে ক্রোচ (Croce) যে গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলি বলেছিলেন আচার্য অতুলচন্দ্র গুপ্ত তাঁর কাব্য জিজ্ঞাসায় তা উদ্ধৃত করেছেন। বস্তুসত্যের অন্তর্নিহিত ভাবটিকে রসরূপ দান করতে না পারাতেই কবির অক্ষমতা প্রকাশ পায়। ক্রোচ কবির অক্ষমতা কোথায় এই প্রশ্ন তুলে তার উত্তরে বলেন—

"The incapacity of seeing particular passions in the light of human passion, aspirations in the fundamental and total aspiration, partial and discordent ideals in the ideal which shall compose them in harmony : What at one time was called incapacity of 'idealizing'. For poetic idealization is not a frivolous embellishment, but a profound penetration, in virtue of which we pass from troublous emotion to the serenity of contemplation'.

লৌকিক ভাবকে রসরূপ দান করতে না পারার জন্তে কবি নিজেও Pure poetic joy (কাব্যানন্দ) অনুভব করতে পারেন না এবং সে কারণে অন্তের মধ্যেও তা সঞ্চার করতে সমর্থ হন না।

বাক্য রসাত্মক হলেই তা শ্রেষ্ঠ কাব্য হবে—একথাটি ভারতীয় আলঙ্কারিকের হলেও সব দেশের শিল্পরসিকরা সাহিত্য সম্বন্ধে এই

idea বা ভাবাদর্শ মেনে নিয়েছেন। লৌকিক সত্যই সৃষ্টিকৌশলের দ্বারা সাহিত্য-সত্যে বা আর্ট-সত্যে রূপান্তরিত হয়। বস্তুর অন্তর্নিহিত ভাবটি শিল্পী নিজে উপলব্ধি করেন তারপর তাকে দশের জন্যই শিল্পরূপ দান করেন। বস্তুর ভাবটি আগে তাঁর মনের মুকুরে প্রতিবিম্বিত হয়—পরে দশের মনের কাছে সেই ভাব রসের আবেদন নিয়ে আসে। প্রথম যে মানস ব্যাপারটি লক্ষ্য করি তা ব্যক্তিগত—শিল্প সেই ব্যক্তিগত ব্যাপারটিকে সাধারণের করে তোলে। এই জন্যেই রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত সাহিত্য ও ললিত কলা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন—'ভাবকে নিজের করিয়া সকলের করা ইহাই সাহিত্য, ইহাই ললিত কলা।'

বাস্তবজগতের সুখ দুঃখের ভাব ও ভাবনা—সবই ব্যক্তিগত ব্যাপার। কবি এই ব্যক্তিগত লৌকিক ব্যাপারকে যখন অলৌকিক রসরূপ দান করেন তখন তার আবেদন ব্যক্তিগত সীমা ছাড়িয়ে যায়। মানুষ যে কাব্যে নিজের ছবি দেখে সে কোন্ ছবি! সে কি তাব হুবহু প্রতিকৃতি? কাব্যের মানুষটি বাস্তবের মানুষের যথাযথ অনুকৃতি নয়। কাব্যে কবি যে চরিত্রকে ভাবরস-মণ্ডিত করে আঁকেন তারই মধ্যে সাধারণ মানুষ নিজেকে দেখতে পায়। সে কি—কি তার সম্ভাব্য রূপ—কোথায় তার পরিণতি—তার পরিচয় রয়েছে কবির সৃষ্টিতে। এই কবি-সৃষ্টি কবি ও সাধারণ পাঠকের মধ্যে একটি সম্পর্ক গ'ড়ে তোলে। কবির সৃষ্টিতে শুধু কবিরই একমাত্র অধিকার নয় তাতে পাঠকেরও অধিকার থাকে। দুই জনের প্রায় সমান অধিকারই থাকে, পাঠকের মনে হবে—

পরস্য ন পরস্যেতি
মমেতি ন মমেতি চ।
তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ
পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে।—সাহিত্যদর্পণ

কাব্যের পরিচয় পরের হয়েও পরের নয়। আমার হয়েও আমার নয়। এই ভাবেই যার আস্বাদ ব্যক্তিত্বের পরিচ্ছেদেই পরিচ্ছিন্ন থাকে না। লৌকিক ভাবকে অতিক্রম ক'রে কবি যে কাব্যরূপ দেবার প্রয়াস পান—বিভাব-অনুভাবাদির মধ্যে দিয়ে সেই ভাব যখন সহৃদয় পাঠকের কাছে রসের আবেদন সৃষ্টি করে—পাঠক যখন সেই রসের আবেদনে সাড়া দেয়—তখনই ভাবের সাধারণীকরণ ঘটে। লৌকিক ভাবের গণ্ডি কাটাতে না পারলে কাব্য রসের আস্বাদ পাওয়া

সম্ভব নয়—সেই জন্তেই কাব্যরস সৃষ্টি করাও সম্ভব হয়না। কবি যে দুঃখের ভাবটি প্রকাশ করেন সেই দুঃখ যদি কবিকেই আচ্ছন্ন করে রাখত তাহলে তিনি কখনও শোকভাব তথা করুণরস সৃষ্টি করতে পারতেন না। শোকভাবটি কবির হৃদয়ের সহানুভূতি-যোগে অপূর্ব রসরূপ লাভ করে। ক্রোধ বা দুঃখ যদি কবির ব্যক্তিগত হয় তাহলে কবির পক্ষে কাব্যে তাকে প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। লৌকিক জগতের সুখদুঃখ কবির চিত্তে যে ভাবরূপ লাভ করে তাকেই তিনি কাব্যে প্রকাশ করেন। বাইরের জগৎ থেকে কবির এই মানস জগৎ সম্পূর্ণ আলাদা। কবি তাঁর জগতের কথা সাধারণের নিকট তুলে ধরেন। প্রকাশ-ব্যাকুলতাতেই কাব্যের সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের মতে মানুষের ধর্মই হচ্ছে নিজের ভাবকে অন্তের মধ্যে সঞ্চারিত করা। সে চায় নিজেকে ব্যাপ্ত করে দিতে। মানুষের মধ্যেই মানুষ নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। মানুষের এই যে অমরতার আকুলতা—এই থেকেই শিল্পের জন্ম হ ল। কবি বাইরের জিনিসকে নিজের করে নিয়ে তাকে আবার বাইরে প্রকাশ করবার জন্মেই গ'ড়ে গেলেন। এই গ'ড়ে তোলা জিনিসটাই সাহিত্য। এর মধ্যে কবির ব্যক্তি-জীবনের ছাপও থাকে। আগেই বলেছি, কবির সৃষ্টি প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ নয়। সাহিত্যিক তো বিবৃতি দিতে বসেননি—সে দায় যদি কারও থাকে তো সাংবাদিকেরই আছে। কবি বাস্তবের জীবনের চেয়েও 'অধিকতর সত্য' একটি সমগ্র জীবন গড়ে তোলেন। এই অসাধ্য· সাধনে কল্পনা, মানবতাবোধ—কবির সহায় থাকে।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে কবিকে তো সাধরণের রুচি ও চাহিদার দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। কবি যে সে লক্ষ্য একেবারেই রাখেননা তা আমরা বলিনা। কিন্তু কবি নিজের রসবোধ, রুচিবোধ দিয়ে স্থান-কাল-পাত্রের রসবোধ, রুচিবোধকে নিজের মতো করে গ'ড়ে তুলতে প্রয়াস পান। যুগধর্ম, যুগচিত্তকে তিনি অস্বীকার করেন না। তাঁর রচনায় তার পরিচয় সার্থকভাবে বিধৃত থাকে। কিন্তু তিনি যখন সেই যুগচিত্তের দাবী মিটিয়েও—বিশেষ কাল ও বিশেষ স্থানের সীমা অতিক্রম করে চিরকালের মানুষের দাবী মেটাতে পারেন তখনই তাঁর রচনা সার্থক হয়ে ওঠে। তাইত রবীন্দ্রনাথ ডন্ কুইক্সট্, রবিনসন ক্রুশোর অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। কালিদাস, সেকস্পীয়র, রবীন্দ্রনাথের আনন্দ উপলব্ধি ও তার প্রকাশ আজ বিশ্বসাহিত্য ক্ষেত্রে এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তাঁরা ব্যক্তিগত-জীবনের সীমা অতিক্রম করে নিজেদের আশা

আকাঙ্ক্ষাকে সকল কালের সকল মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে অপূর্ব প্রতিভাবলে এক ক'রে দিয়েছেন। কবি ও কাব্যের এইখানেই প্রকৃত পরিচয় তথা শ্রেষ্ঠ পরিচয় নিহিত। সাহিত্য তখনই বিশ্বসাহিত্যরূপে পরিগণিত হয়। দেশ কালের সীমা অতিক্রম করে সর্বকালের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করে দেওয়াতেই কবি ও কাব্যের চরম সার্থকতা। কালিদাসের কাব্য-নাটক সেক্‌স্‌পীয়রের নাটক, রবীন্দ্রসাহিত্য তারই উজ্জ্বল নিদর্শন। নিত্যকালের মানব মনের মধ্যেই তারা সার্থক ভাবে প্রতিষ্ঠিত।

সাহিত্যের অবলম্বন ও উপকরণঃ

আমাদের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে কবি যে কাব্য সৃষ্টি করেন তার অবলম্বন ও উপকরণ কি? কোন বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে—কোন অবলম্বন-নির্ভরতায় কবি কাব্য রচনায় মনোযোগী হন! যে শিল্পী প্রতিমা গড়তে যান তার প্রধান উপকরণ বলতে স্থুলদৃষ্টিতে আমরা দেখি কাঠ, খড়, মাটি, রঙ প্রভৃতি। এই সব উপকরণের দ্বারা শিল্পী প্রতিমা গড়েন। নরনারীর জীবনেও পারস্পরিক আকর্ষণের প্রেরণায়—উভয়কেই নানা বিষয়ের, নানা ভঙ্গির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। বিয়ের দিনে নহবতে বাঁশী বাজে—বিয়ে বাড়িতে নানা আচার অনুষ্ঠান পালন করা হয়, বর কনেকেও নানা বিধি বিধানের পথ বেয়ে চলতে হয়। বিবাহ বাসরে কন্যাসম্প্রদান হ'ল—পুরোহিত মন্ত্র পড়লেন—মালা বদল হ'ল—আমরা জানলাম বিয়ে হ'ল। কিন্তু এই যে আনুষঙ্গিক ব্যাপারগুলি এরা একটি সম্পূর্ণ আলাদা ভাবের কারণস্বরূপ হয়। কাঠ, খড়, মাটি, রঙ—এদের নাম প্রতিমা নয়—এদের সমবায়েও প্রতিমা নয়। নরনারী জীবনের বিভিন্ন বিষয় বা ভঙ্গি ও তাদের আকর্ষণের ফলস্বরূপ যে প্রেম—তাও নয়—অন্যদিকে সমগ্র ভাবেও তাদের প্রেম বলা হয় না। বিয়ের ব্যাপারে যে বিভিন্ন বিষয়গুলি উল্লেখ করেছি তারাও আলাদাভাবে বা সমগ্রভাবে বিয়ের ফলস্বরূপ নয়। প্রতিমা গড়তে প্রয়োজন হয়েছে শিল্পকৌশলের, প্রয়োজন হয়েছে শিল্পী-হৃদয় সংযোগের। নরনারী জীবনেও বিষয় বা ভঙ্গির উর্ধ্বে নিষ্ঠা ও সাধনার প্রয়োজন সবার চেয়ে বড়ো। বিয়ের ব্যাপারে বন্ধন-স্বীকৃতির জন্য বর-কনের হৃদয় প্রস্তুতির প্রয়োজন বাইরের অন্যান্য বিধি-বিধানের অনেক ওপরে।

প্রতিমা-রচয়িতা শিল্পীর কথাই ধরা যাক। কাঠ, খড়, কাদামাটি, রঙ নিয়ে তাঁর রচনা শুরু হ'ল—একটি বিশেষ ভাবের রূপায়ণ ঘটল তাঁর রচনার মধ্যে। প্রতিমাকে সম্পূর্ণ রূপ দেবার মূলের স্থূল উপকরণগুলি ছাড়া আরও কয়েকটি উপাদান রয়েছে—শিল্পীর রচনা কৌশল, শিল্পীর স্বপ্ন-সাধনার সার্থকতা এবং রচনার মধ্যে দিয়ে শিল্পীর আত্মপ্রকাশ। মূর্তি রচনা করার স্থূল উপাদানরূপে কাঠ, খড়, মাটি, রঙ-এর মূল্য আছে। কিন্তু প্রতিমার পরিচয় তাদের মধ্যে নয়। সব মিলিয়ে যেটা প্রকাশ পেল তাকে দেখতে গিয়ে কেউ কাঠ, খড়, মাটি, রঙ-এর বিশ্লেষণ করতে বসেন না। রচনার মধ্যে শিল্পীর রচনা-কৌশলকে, তাঁর তন্ময়তাকে, তাঁর সুন্দর সৃষ্টিকে সবাই দেখেন—সবাই আনন্দলাভ করেন। শিল্পীর কৃতিত্ব সেইখানেই। তিনিও চেয়েছেন রসিক হৃদয়কে আকর্ষণ করতে। নিজের সৃষ্টির আনন্দটুকু তিনি সকলের মধ্যে বিতরণ করতে চান। শিল্পীর রচনার ফলকথা হ'ল আনন্দরসাস্বাদন। আমরা আগেই আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছি—এই আস্বাদন ক্রিয়াটি শিল্পী ও শিল্পরসগ্রহীতা—দুজনেরই ব্যাপার। স্রষ্টা সৃষ্টির আনন্দ উপভোগ করেন—সবাইকে দিয়ে উপভোগও করান।

সাহিত্যও এই শিল্পেরই একটি প্রধান ধারা। এর মধ্যে মানুষ নিজেকে জানান দিয়েছে—নিজেকে জেনেছে। সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন তার ভাষা। শব্দার্থময় ভাষা এবং তার গুণ রীতি ছন্দ অলংকার প্রভৃতি সাহিত্য সৃষ্টির মূলে রয়েছে। সাহিত্য রচনায় এদের বাদ দিলে চলে না। আলঙ্কারিকেরা রসকে সাহিত্যের যে প্রধান ও শেষ কথা বলে ঘোষণা করলেন—সেই রস-প্রকাশের মূলেই এই উপাদানগুলি অনিবার্য ও অনস্বীকার্যভাবে বিরাজ করে। তারা আছে বলেই রসপ্রকাশ সম্ভব।

আচার্য অতুলচন্দ্র গুপ্ত বলেন—'কাব্যের লক্ষ্য রস: শব্দ, বাচ্য, রীতি, অলংকার, ছন্দ তার উপায়। কিন্তু এই উদ্দেশ্য উপায়ের যে বিশ্লেষণ, সে হচ্ছে বুদ্ধির কাব্য পরীক্ষার বিশ্লেষণ। কবির কাব্য সৃষ্টিতে ও সহৃদয়ের কাব্যের আস্বাদে, রস ছাড়া এসব উপায়ের স্বতন্ত্র পরিকল্পনা কি আস্বাদন নেই। কারণ, কাব্যের বাচ্য, রীতি, ছন্দ, অলংকার—এই সব ভিন্ন ভিন্ন বস্তু একত্র হয়ে কাব্যের রসকে সৃষ্টি করে না। রসই নিজেকে মূর্ত ক'রে তোলার আবেগে কাব্যের এই সব অঙ্গের সৃষ্টি করে।'

সাহিত্য সৃষ্টিতে এই উপাদানগুলিকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। যখন সাহিত্যিকের রচনা-কৌশলের কথা বলি তখন এই উপাদানের ব্যাপার আমরা

এড়িয়ে যেতে পারি না। বস্তু এবং বস্তুর রস-প্রকাশের কৌশল—সেই সঙ্গে ভাব উদ্রেককারী উপকরণগুলি অবলম্বনেই সাহিত্য গড়ে ওঠে। বিষয়বস্তু কি এবং কিভাবে তাকে প্রয়োগ করা যায়—সেদিকে সাহিত্যিককে লক্ষ্য রাখতে হয়। তবে বিষয়বস্তু ও উপায়ের দিকে লক্ষ্য রাখলেই সাহিত্য পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে না—কবির মনটিও সেই সঙ্গে যোগ করে দিতে হয়। বাইরের জগৎ থেকে কবি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তাকেই তিনি সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ ক'রে দশের মনের কাছে এগিয়ে দেন। সেখানে তার কামনা—'আমার এ ভাব-প্রকাশ দশের দ্বারা অনুভূত হোক।'

সাহিত্য সৃষ্টির মূলে যে নানা উপকরণের কথা বলা হয় তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করতে গিয়ে প্রসঙ্গত বলেছেন—'হৃদয়ের ভাব উদ্রেক করিতে সাজসরঞ্জাম অনেক লাগে।'

'পুরুষ মানুষের অফিসের কাপড় সাদাসিধা—তাহা যতই বাহুল্যবর্জিত হয় ততই কাজের উপযোগী হয়। মেয়েদের বেশভূষা, লজ্জাশরম, ভাবভঙ্গি সমস্ত সভ্যসমাজেই প্রচলিত।...'

'সাহিত্যও আপন চেষ্টাকে সফল করিবার জন্য অলংকারের, রূপকের, ছন্দের আভাসের ইঙ্গিতের আশ্রয় গ্রহণ করে। দর্শন বিজ্ঞানের মতো নিরলংকার হইলে চলে না।'

ভাবের উদ্রেকের জন্যে রবীন্দ্রনাথ-উক্ত রূপক, অলংকার, ছন্দ প্রভৃতির প্রয়োজন। অনেকে এই উপকরণগুলিকেই প্রাধান্য দেন, আবার কেউ কেউ গড়ে তোলার কৌশলকেই প্রাধান্য দেন। আমাদের মনে হয়, এই দু'টিও কাব্যের প্রধান উপকরণ। এদের সংযোগেই কাব্যের সার্থক রসপ্রকাশ ঘটে।

সাহিত্যিক সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে যে ভাবকে প্রকাশ করেন তার মূল আকাশে নয়—আমাদের এই ধূলার ধরণীতে। দেশ কাল সমাজ ও সামাজিক-মন সাহিত্যের অবলম্বন। এই পৃথিবীর ওপর এদের নিয়ে প্রতিনিয়ত যে সুখ-দুঃখ-বেদনার সংঘাত দেখা দিচ্ছে সাহিত্যে তারই প্রকাশ কি ঘটছে না! কাজেই দেশকাল সমাজ ইত্যাদিকেও সাহিত্যের অবলম্বন বলে স্বীকার করে নিতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ চিত্র ও সংগীতকে সাহিত্যের প্রধান উপকরণ বলেছেন। তাঁর মতে 'চিত্র ভাবকে আকার দেয় এবং সংগীত ভাবকে গতি দান করে। চিত্র দেহ এবং সংগীত প্রাণ।' ভাব প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে অলংকরণ বৈশিষ্ট্যে আর

অসামান্ত হয়ে ওঠে সংগীতের দ্বারা। এই চিত্র ও সংগীতের মধ্যে আমরা মানবমনের বিচিত্র গতির সন্ধান পাই। শিল্পী যে চিত্র রচনা করেন—যে সংগীত-লোক সৃষ্টি করেন—তার মধ্যেও এই পৃথিবীর মানব মনের সুখ-দুখ বেদনার বাণীরূপ লক্ষ্য করি। সেই জন্যেই রবীন্দ্রনাথ মানবহৃদয় ও মানবচরিত্রকে সাহিত্যের বিষয় বলে ঘোষণা করেছেন।

মানুষ জন্মগ্রহণ করে; মানুষ মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নেয়। প্রাণস্পন্দন যাঁর আছে তিনিই বেঁচে আছেন—যাঁর নেই তিনি মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিয়েছেন বলে আমাদের সাধারণ বিশ্বাস আছে। কিন্তু প্রাণস্পন্দন থাকলে যে বাঁচা—তা ছাড়াও এ জগতে মানুষ অন্য রকমেও বেঁচে থাকতে চায়। মানুষের পরিচয়ও এই শেষোক্ত ধরনের বেঁচে থাকার ওপরেই নির্ভর করে। মানুষ দেহ নিয়ে বেঁচে থাকে—আবার মন থেকে মনেও মানুষ বেঁচে থাকে। মৃত্যু এসে যখন হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে যায় তখন দেহ নিয়ে বেঁচে থাকার মেয়াদ ফুরোয়। কিন্তু যাঁরা তাঁদের বিশেষ পরিচয় নিয়ে মানুষের মনে বেঁচে থাকেন—মৃত্যু তাঁদের অমরত্ব ঘোচাতে পারে না। তাঁদের মরণজয়ী প্রতিভা—মৃত্যুর পরেও তাঁদের মানুষের মনে মনে বাঁচিয়ে রাখে। 'মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়ের মধ্যে' অমরতা দাবী করে। এই মানুষ এই সংসারে যদি নাও থাকে তবুও একটি কোনো বিশেষত্বের জন্য নিশ্চয় সে অন্য মানুষের হৃদয়ে স্থান পাবে। প্রকাশের তাগিদ, নিজের মনের ভাবটি সকলের কাছে জানাবার প্রেরণা প্রভৃতি শিল্পীমনকে লীলাচঞ্চল করে তোলে। মানুষের এই সব ভাব ও ভাবনা নিয়ে শিল্পী শিল্প রচনা করেন। নিজেকে প্রকাশ করার ব্যাকুলতায়—সবার মনে নিজেকে চিরস্থায়ী করে রাখার চেষ্টায় মানুষের উপায় উদ্ভাবনের ভাবনা-চিন্তার আর শেষ নেই।

এই যে ভাবনা দেখা দিল তার প্রকাশের দু'টি পথ খোলা। একটি জ্ঞানের পথ—অন্যটি ভাবের পথ। জ্ঞান ও ভাবের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্য' গ্রন্থের 'সাহিত্যের সামগ্রী' নামক প্রবন্ধে বলেন, 'যাহা জ্ঞানের কথা তাহা প্রচার হইয়া গেলেই শেষ হইয়া যায়।··কিন্তু হৃদয় ভাবের কথা প্রচারের দ্বারা পুরাতন হয় না।' কবির মতে নিছক জ্ঞানের বিষয় একবার জানলেই আর জানতে হয় না। একবার জেনে গেলেই সে একেবারে পুরানো হয়ে যায়। 'সূর্য পূর্বদিকে ওঠে পশ্চিমদিকে অস্ত যায়' প্রভৃতি কথা জানার ব্যাপারে বেশি মাথা ঘামাতে হয় না। কিন্তু ভাবের কথা পুরানো হয় না। যতই তাকে জানতে চাই

ততই সে নতুন ভাবে নিজেকে আমাদের কাছে জানান দেয়। অনেক দিনের পুরানো অনুভূতি আমাদের মনকে আরও বেশি করে আকর্ষণ করে। তাই মেঘদূত কাব্য আমাদের কাছে পুরানো হয়না। সেক্সপীয়রের নাটক আজও আমাদের সমভাবে রস দান করে। বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের রচনা আজও আমাদের মনকে অনেকখানি অধিকার করে আছে। মানুষের মনে চিরস্থায়িত্বের আকাঙ্ক্ষায় সাহিত্যিক এই ভাবের পথেই যাত্রা শুরু করেন। কাব্য-কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে সাহিত্যিক রস বিতরণ করেন। প্রবন্ধও অনেক সময় তত্ত্ব-গম্ভীর না হয়ে রসপ্রধান হয়ে ওঠে। তাই 'সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন জ্ঞানের বিষয় নহে, ভাবের বিষয়।' তাই তো কবি প্রাকৃত-সত্যের বা বস্তুসত্যের ভিত্তিতেই সম্ভাব্য-সত্য বা সাহিত্য-সত্যকে রূপায়িত করেন। কবির সত্য জ্ঞানের সত্য নয়—ভাবের সত্য। বৈজ্ঞানিক বা নৈয়ায়িকের মতো কবি কোনো কিছু প্রমাণ করতে বসেন না। তিনি ভাব-সত্যকে সাধারণের সামনে তুলে ধরেন।

এই ভাব-সত্যকে প্রকাশ করার জন্য নানা উপায় উপকরণ দরকার। তার মধ্যে প্রধান যেগুলি—তা হচ্চে বস্তু সত্য এবং প্রকাশ কৌশল। 'ভাবের কথাকে সঞ্চার' করার জন্যে বিষয় বস্তু গ্রহণ করা—তাকে কলা-কৌশলে উপস্থাপিত ও প্রকাশ করার কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। সাহিত্যিক যা রচনা করেন তার মধ্যেই তাঁর পরিচয় থাকে। রবীন্দ্রনাথের মতে'… রচনার মধ্যেই লেখক যথার্থরূপে বাঁচিয়া থাকে-- ভাবের মধ্যে নহে, বিষয়ের মধ্যে নহে।' রচনায় ভাব ও বিষয় দুইই থাকবে। কিন্তু ঐ দু'টিই তো রচনা নয়—ওদের নিয়ে যে উপায়ে লেখক অভিনব কিছু সৃষ্টি করলেন—তাকেই রচনা বলি। বিষয় ও ভাব সর্বসাধারণের মধ্যে রয়েছে—'কিন্তু তাহাকে বিশেষ মূর্তিতে সর্বলোকের বিশেষ আনন্দের সামগ্রী করিয়া তুলিবার উপায়-রচনাই কবির কীর্তি।'

কবির অন্তরের কামনাটি রবীন্দ্রনাথের 'পুরস্কার' কবিতায় সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কবি বলছেন—

শুধু বাঁশিখানি হাতে দাও তুলি
বাজাই বসিয়া প্রাণ মন খুলি,
পুষ্পের মতো সঙ্গীতগুলি
ফুটাই আকাশভালে।

অন্তর হ'তে আহরি বচন
আনন্দলোক করি বিরচন
গীত রসধারা করি সিঞ্চন
সংসার ধূলিজালে !

*　　　*　　　*

মুখহাসি আরো হবে উজ্জ্বল
সুন্দর হবে নয়নের জল,
সেই সুধামাখা বাসগৃহতল
আরও আপনার হবে।

*　　　*　　　*

না পারে বুঝিতে আপনি না বুঝে
মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে
কোকিল যেমন পঞ্চমে কূজে—
মাগিছে তেমনি সুর,
কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা,
কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা,
বিদায়ের আগে দু'চারিটি কথা
রেখে যাব সুমধুর।

জগৎ সংসারে যাকিছু কবি হৃদয়ের কাছে ধরা পড়লো তাকেই তিনি তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু স্বরূপ গ্রহণ করে তাদের ভাবরূপকে নিজের করে নিয়ে তারপর তাকে কাব্যের মাধ্যমে প্রকাশ করলেন। যা আছে-- তার উপর আর একটু রঙ চড়িয়ে—বিশ্বের যে সঙ্গীত ধ্বনিত হয় তার মধ্যে আরও সুর— আরও প্রাণ দিয়ে কবি পূর্ণ ক'রে দেন। এইখানেই কবির সার্থকতা। কবি সামাজিক মানুষ ; কিন্তু যখন তিনি রস সৃষ্টি করেন, সেখানে তাঁর সামাজিক পরিচয় গৌণ হয়ে পড়ে।

যে সম্পদময় ভাবের কথা বলা হলো তাতেই শুধু চলবে না। পাঠকের মনে তাকে সঞ্চার করে দিতে হবে। কবি এই সঞ্চার-ক্রিয়ার দ্বারা ভাবকে বিশেষ-ভাবে নিজের করে তোলেন এবং পরেই তাকে আবার সাধারণের জন্য রূপান্বিত করেন। এই কথাটিই রবীন্দ্রনাথ সুন্দর করে বললেন—'ভাবকে নিজের করিয়া সকলের করা ইহাই সাহিত্য,—ইহাই ললিত কলা।' এই ভাবের বিষয়কেই

শব্দার্থময় কথা-বস্তুর মাধ্যমে প্রাণের রঙে রসে রাঙিয়ে কবি আনন্দলোক রচনা করেন। এই রচনায় উপাদান রূপে রয়েছে দেশ, কাল, মানব সমাজ, মানব মন ও তার নানা ভাব। যে শব্দার্থপূর্ণ বাক্য তিনি প্রয়োগ করেন, সেখানেও গুণ, রীতি, ছন্দ, অলংকার প্রভৃতি আছে। এক কথায় কবির রচনা সমগ্র বিশ্বের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে। সব কিছুর ভেতরই তিনি সৃষ্টি রহস্যের মাধুর্য খুঁজে পান। কবি যা সৃষ্টি করেন তা বিশেষ যুগকে, যুগের মানুষকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠলেও শেষ পর্যন্ত সেই যুগাতিশয়ী সাহিত্য যুগকে অতিক্রম করে যায়। বিভিন্ন যুগের মানুষের মনের কাছে রসের বার্তা বহন করে নিয়ে যায়। বিষয়বস্তু কবি-হৃদয়ের গ্রহণের জন্যই যেন উন্মুখ হয়ে থাকে। কবির রচনায় তার রূপ অপূর্বতা লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ বলেন—'যে সকল জিনিস অন্যের হৃদয়ে প্রতিফলিত হইবার জন্য প্রতিভাশালী হৃদয়ের কাছে সুর, রঙ, ইঙ্গিত প্রাথনা করে, যাহা আমাদের হৃদয়ের দ্বারা সৃষ্টি না হইয়া উঠিলে অন্য হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না, তাহাই সাহিত্যের সামগ্রী। তাহা আকারে প্রকারে, ভাবে ভাষায়, সুরে ছন্দে মিলিয়া তবেই বাঁচিতে পারে; তাহা মানুষের একান্ত আপনার; তাহা আবিষ্কার নহে, অনুকরণ নহে, তাহা সৃষ্টি।'

সাহিত্যের প্রকাশের বাহন শব্দ ও ভাব, ভাববস্তু ও শিল্প কাঠামো প্রভৃতি বিষয় অভিন্ন হয়েই রচনায় দেখা দেয়। মানবদেহ ও প্রাণের যে সম্পর্ক— এদেরও সেই সম্পর্ক। এদের আলাদা করে রাখা যায় না। form ভালো কিন্তু content নেই—content ভালো কিন্তু form দুর্বল—দুই ব্যাপারেই রচনা দুর্বল হয়ে পড়ে। সাহিত্যিকের ভাবনা কি এবং কেমন করে তিনি সেই ভাবনা প্রকাশ করেন—রস প্রকাশে এই দু'টি ব্যাপারের পার্থক্য আর থাকেনা। শ্রেষ্ঠ কাব্যে এই দু'য়ের ভিন্নতা ঘুচে যায়।

শ্রেষ্ঠ কাব্যের লক্ষণ:

আচার্য অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় তাঁর 'কাব্য জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে ধ্বনির আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন'…যা শ্রেষ্ঠ কাব্য তার প্রকৃতিই হচ্ছে বাচ্যকে ছাড়িয়ে যাওয়া। শব্দার্থমাত্রে যেটুকু প্রকাশ হয়, সেই কথাবস্তু কাব্যের প্রধান কথা

নয়। তা যদি হ'ত, তবে যার শব্দার্থের জ্ঞান আছে, তারই কাব্যের আস্বাদন হ'ত। কিন্তু তা হয়না।' 'ধ্বন্যালোক' থেকে অনুকূল মন্তব্য তিনি উদ্ধৃত করেছেন—'শব্দার্থশাসন জ্ঞানমাত্রেণৈব ন বেদ্যতে'—অর্থাৎ শব্দার্থের জ্ঞান হলেই তার (কাব্যের সার অর্থের) জ্ঞান হবে এমন কোনো কথা নেই। বাক্যে যা প্রকাশ পায় তাই কাব্যের শেষ কথা নয়। তার আড়ালে যা রইল—সেই খানেই কাব্যের যথার্থ পরিচয় নিহিত। এই প্রসঙ্গে ধ্বনিকার বলেন—

প্রতীয়মানং পুনরন্য দেব বস্তস্তি বাণীষু মহাকবীনাম্।
যত্তৎ প্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং বিভাতি লাবণ্যামিবাঙ্গনাসু ॥

—ধ্বন্যালোক

অর্থাৎ নারীদেহের লাবাণ্য যেমন অবয়ব ইত্যাদির অতিরিক্ত অন্য কিছু, তেমনি মহাকবিদের বাণীতেও এমন সব বস্তু আছে যা তাদের অর্থাৎ শব্দ, অর্থ প্রভৃতির অতিরিক্ত অন্য কিছু। বারবার রসবেত্তারা যে 'অতিরিক্ত কিছুর' কথা বলেন—তাই হচ্ছে তাঁদের কাব্যের প্রাণ।

প্রত্যেক কাব্যেই বাচ্যের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। কথাই ভাবপ্রকাশের প্রধান বাহন। প্রধান বলছি এই জন্যেই যে ছবিতেও ভাবপ্রকাশের আকুলতা রয়েছে। কিন্তু কাব্যের ভাবটি কথার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলিতে বাচ্যের অতিরিক্ত এবং বাচ্য-অতিক্রমী একটি ব্যঞ্জনা আছে। এই ব্যঞ্জনাতেই কাব্যের আসল পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের পত্রপুটের একটি কবিতাংশে এর পরিচয় পাওয়া যাবে—

হৃদয়ের অসংখ্য অদৃশ্য পত্রপুট
গুচ্ছে গুচ্ছে অঞ্জলি মেলে আছে
আমার চারিদিকে চিরকাল ধরে
আমি-বনস্পতির এরা কিরণ-পিপাসু পল্লবস্তবক
এরা মাধুকরী ব্রতীর দল
প্রতিদিন আকাশ থেকে এরা ভরে নিয়েছে
আলোকের তেজোরস,
নিহিত করেছে সেই অলক্ষ্য অপ্রজ্জ্বলিত অগ্নিসঞ্চয়
এই জীবনের গূঢ়তম মজ্জার মধ্যে। ইত্যাদি ॥

উদ্ধৃত অংশটিতে কবির বক্তব্য বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে গেছে। এর মধ্যে এমন একটি সূক্ষ্ম অন্তর্নিহিত ভাব আছে—যা আমাদের মনে বহু ভাবনার

উদ্রেক করে। সেই ভাবটিই উদ্ধৃত কাব্যাংশটির মূল ভাব—বাইরে যে অর্থ প্রকাশ পেল—কবিতার ক্ষেত্রে তার মূল্য গৌণ। অনুরূপ শেলির Ode to the West Wind কবিতাটির কিছুটা উদ্ধৃত করে দেখাচ্ছি। সেখানেও বাচ্যার্থের অতিরিক্ত অন্য একটি অর্থ রয়েছে এবং তাই কাব্যের মূল অর্থ—

Make me thy lyre, ev'n as the forest is :
What if my leaves are falling like its own !
The tumult of thy mighty harmonies
Will take from both a deep autumnal tone.
Sweet though in Sadness......................

... ...

Be through my lips to unawakend earth
The trumpet of a prophecy ! O Wind
If Winter comes, can Spring be far behind !

শব্দ-অর্থহীন কাব্য কখনো হতে পারে না। শব্দার্থই কাব্যের শরীর—শব্দার্থের শুভ মিলনেই কাব্যের উৎপত্তি। কিন্তু এই শব্দ ও অর্থ ই কাব্যের প্রাণ নয়—কাব্যর শেষ কথা নয়। শব্দার্থের জ্ঞান জন্মালেই কাব্যবৈশিষ্ট্য ও কাব্যবৈচিত্র্য বোঝা যায় না। এ দু'য়ের অতিবিক্ত যা তাই কাব্যের বিষয়বস্তু। বাচ্যার্থ কাব্যের মূল অর্থটি প্রকাশ করে না। কাব্যের শেষ অর্থ—যাকে কাব্যের শ্রেষ্ঠ ফল বলা যায়—তা বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে অতিরিক্ত ব্যঞ্জনাটুকুর মধ্যেই প্রকাশ পায়। বাইরের পরিচয়ে কাব্যের গথার্থ মূল্য বিচার করা যায় না। যাঁরা ঐভাবে বিচার করতে যান তাঁরা কাব্যরসাস্বাদন থেকে বঞ্চিত থাকেন। 'বলাকা' কাব্যের 'বলাকা' নাম-কবিতার মূলকথা গতি-বেগের আবেগ। সেই গতি-অনুভব প্রকাশিত হচ্ছে এ ভাবে—

তৃণদল
মাটির আকাশ 'পরে ঝাপটিছে ডানা ;
মাটির আঁধার নিচে, কে জানে ঠিকানা—
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।
দেখিতেছি আমি আজি—
এই গিরিরাজি,

এই বন, চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
দ্বীপ হতে দ্বীপন্তরে, অজানা হইতে অজানায়।

এই অংশের আপত-অর্থটিতে কবিতার ভাবগৌরব অনুপস্থিত। গান শুনতে বসে যিনি রসের গভীরে প্রবেশ না করে শুধু গানের তাল লয় প্রভৃতি বুঝতে চেষ্টা করেন এবং তা দিয়েই গানের মূল্য বিচার করতে বসেন তিনি গানের মূল-রস থেকে বঞ্চিত হন। তাল লয় বাদ দিতে বলছি না—কিন্তু তাই ত গানের একমাত্র পরিচয় নয়! কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব সেইখানেই—যেখানে বাচ্যার্থকে 'এহ বাহ্য' বলে—তাকে অতিক্রম করে অরূপরতনের প্রত্যাশায় রূপসাগরের অতল গভীরে ডুব দেওয়া হয়—যেখানে heard melodiesএর চেয়ে unheard melodies-কেই শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নেওয়া হয়। বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে যে ভাব প্রকাশ পায়—আলঙ্কারিকেরা তাকে বলেছেন 'ধ্বনি'। এই ধ্বনি বাচ্যার্থ অতিরিক্ত অথচ বাচ্যার্থেই নিহিত। এই ধ্বনিই কাব্যে বাচ্যার্থকে অতিক্রম ক'রে 'অতিরিক্ত আর কিছু' রূপে প্রকাশ লাভ করে।

আমার এ ধূপ না পোড়ালে
গন্ধ কভু নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে
দেয়না কভু আলো। ইত্যাদি।—এই গীতাংশটির

বাচ্যার্থই বা কি—আর রবীন্দ্রনাথই বা কি বলতে চেয়েছেন ! এই দু'য়ের মধ্যে কতো তফাৎ। 'কুমার সম্ভবম্' কাব্যে আমরা দেখি—দেবর্ষি যখন পর্বতরাজের কাছে শিবের সঙ্গে উমার বিয়ের কথা তুললেন—তখন পিতৃপার্শ্ব-স্থিতা উমা—

এবং বাদিনী দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী।
লীলাকমল পত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী ॥

অর্থাৎ তিনি মাথা নিচু ক'রে লীলাপদ্মের দলগুলি গণনা করতে লাগলেন। এইভাবে মাথা নিচু ক'রে পদ্মদল গণনার আলেখ্যটির মাধ্যমে মহাকবি কালিদাস উমার পূর্বরাগজনিত লাজনম্রিত মুখের কথাই আভাসে বললেন। বিয়ের কথা শুনে ওরকম একটু লজ্জা পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু 'লজ্জায়' কথাটা কবি বলেননি—'মাথানিচু' করা থেকেই আমরা ধরে নিয়েছি যে উমা লজ্জা বোধ করছেন। অন্যান্য বিখ্যাত কাব্য আলোচনা করলেও দেখতে পাবো এই ধরনের বাচ্যার্থ-অতিরিক্ত নিগূঢ় অর্থটি সর্বত্র বিদ্যমান।

যে কাব্যে এই ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা নাই—তাকে আমরা কখনও শ্রেষ্ঠ কাব্য বলতে পারিনা। এমন অনেক কাব্য-কবিতা আছে—যার বাইরের চাকচিক্যই প্রধান—সেখানে বাইরের কলাকৌশলই মুখ্য। কিন্তু তার সেই সজীবতা কই! ব্যঙ্গ্যার্থ না থাকলে কাব্যও প্রাণহীন হয়ে পড়ে। হয়ত যে অর্থটি সোজাসুজি প্রকাশ পায় তার আংশিক সত্য আমাদের মনকে প্রথমেই আকৃষ্ট করে। কিন্তু তার স্থায়িত্ব বেশিক্ষণের নয়। তাতে কানের তুষ্টি বা ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি থাকতে পারে কিন্তু প্রাণের আনন্দ নেই। ব্যঙ্গ্যার্থের সঙ্গে এই আনন্দ নিবিড় বন্ধনে বাঁধা। এই প্রসঙ্গে এও মনে রাখা প্রয়োজন যে বাক্য অতিক্রমকারী কাব্যেও কলাকৌশল, বাক্‌নৈপুণ্য যে নেই তা নয়—আমরাও তা বলিনা। তার বাহ্যরূপ আমাদের বহুল পরিমাণে মুগ্ধ করে। কিন্তু বাহ্য রূপৈশ্বর্য তার শেষ কথা বা একমাত্র কথা নয়। শ্রেষ্ঠ কাব্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয় ইঙ্গিতার্থের মধুর রসপ্রকাশে ও রসাস্বাদে।

সাধারণ মানুষের জীবনে এই পৃথিবী একান্ত প্রয়োজনের পৃথিবীরূপেই দেখা দেয়। প্রতিদিনের এই প্রয়োজনের পৃথিবীতে যে সাহিত্য শুধু একান্ত আবশ্যকীয় কথা বলে তার কিছুটা মূল্য আছে বটে,—কিন্তু যে সাহিত্য নিতান্ত আবশ্যকীয় কথা না বলে বিশুদ্ধানন্দের কথা বলে রসিকজনের কাছে তার মূল্য সবচেয়ে বেশি। এই প্রয়োজনাতিরিক্ত রচনায় সেই রসব্যঞ্জনা আছে বলেই তা আমাদের কাছে এত বেশি মূল্যবান। এই ধরনের রচনা একদিন যে বিশেষ ভাবে দৃষ্টির ভিত্তিতে রচিত হয়েছিল—সেই 'বিশেষ'—নির্বিশেষ রসানুভূতি জাগিয়ে তোলে। পৃথিবীর বিরহের প্রেমগীতি হিসাবে একদিন মেঘদূত রচিত হয়েছিল। একটি বর্ষার দিনে কোনো এক বিরহিনী কান্তার বিরহের গুরু ভারের কথা—কোনো একজন পুরুষের বিরহ বেদনা--ছিল তার উপকরণ। সেদিন যে বিশেষ বাণী মেঘদূত বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল—তাই যুগ যুগ ধরে মানুষকে বিচ্ছেদ-বিরহের অমর কাহিনী শুনিয়েছে। আজ মেঘদূত আমাদের কাছে নিত্যকালের নর-নারীর বিরহের একমাত্র প্রতীক। আমরা তাজমহলকে সম্রাট সাজাহানের মেঘদূত কাব্য বলে অভিহিত করি। তার একমাত্র কারণ, কালিদাসের মেঘদূত যে বিশেষ ভাবটি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল পরবর্তীকালে তাই মানুষের বিচ্ছেদ বিরহের একটি স্থায়ী রসরূপ লাভ করে। একথাটি আমরা পূর্বেও আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি।

সেক্‌স্‌পীয়রের ম্যাকবেথ নাটকে ম্যাকবেথ তাঁর পত্নী লেডি ম্যাকবেথের মৃত্যু সংবাদ শুনে বলেন—

Tomorrow, and to-morow, and to-morrow,
Creeps in this petty pace from day to day
To the last Syllable of recorded time.
And all our yesterdays have lighted fools
The way to dusty death. Out, Out, brief candle !
Life's but a walking shadow, a poor player
That struts and frets his hour upon the stage
And then is heard no more : it is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury
Signifying nothing.'

লেডি ম্যাকবেথের মৃত্যুর ভিত্তিতে বলা হ'লো—কিন্তু শেষ পর্যন্ত জীবনের অসারতার ওপর দার্শনিকের উক্তির মতো ম্যাকবেথের বিখ্যাত উক্তিটি আপাত অর্থ অতিক্রম করে এমন একটি ব্যঙ্গ্যার্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে—উক্তির ব্যাচ্যার্থ অতিক্রম করে যে 'অতিরিক্ত কিছুর' আভাস জেগে উঠেছে—তার মূল্য কখনই হ্রাস পাবে না। রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর, রাজা, অচলায়তন, মুক্তধারা, রক্তকরবী, ফাল্গুনী প্রভৃতি নাটক এবং খেয়া, গীতাঞ্জলি প্রভৃতি প্রায় সব কাব্য সম্বন্ধেই একই কথা বলা যেতে পারে।

বাচ্যার্থ কাব্যের বহিরঙ্গ—তাই বাচ্যার্থে কাব্য সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। যদি কাব্যের গভীরে রসব্যঞ্জনা না থাকে তাহলে তাকে শ্রেষ্ঠ কাব্য বলা যায় না। তাই ব্যঞ্জনা বা ধ্বনিহীনকাব্য—শ্রেষ্ঠ কাব্য নয়। বাচ্যার্থ অতিক্রমকারী প্রতীয়মান অর্থই ধ্বনি। একমাত্র 'অপূর্ব বস্তু নির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা'ই বাচ্যাতিরিক্ত ব্যঙ্গ্যার্থ বা রসধ্বনিকে প্রকাশ করতে পারে—এবং তখনই কবি-প্রতিভার সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হয়। প্রতীয়মান অর্থটি বাচ্যার্থকে অবলম্বন করে উদয়াচলের সূর্যের মতো ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়। আচার্য অতুলচন্দ্র গুপ্ত বলেন, '…শ্রেষ্ঠ কাব্য নিজের বাচ্যার্থে পরিসমাপ্ত না হয়ে বিষয়ান্তরের ব্যঞ্জনা করে। আলংকারিকেরা কাব্যের এই বাচ্যাতিরিক্ত ধর্মান্তরের অভিব্যঞ্জনার নাম দিয়েছেন ধ্বনি।' ধ্বনিবাদীদের মতে এই ধ্বনিই কাব্যের আত্মা—বাচ্যার্থ তার অবলম্বন মাত্র

সাহিত্যে আদর্শবাদ ও বস্তুবাদ ঃ

মানবজীবনে প্রয়োজন দুদিক থেকে অনুভূত হয়। একটি দেহের ও আর একটি মনের। প্রথম দিকে মানুষ তার দেহের প্রয়োজন মেটাবার চিন্তাতেই নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিল। এইভাবে অনেক দিন কেটে গেল। কিন্তু মানব জীবন তো দেহসর্বস্ব নয়—তাই শুধু দৈহিক প্রয়োজন বোধ তার জীবনকে সীমায়িত করতে পারেনি। মানব সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন ধীরে ধীরে জেগে উঠল—ক্রমে মানুষ অনুভব করতে শিখল এবং ক্রমশ এও জানল যে বাঁচতে হলে দেহের প্রয়োজনের চেয়ে মনের প্রয়োজন কম নয়। মানুষের শ্রেয়োবোধের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাই তাকে শিল্পপ্রেরণা জুগিয়েছে—মানুষ চিত্র অঙ্কন করেছে—সাহিত্য সৃষ্টি করেছে। জীবনের মহিমা ও তার সৌন্দর্যের উপলব্ধিই সাহিত্যের গোড়ার কথা। সাহিত্যে মানুষ তার মনের ভাবকে ভাষারূপ দান করে, দশের সামনে তুলে ধরে। জীবনের নানা ঘটনার বর্ণনা সাহিত্যে প্রকাশ পায়। তার কারণ—সাহিত্য ও মানবজীবন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। শ্রেষ্ঠ রসসাহিত্যের উদ্দেশ্য আনন্দ সৃষ্টি হলেও তার অবলম্বন হচ্ছে সামাজিক জীবন। শিল্পী কখনও মানুষকে এড়িয়ে শুধু বাইরের জগৎ নিয়েই শিল্প সৃষ্টি করেন না। মানব জীবন-জিজ্ঞাসাকে তিনি এড়িয়েও যান না। কাজেই শুধু রসাস্বাদনের জন্যেই—আনন্দ লাভের জন্যেই একান্তভাবে সাহিত্য সৃষ্টি একথা আজ মূলত স্বীকার করলেও—মানব কল্যাণের ব্যাপারটিও সাহিত্যের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।

সাহিত্যের প্রকাশ ও জীবনের প্রকাশের মধ্যে পার্থক্য অনেক। সাহিত্যে বর্ণিত ঘটনা জীবনের বাস্তব ঘটনার চেয়ে অনেক বেশি জীবন্ত ও বিস্ময়কর। জীবনের বিচিত্র অনুভূতিগুলি শিল্পীর রঙে রসে মিশে বিশ্বজনের আস্বাদ্য রস-সামগ্রীতে পরিণত হয়—সাহিত্যে এই রসেরই প্রকাশ—তাইতো তাকে সহৃদয় হৃদয়-সংবাদী বলা হয়েছে। লেখক-মনের সঙ্গে পাঠক-মনের সহৃদয়ত্বই সাহিত্য।

সাহিত্যে আদর্শবাদ ও বস্তুবাদ নিয়ে অনেক দিন ধরেই অনেক আলোচনা চলে আসছে। এই নিয়ে বেশ মতবিরোধও অনেক সময় দেখা দিয়েছে। সাহিত্যে আদর্শবাদ থাকবে—না সাহিত্য বস্তুবাদী হবে—তাই নিয়ে নানা

বিতর্ক প্রচলিত আছে। সাহিত্যবিষয়ক কোনো মতবাদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণায় আসতে হলে প্রথমে আমাদের সাহিত্যের মূল লক্ষ্য কি এবং সাহিত্যে ঐ সব মতবাদের স্থান কোথায়—সে সম্বন্ধে সুষ্ঠ ধারণা থাকা প্রয়োজন।

আনন্দ-রস পরিবেষনকে কেউ কেউ সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য বা পরিণতি বলে মনে করেন। তাঁদের মতে সৌন্দর্যবোধেই সাহিত্যের একমাত্র সার্থকতা। সাহিত্য কোনো আদর্শ বা নীতি প্রচার করেনা। শোকজাত যে শ্লোক—সেই শ্লোক শুধু শোকেই সীমাবদ্ধ থাকেনি—তা আমাদের নির্লিপ্ত আনন্দলোকে পৌঁছে দিয়েছে। মহৎ দুঃখ ও মহৎ বেদনা—শিল্পীর মনের প্রকাশের ব্যাকুলতাই —সাহিত্য সৃষ্টির যে সহায়ক এই সত্যই আমরা প্রাচীন কবি ও কাব্যের আলোচনায় লাভ করেছি। বিরহী যক্ষের বিচ্ছেদ বেদনাকে মহাকবি কালিদাস তাঁর কাব্যে যে শাশ্বত রূপদান করেছেন—তার মূলে নিশ্চয় কোনো আদর্শবাদ বা নীতি প্রচারের উদ্দেশ্য যে ছিল না—তা পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিতে হয় না। মেঘদূত কাব্য মানুষের মনের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার এক চিরন্তন রূপ পরিগ্রহ করে আজও আমাদের কাছে আনন্দরস বিতরণ করছে। কালিদাসের মেঘও পুরানো হলো না—তাঁর কাব্যখানি পুরাতন হয়েও নিত্য-নতুন হয়ে রইল। শিল্পক্ষেত্রে সমাজনীতির স্থান আছে কিনা এবং থাকলেও তা কতখানি—এই প্রশ্ন প্রাচীন ভারতের সাহিত্য ও সমাজ-জীবনে তেমন সমস্যামূলক হয়ে দেখা দেয়নি। তবে প্রাচীনেরা সুন্দরের রসপ্রকাশকে শিল্প-সাহিত্যের চরম লক্ষ্য বললেও—তাঁরা সত্য ও সুন্দরকে এক করে দেখার প্রয়াস পেয়েছেন। শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁরা শ্রেয়োবোধকে প্রেয়োবোধ থেকে আলাদা করে দেখেননি। সত্য ও সুন্দরের কল্যাণ মিশ্রণে সে যুগের সাহিত্য-শিল্প সাহিত্যের নিজস্ব নীতির ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল।

আদর্শবাদ ও বস্তুবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন ব্যাপারে এই কথা বলা যায় যে, আমাদের মনোজগতের বোধগুলি নিজেদের মধ্যে মিল বা সঙ্গতি-রেখে পাশাপাশি বাস করে। এদের মধ্যে কোনটি অযথা চঞ্চল হলে বা অন্যপথে ধাবিত হ'লে মনোজগতে বিদ্রোহের ভাব জাগে। কাজেই তাদের সঙ্গতি বজায় রাখা একান্ত দরকার। সাহিত্যেও তেমনি বিভিন্ন মতবাদের সমন্বয় থাকা দরকার। এই সমন্বয়কে অতিক্রম করে বিশেষ কোনো নীতিবাদকে স্থাপন করতে গেলে সাহিত্যের মূল্যমানও হ্রাস পাবে। সাহিত্য সৃষ্টি শুধু সমাজ কল্যাণের জন্যেই—একথা বলা যায় না। যাঁরা আদর্শবাদের বিপক্ষে বলেন—তাঁদের মতে

সামাজিক রীতিনীতি, সামাজিক আদর্শের মাপকাঠিতে সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্র প্রভৃতির মূল্য নিরূপণ করতে গেলে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে আদর্শবাদকে অস্বীকার করেননি। তাঁর মতে মঙ্গলের আদর্শ থেকে বিচ্যুত যে সাহিত্য—তা কখনও আদর্শ সাহিত্য হতে পারেনা এবং সেই ধরনের সাহিত্য-সৃষ্টিকে তিনি অন্যায় ও পাপ বলে মনে করতেন। সাহিত্যে নীতি কথাটি কোনো না কোনো ভাবে থেকে যায়—আর সেদিক থেকে বিচার করলে সাহিত্যে আদর্শবাদের একটা স্থান আছে। শ্রান্ত ও বিভ্রান্ত মানুষকে নতুন পথের সন্ধান দেবার জন্যে—তার অপূর্ণতার মধ্যে পরিপূর্ণতার আভাস জাগিয়ে তোলার জন্যে সাহিত্যিকের শুভপ্রয়াস লক্ষিত হয়। তিনি কোনো একটা আদর্শ বা লক্ষ্যকেই তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতে চান। তা ছাড়া সমাজের মানুষ হিসাবে আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু কর্তব্য রয়েছে। সেইদিক থেকে দেখতে গেলে, সাহিত্যিক যদি তাঁর জ্ঞানবিশ্বাস মতে মানব সমাজের সামগ্রিক উন্নতি ও অগ্রগতির জন্যে সাহিত্য সৃষ্টি করতে গিয়ে কোনো মতবাদ প্রচার করেন—তাকে অন্যায় এবং অসংগত বলে পরিত্যাগ করা যায় না। সাহিত্যিক তাঁর জীবনের আদর্শকে যে সাহিত্যে প্রতিফলিত করবেন—তা খুবই স্বাভাবিক।

সাহিত্যে আদর্শবাদ-প্রচারের নীতিকে মেনে নিলেও তার একটা সীমা থাকা দরকার। সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি—রূপসৃষ্টি। সাহিত্যের নীতি-জ্ঞানের অতিরিক্ততা যাতে তার মূল উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে না দেয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার। প্রকৃত শিল্পী বা সাহিত্যিক তাঁকেই বলা যায়—যিনি সাহিত্য-সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যকে ক্ষুন্ন না ক'রে—তাঁর আদর্শকে তার মধ্যে দিয়ে প্রচার করতে পারেন। তবে শিল্পীর এই আদর্শবাদ বা নীতিজ্ঞান 'কান্তাসম্মিতঃ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। নারী যেমন মনোজয় করেন—ঠিক তেমনই শিল্পীকেও পাঠক বা দর্শকের চিত্ত জয় করার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সৃষ্টি-কর্মে সাহিত্যিককে মধ্যে মধ্যে আড়ালে থাকতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য সৃষ্টিতে এই নিয়ম সব-সময় রক্ষা করতে পারেননি বলে অনেকে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তিনি প্রায়ই আর্টের রীতি লঙ্ঘন ক'রে যবনিকার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে পাঠককে নীতি শিক্ষা দিয়েছেন ব'লে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের উপসংহারে তিনি বলেন, 'আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি ইহাতে ঘরে ঘরে অমৃত ফলিবে।' উপন্যাসের শেষে এসে এই

কথা না বললেও পাঠক উপন্যাস পাঠ ক'রে কাহিনীর ভেতর থেকেই ত জানতে পারে। আলাদা ভাবে তা বলে না দিলেই হয়ত ভালো হতো। বঙ্কিমের স্বপক্ষে একথা বলা যায় যে, বঙ্কিমের যুগ-পরিবেশ তাঁকে নীতি-নিরপেক্ষ সাহিত্য রচনা করতে দেয়নি। জাতির চিন্তানায়করূপে এবং শিল্পীরূপে আমরা তাঁকে পেয়েছি। সাহিত্য ক্ষেত্রে এই দুইটি দায়িত্বই যুগপৎ তাঁকে পালন করতে হয়েছে। যুগের ঐতিহ্য তাঁকে একেবারে সংস্কার মুক্ত বা নির্লিপ্ত শিল্পী হতে দেয়নি। শিল্পী প্রচার করবেন না একথা আমরা বলি না—তবে তিনি কেবলমাত্র প্রচারকই নন।

আদর্শবাদী সাহিত্যে যে নীতির কথা থাকে—তাতে আমাদের বিশেষ কোনো আপত্তি নেই। কারণ মহৎ সাহিত্যমাত্রেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নীতি প্রচার থাকে। সুন্দরের সঙ্গে মানব জীবন-সত্যের মূলত কোনো বিরোধ থাকতে পারেনা। কিন্তু শিল্পী যদি সুন্দরের সীমা লঙ্ঘন করে নীতি প্রচার করেন—তাহলে সেখানে art-এর সীমাকেও লঙ্ঘন করা হয়। সাহিত্যে কতখানি প্রচার থাকবে বা থাকবে না—তার বিশেষ কোনো নিয়ম-নির্দেশ নেই। সাহিত্যে আদর্শবাদ কিছু না কিছু থাকবে—তবে তা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে থাকাই বাঞ্ছনীয়। সাহিত্যিক তার আখ্যান ভাগের নেপথ্যে থেকে সাহিত্যের মূল রসকে অক্ষুণ্ণ রেখে যদি আদর্শবাদ প্রচার করেন তা হলে তা অসঙ্গত হয় না।

একদল সাহিত্যিক সাহিত্যে বাস্তববোধকে প্রাধান্য দেন। তাঁরা যখন সাহিত্যে রূপসৃষ্টি ও রসসৃষ্টিকে প্রধান করে তোলেন—তখন পর্যন্ত তাঁদের বিরুদ্ধে বলার কিছু থাকে না। কারণ বস্তু-নিরপেক্ষ শিল্পকর্ম বা সাহিত্য কর্মের কোনো মূল্য আমার দিইনা। কিন্তু তাঁরা যদি বলেন—সাহিত্য রস-সর্বস্ব—তার আর কোনো উদ্দেশ্য নেই—নীতির সঙ্গে সাহিত্যের কোনো সম্পর্ক নেই—তখন সেই মতও আমরা প্রশ্নাতীতরূপে গ্রহণ করিতে পারি না। এক সময় বাস্তবতার নামে যে নগ্নতা, জীবনের যে কুশ্রীতা য়ুরোপের সাহিত্যে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল—সেই উগ্র sense of fact-কে—বাস্তবের অবাঞ্ছিত নগ্ন রূপায়ণকে—অনেকেই নিন্দা করেছেন। আমাদের দেশে বিংশ শতাব্দীতে য়ুরোপের সেই উনবিংশ শতাব্দীর কালো-হাওয়া শিল্পী মনকে কিছুটা আচ্ছন্ন করেছিল। রসসৃষ্টির নামে—এই ধরনের বাস্তববোধকে মেনে নেওয়া যায় না। নীতি-বিরোধী উপকরণ নিয়ে শিল্পী যতোই শিল্প-সৃষ্টির প্রয়াস পান না কেন—

পাঠক হৃদয় যদি তা থেকে রস পিপাসা মিটাতে না পারে—তাহলে শিল্পকর্মও ব্যর্থ হয়ে যাবে। চিত্তের বিকৃতি ও কদর্যতার ভিত্তিতে কালজয়ী শিল্প-সৃষ্টি সম্ভব নয়।

কারো কারো মতে সাহিত্যের রূপ নির্ভর করে—সামাজিক ও আর্থিক পরিবেশের উপর। কেউ কেউ আবার বাস্তব জীবনের সত্যাসত্যের মাপ-কাঠিতে সাহিত্যের গুণাগুণ বিচারের পক্ষপাতী। কোনো পাওনাদার শাইলকের মতো সুদের পরিবর্তে দেহের মাংস দাবী করতে পারে কিনা—তার সত্যাসত্য বিচারের মাধ্যমেও সাহিত্য বিচার করতে চান। সাহিত্যে ব্যক্তি-চরিত্রের যথাযথ প্রতিকৃতি থাকবে কিনা তা বিচার করে দেখতে হয়। আমাদের সাহিত্য-শাস্ত্রকাররা বলেই রেখেছেন যে, সাহিত্য বস্তুসত্যের যথাযথ অনুকরণ নয়। সাহিত্যে আমরা যে সত্যের পরিচয় পাই—বাস্তবের কোনো একটি বিশেষ বস্তুর মধ্যে তাকে সমগ্রভাবে পাওয়া যায় না। অনেকে বলেন—সাহিত্য সমাজের বাস্তব রূপকে প্রতিফলিত করবে। এঁদের বক্তব্যের উত্তরে বলা যায় যে, সমাজের যথাযথ বর্ণনা যদি সাহিত্যের কাজ হয়—এবং সেই বর্ণনা থাকা না থাকার ভিত্তিতেই যদি সাহিত্য বিচার করা হয়—তাহলে ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভূগোল, চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতিকেও সাহিত্য আখ্যা দিতে হয়। সমাজ ব্যবস্থার খাঁটি বর্ণনাই যদি সাহিত্য বিচারের মাপকাঠি হয়, তাহলে সেক্‌স্‌পীয়রের চেয়ে বেন্ জনসনের সাহিত্য-সৃষ্টিকেই শ্রেষ্ঠ বলতে হয়। কারণ এলিজাবেথীয় যুগের ইংলণ্ডের সমাজ-ব্যবস্থার ছবি সেক্‌স্‌পীয়রের চেয়ে বেন জনসনই নিখুঁত ভাবে এঁকেছেন।

বর্তমান কালের কোনো কোনো সাহিত্যকারের মতে, বস্তুধর্মিতার মূলে রয়েছে সমাজ ব্যবস্থার অসম বিন্যাস এবং মনুষ্যত্বের অবমাননা-জনিত ক্ষোভ। তাঁদের মতে—এতদিন আমরা যে সাহিত্য-সম্পদের অধিকারী ছিলাম—সেখানে সাধারণ মানুষের আত্মপ্রকাশের কোনো সুযোগ ছিল না। সমাজের বিশেষ শ্রেণীর মানুষেরই অর্থাৎ অভিজাত সম্প্রদায়ের সুখ-দুঃখের রূপালেখ্য নিয়েই সাহিত্য রচিত হয়েছে। রিক্ত বঞ্চিত মানুষের জীবনের সার্থক কোনো প্রকাশ সে যুগের সাহিত্যে পাওয়া যায় না। এই মত আংশিকভাবে সত্য। আংশিকভাবে সত্য বলছি এই কারণে যে, মানুষের জীবনবোধ ও শিল্পবোধের সমন্বয় সাধন করতে করতে যুগেরও পরিবর্তন আসে। যে দুর্যোগ, যে দুর্ভোগ সেকালের মানুষকে যে বিশেষ সমাজ-পরিবেশের মধ্যে আচ্ছন্ন

করে রেখেছিল তার রূপটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে পরবর্তী কালে। তাই কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক মনের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন দেখা দিল। মধ্যবিত্ত বলে একদল মানুষ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমাজের উঁচুস্তরের মানুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলো। তাঁদের রাজনীতিক চেতনার প্রভাব সাহিত্যেও দেখা দেয়—ক্রমেই সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষই সাহিত্যের উপাদান হয়ে ওঠে। সাহিত্যিক দেখলেন, মানব জীবনের সুখ-দুঃখ ন্যায়-অন্যায়ের জন্য সমাজও অনেকখানি দায়ী। এই মানুষের বাস্তব জীবন ও তার সমাজকে সাহিত্যের বিষয় করে তোলাতে সাহিত্যের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না। রূপ-রসসৃষ্টি সাহিত্যের প্রধান কাজ এবং এই সৃষ্টি-ধারাকে যদি বস্তুবাদ ক্ষুণ্ণ না করে তবে তেমন আপত্তির কিছু নেই।

বাস্তবের নামে জীবন-নীতি, জীবনবোধকে অস্বীকার করা—আবার নীতির নামে শিল্পবোধকে অস্বীকার করা—কোনোটাই আমরা সর্বতোভাবে মেনে নিতে পারি না। সাহিত্য বিচারের বড়ো কথা হলো পরিমিতি-বোধ। আদর্শবাদ বা বস্তুবাদকে অবলম্বন করে সাহিত্যিক যদি কোনো শিল্পরস বা জীবনরসের সন্ধান দিতে না পারেন তাহলে সে ক্ষেত্রে কোনো মতবাদই প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। দুই মতবাদেরই একটা সীমা থাকা প্রয়োজন। সমাজ ও জীবন থেকে দূরে সরে গিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। কালজয়ী সাহিত্যে সুন্দরের সঙ্গে মানব জীবন- ধর্মের আদর্শটি জড়িত থাকতে বাধ্য। এই বিচারে আদর্শবাদী ও বস্তুবাদী সাহিত্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য থাকে না। পরিমিতি-বোধের ওপরই এর বিরোধ বা মিলন। কারণ 'প্রাণের ধর্ম সুমিতি, আর্টের ধর্মও তাই। এ সুমিতিতে প্রাণের স্বাস্থ্য ও আনন্দ, এই সুমিতিতেই আর্টের শ্রী ও সম্পূর্ণতা।'

রস ও কাব্যের জগৎ ঃ

সাহিত্য আলোচনার ব্যাপারে 'রস ও কাব্য' কথা দু'টি বহুল প্রচলিত। 'কাব্য' কথাটি পুরানো দিনে সাহিত্য অর্থেই ব্যবহৃত হ'তো। আমরা আলঙ্কারিকদের কাছে শুনে আসছি যে ধ্বনি বা রসই কাব্যের আত্মা—রসাত্মক বাক্যই কাব্য—বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্। কিন্তু যে 'রস' কথাটি

আমরা সচরাচর ব্যবহার করে থাকি—তার প্রকৃত রূপ কি! রস বলতে কি বোঝায়!

'রস' অর্থে সাধারণত কোনোর কিছুর আস্বাদনকেই বোঝায় অর্থাৎ যা আস্বাদন করা যায়—তাই রস। সাহিত্যে এই রসই প্রধান ব্যাপার। একমাত্র সহৃদয় ব্যক্তিই এই রস গ্রহণ করতে পারেন। আনন্দময় সম্বিতের আস্বাদ্য এই রস। আমাদের চারপাশে যে বিচিত্রতা ছড়িয়ে আছে—বিশ্বভুবনে রহস্য-মধুর যা কিছু আছে—তাই আমাদের রসের উদ্রেক করে। সহৃদয় পাঠক সাহিত্যের মাধ্যমেই এই রস অনুভবও করেন—গ্রহণও করেন। যে সাহিত্যের মাধ্যমে এই রস অনুভূত হয় সেই সাহিত্যের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য কি! এ বিষয়ে আগেও আমরা আলোচনা করেছি। সাহিত্য সম্বন্ধে এক কথায় কিছু বলা সম্ভব নয়। সংক্ষেপে শুধু যেইটুক বলা যায়—ভাবকে বাণীরূপ দান করে সরল সহজ ও সুসংবদ্ধ ভাবে প্রকাশ করাই সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। একথার প্রতিবাদে কেউ হয়ত বলবেন—তাহলে যা কিছু ওভাবে রচিত তাকেই সাহিত্য বলা যেতে পারে। এই বিচারে পঞ্জিকা, ভূগোল, জ্যামিতি প্রভৃতিও সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হবে। কিন্তু এদের সঙ্গে প্রকৃত সাহিত্যের পার্থক্য অনেকখানি। ক্যামেরাতে যে ছবি ধরা পড়ে—আর শিল্পী তুলিতে যে আলেখ্য প্রকাশ পায়—ঐ দু'য়ের মধ্যে সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্যই বেশি। প্রথমটিতে বস্তুর যথাযথ প্রতিকৃতি দেখতে পাই—কিন্তু পরেরটিতে শিল্পীর স্বপ্নসাধনা অভিনব রসরূপ লাভ করে। সেখানেই ব্যঞ্জনাই বড়ো কথা। সাহিত্য সৃষ্টিতেও এই ব্যঞ্জনাই আসল ব্যাপার। আলঙ্কারিকেরা এই ব্যঞ্জনাকে বলেছেন—ধ্বনি। তাঁরা বলেন, 'কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিরিতি'—ধ্বনিই কাব্যের আত্মা। ধ্বনিবাদীদের মতে—শব্দ নয়, অলংকার নয়, রীতি নয়—রসিক হৃদয়ে কাব্যপাঠ-জনিত যে-ভাবের প্রকাশ ঘটে—এ সেই ভাব-ধ্বনি। রসবাদীরা একেই রসধ্বনি বলেছেন। এই রসই তাঁদের মতে কাব্যের আত্মা। বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাবের মধ্যে দিয়েই কাব্যের স্থায়ীভাব রসরূপ লাভ করে। তাঁদের মতে 'বিভাবানুভাব ব্যভিচারী সংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ'।

'ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ'—কবি ভাবকে বাণীরূপ দেন। তাঁর নিজের ভাবপ্রবাহ পাঠকের মনের কাছে অ-পূর্বের বারতা বহন করে আনে। যথাযথ সংবাদ পরিবেশনই তো কবির কাজ নয়! তিনি যখন নিজের ভাবকে

রূপায়িত করেন—তখন তিনি সেই সঙ্গে এই জগৎকেও নতুন ক'রে গ'ড়ে তোলেন। এই পরিদৃশ্যমান জগতের মধ্যে থেকেই তাঁকে আর একটি জগৎ রচনা করতে হয়। সেই জগৎ—কবির জগৎ। কবির এই সৃষ্টিতে বস্তুর ভূমিকা আছে বটে—কিন্তু কবি-কল্পনাই প্রধান অংশ গ্রহণ করেছে। এভাবে প্রজাপতি ব্রহ্মার মতো তিনি নতুন জগৎ সৃষ্টি করেন বলেই তাঁকে কাব্যসংসারের প্রজাপতি বলে কল্পনা করা হয়। ধ্বন্যালোকে তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

অপারে কাব্য সংসারে কবিরেকঃ প্রজাপতিঃ।
যথাস্মৈ রোচতে বিশ্বং তথৈব—পরিবর্ততে॥

রবীন্দ্রনাথের 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় দেখতে পাই—কবিবর বাল্মীকি যখন নারদকে বলেন—রামচন্দ্র সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না জেনে তিনি কি ক'রে তাঁকে অবলম্বন ক'রে কাব্য রচনা করবেন তখন—তার উত্তরে নারদ বলেন—

সেই সত্য যা রচিবে তুমি
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি,
রামের জনম স্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।

তবে এও সত্য যে কবির সৃষ্টি মূলে কল্পনার প্রাধান্য থাকলেও—তিনি আমাদের পরিচিত জগতের রূপালেখ্যই অঙ্কন করেন। একেবারে অজানা, অচেনা হ'লে কবি-সৃষ্টি আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারতো না—আমাদের আনন্দ দিতে পারতো না। বাইরের প্রত্যক্ষাতীতের সঙ্গে যে অপরিচয়ের ব্যবধান থাকে—কবির সৃষ্টি সেই ব্যবধান ঘুচিয়ে দেয়। অসম্ভবের অস্বাভাবিক প্রকাশ আমাদের অন্তরের কাছে কোনো আবেদন জানাতে পারেনা। তাইতো মানুষ 'অসাধারণের আসমানে'ও উড়ে বেড়াতে চায় না—আবার সাধারণের মাটিতে আপন প্রাণের পরিচয়টুকু পেয়েও তৃপ্তি পায় না। পরিচিত রূপের অপরূপত্বকেই আমরা আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করে নিই। আমাদের পরিচিত জগতের বিষয়কেই শিল্পী 'আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে, তাহে ভালোবাসা দিয়ে' অপরূপ করে গড়ে তোলেন। শিল্পীর সৃষ্টিতেই নারী—'অর্ধেক মানবী' আর 'অর্ধেক কল্পনা'।

যুগে-যুগে সাহিত্যে আমরা মানবজীবনের রূপালেখ্য পেয়েছি। মানব জীবন-বৈচিত্র্যের প্রকাশ-ব্যাকুলতার কথা সকল দেশের রসিক সমাজেই স্বীকৃত। সাহিত্য কখন বাস্তব জগৎকে অস্বীকার করেনা। কারণ এই

জীবন ও জগৎকে বাদ দিয়ে বিরাট শূন্যতার উপর নির্ভর করে নিছক আকাশ-চারী কল্পনা দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়। পরিদৃশ্যমান জগৎ ও ধরা-ছোঁয়ার জীবনের ভিত্তিতেই কবির জগৎ ও জীবন রসরূপ লাভ করে। বাস্তবকে কেন্দ্র করে কবি-সৃষ্টি গড়ে উঠলেই যে কবি বাস্তববাদী হবেন, এই ধারণা সর্বাংশে সত্য নয়। আমরা যাকে রোমান্টিক রচনা বলি—তাতেও বাস্তব জীবন ও বাস্তব জগৎ অনুপস্থিত নয়। বস্তুত সাহিত্য এই বাস্তব জীবন ও জগৎকে অস্বীকার করেনা। কবির কাব্যলোকের উপকরণ ও অবলম্বন লৌকিক। এই লৌকিক উপকরণ ও অবলম্বনের ভিত্তিতেই অলৌকিক রসলোক সৃষ্ট হয়। নিজের জীবনের ভাব ও ভাবনাকে কবি তাঁর রচনার মাধ্যমে প্রকাশ করেন। তাঁর রচনায় যা প্রকাশ পেল তা বাস্তব জগতের কাছে মিথ্যে হয়ে যায় না। কারণ কবির জীবন থেকেই তার প্রকাশ ঘটেছে।

কিন্তু কবির উপলব্ধি যদি বিবৃতি-সর্বস্ব হয়, তাহলে তার বিশেষ কোনো মূল্য দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। সামাজিক হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারে মতো রসসমৃদ্ধ রচনা না হলে আমরা তাকে সাহিত্যের কোঠায় স্থান দিতে পারি না। বাস্তব জীবন ও জগতের মালমশলা নিয়ে তাকে রসসমৃদ্ধ বাণীরূপ দান করাতেই কবির শ্রেষ্ঠ কীর্তি। বস্তুকে কবি কি ভাবে রসরূপ দান করেন তার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে একজন পাশ্চাত্য সমালোচক বলেন—'In this case the poet seems to get the better of the nature : he takes, indeed the landskip after her, but gives it more vigorous Touches, heightens its Beauty, and so enliven the whole Piece that the Images which flow from the objects themselves appear weak and faint in comparison of those that come from the Expressions.'

কবি কল্পনায় যা রূপ পরিগ্রহ করে—তার সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্ক আছে বলে আমরা মেনে নিই। কিন্তু কবি যদি শুধু বাস্তবের যথাযথ রূপটি আমাদের কাছে তুলে ধরতেন, তাহলে আমাদের বিস্ময় ও কৌতূহল জাগতো বটে, কিন্তু সেই চিত্র আমাদের অন্তরে গভীর কোনো রসানুভূতি জাগাতে পারতো না। অন্যদিকে কবি যদি বাস্তব জীবন ও জগৎ-বিমুখী অথবা জীবন-জগৎ নিরপেক্ষ সৌন্দর্যের কথা বলতেন—তাও আমাদের অন্তরকে তেমন আকৃষ্ট করতে

পারতো না। কাব্য-তন্ময়তাকে (objectivtey) সর্বাংশে অস্বীকার না করলেও কাব্য-মন্ময়তাই (suijectivity) যে প্রধান একথা আমাদের স্বীকার করতেই হয়। যা আমরা দেখতে পাই—তা আমাদের আয়ত্তের মধ্যে—তাতে আমরা সম্পূর্ণতার সন্ধান পাইনা। কবি-কল্পনায় যে জীবন ও জগৎ আমাদের সামনে উদ্‌ভাসিত হয়, তা সম্পূর্ণ না হলেও তার মধ্যে সমগ্রের অনেকখানি আভাস আমরা পাই। বাস্তবের যথাযথ প্রতিকৃতি আমাদের কাম্য নয়। আমরা চাই—লৌকিক জীবন ও জগৎ কবি-কল্পনায় অলৌকিক জীবন ও জগৎ হয়ে উঠুক।

কিন্তু আমাদের সামনে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে নিজের অনুভূতির প্রকাশ ঘটানোতেই কবির দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। তিনি তাঁর অনুভূতিকে পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চার করে দিতে চান। পাঠকের অনুভূতিকেও তিনি তাঁর কাব্যে রূপায়িত করেন। কবি যে মায়ালোক সৃষ্টি করেন তাতে কবি ও পাঠকের মন সমভাবেই বিচিত্রের রসাস্বাদন ক'রে থাকে। কবি প্রতিভাই বাস্তব জগতের বস্তু ও ভাবকে অলৌকিক রসরূপ দান করে। তাই তো এই প্রতিভাকে 'অপূর্ব বস্তুনির্মানক্ষমা প্রজ্ঞা' বলা হয়েছে। কবি-সৃষ্ট রস ও কাব্যের জগৎ তাই অলৌকিক মায়ার জগৎ। বাস্তবকে অবলম্বন করে গ'ড়ে উঠলেও কাব্যের জগৎ—লোকোত্তর জগৎ। লৌকিক ভাবকে—মানব হৃদয়ের চিরন্তন ব্যাকুলতাকে—কবি সহৃদয়োপযোগী কাব্যের মাধ্যমে রসরূপ দান করেন। আমরা সেখানে Imitationএর চেয়ে Interpretation—Imaginationকেই সার্থকভাবে পাই। আচার্য অতুলচন্দ্র গুপ্ত বলেন—'ব্যবহারিক জগতের শোক, হর্ষ প্রভৃতির নানা লৌকিক কারণ মানুষের মনে শোক, হর্ষ প্রভৃতি লৌকিক ভাবের জন্ম দেয়। এর কোনটি সুখের, কোনটি দুঃখময়। কিন্তু ঐ সব লৌকিক ভাব, ও তাদের লৌকিক কারণ, কাব্যের জগতে এক অলৌকিক রূপ প্রাপ্ত হয়ে পাঠকের মনে ঐ সব লৌকিক ভাবের যে বৃত্তি বা 'বাসনা' আছে, তাদের এক অলৌকিক বস্তু—'রস'-এ পরিণত করে। রসের মানসিক উপাদান যে ভাব, তা দুঃখময় হ'লেও, তার পরিণাম যে রস, তা নিত্য আনন্দের হেতু।' Truth--সাহিত্যে beautiful ও sublime হয়ে ওঠে—এবং সেই অলৌকিক দিব্য সৌন্দর্য নিত্যকালের আনন্দ-রসধারায় সামাজিক হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করে।

সাহিত্যের রীতি ঃ

সাহিত্য রচনার মূলে রয়েছে সাহিত্যিকের রসসৃষ্টির ব্যাকুলতা। কাব্যের লক্ষ্য রস—এ বিষয়ে আমরা বিশদ আলোচনা করেছি। সাহিত্যে রসসৃষ্টি করতে পারার কৃতিত্ব সাহিত্যিকের। কিন্তু সেই রসকে প্রকাশ করা ও অন্যের হৃদয়ে সঞ্চার করার একটি বিশেষ ভঙ্গি থাকে। প্রত্যেক শিল্পীরই বিশেষ ধরনের প্রকাশভঙ্গি আছে। কোনো বিষয়কে রসায়িত করে রূপদান করতে গেলে—তাকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে হ'লে—প্রকাশভঙ্গি বা কৌশলটি আয়ত্ত করা প্রয়োজন। সাহিত্যিকের প্রকাশভঙ্গিকেও তাঁর ষ্টাইল বা রীতি বলা হয়। শ্রেষ্ঠ রচনার বিচারের সময় তার ষ্টাইলের বিচারও করা হয়। সাহিত্যিক যে ভাবকে প্রকাশ করতে চান—তাকে সুন্দর ও সার্থক করে প্রকাশ করতে পারলেই তাঁর রচনা-মাধুর্য পাঠকের মনকে অধিকতর আকৃষ্ট করে। সাহিত্যে যে ভাবটি রয়েছে তার মূল্যের গৌরব সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু সেই ভাবকে সার্থক ও সুন্দর করে প্রকাশ করার ভঙ্গিটি সাহিত্যিকের নিজস্ব। এই বিশেষ ভঙ্গির জন্যেই আমরা সাহিত্যিকের স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করি।

যাঁরা অলংকারকে কাব্যের আত্মা বলে ঘোষণা করেছিলেন—যাঁরা 'শব্দার্থৌসহিতৌ কাব্যম্'-এর পরিপোষক—তাঁদের সাহিত্য-সম্পর্কিত মতগুলিকে অনেকেই সমগ্রভাবে স্বীকার করে নেননি। কোনো কোনো রসবেত্তা অলংকারের চেয়েও আরও গভীর কিছুকে কাব্যের আত্মা বলে মনে করতেন। এঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন 'কাব্যালংকার সূত্র' রচয়িতা বামন। তিনি বলেন 'সৌন্দর্যমলংকারঃ।' যে বস্তু সুন্দর নয়—তার ওপর শত অলংকার প্রয়োগ করলেও তাকে সুন্দর দেখাবেনা। বামন সৌন্দর্য অর্থে অঙ্গ-লাবণ্যই বলতে চেয়েছেন। বামনের মতে কাব্যের আত্মা রীতি—'রীতিরাত্মাকাব্যস্য। বিশিষ্টা পদরচনা রীতি। বিশেষো গুণাত্মা।' বামনের বক্তব্য থেকে এইটুকু বুঝতে পারি যে, বিশিষ্ট ভঙ্গিই রীতি—মাধুর্য প্রভৃতি রস-সৃষ্টিকারী অন্যান্য গুণ এর সঙ্গে একাত্মভাবে বিরাজিত। 'বক্রোক্তি জীবিত' রচয়িতা কুন্তক 'রীতি' শব্দটি আরও ব্যাপক অর্থে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে কবির স্বভাবেই রীতির জন্ম। তাই প্রত্যেক কবির রচনাতেই—তাঁর রীতি-বৈশিষ্ট্য বর্তমান।

কুন্তকের মতে বক্রোক্তিই সার্থক রীতি—এবং তাই কাব্যের প্রাণ। রীতিবাদের সমর্থকেরা একথা বোঝাবার চেষ্টা করেন যে রীতি শুধু শব্দার্থ-সাপেক্ষ নয়—কবির স্বভাবেই তা রয়েছে।

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যিকেরা রীতি বলতে যা বুঝতেন ইংরাজি ষ্টাইল কথাটি প্রায় সেই অর্থে ই ব্যবহৃত হয়। লেখক যে ভাবটি প্রকাশ করেন—তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রচনা রীতির বৈশিষ্ট্যও আমাদের আকৃষ্ট করে। এইজন্য পাশ্চাত্ত্য জগতে প্রায় সময় লেখক এবং তাঁর রচনারীতিকে একসঙ্গে যুক্ত করে—Style is the man—কথাটি বলা হয়। পাশ্চাত্ত্যের একজন বিখ্যাত সমালোচকের মতে ষ্টাইল—'is fundamentally a personal quali y: ......when Pope called it 'the dress of thought', he failed entirely to recognise its essential organic character, for he evidently conceived it as something apart from the man, which he could put on or take off at will. Style, as Carlyle says in one of his Journals, is not the coat of a writer, but his skin.' তবে এমন অনেক লেখক আছেন—যাঁরা খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের রীতি অনুকরণ করেন। শুধু তাই কেন, অনেক বলিষ্ঠ লেখকের রচনাতেও এই ধরনের অনুকরণের বা অন্যের রীতির প্রভাবের দৃষ্টান্ত বিরল নয়। কিন্তু 'A man who has something really personal to say, will seldom fail to find a really personal way in which to say it. Thought which is his own, will hardly permit itself to be shaped into the fashion of someone else's expression. সাহিত্যিকের চিন্তা ও অনুভূতি যেমন ব্যক্তিগত, তেমনি তাঁর বাণীভঙ্গিও নিজস্ব।

রচনারীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, তার মধ্যে দিয়ে লেখক পাঠকের হৃদয়ে অনাস্বাদিত রস সঞ্চার করেন। রীতি-জনিত এই যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য—সাহিত্যিককে তা-ই বিশিষ্টতা দান করে। তাঁর রচনাই তাঁর পরিচয় বহন করে এবং 'সেই জন্যই রচনার মধ্যেই লেখক যথার্থরূপে বাঁচিয়া থাকে, ভাবের মধ্যে নহে, বিষয়ের মধ্যে নহে।' প্রসঙ্গত একান্ত মনে রাখা দরকার যে, শুধু-মাত্র শ্রুতিমধুর শব্দ যোজনার দ্বারা বাক্য রচনার কৃতিত্বেই সাহিত্যিকের রীতি-বৈশিষ্ট্য বিচার করা হয় না। পাশ্চাত্ত্যের সাহিত্য-সমালোচকের মতে, 'All the factors which combine in the making of a man will

subtly play their parts in giving to his style its well defined individuality of form and colour; all the phases of his outer and inner experience will register themselves in it. আমরা যখন কোনো রচনা পাঠ করেই বলি 'এটি অমুকের রচনা'—তখন নিশ্চয় রচয়িতার বলবার ভঙ্গির মধ্যে এমন একটি বৈশিষ্ট্য পেয়েছি—যা লেখকের নিজের এবং তাঁর রচনার সার্থক পরিচয় আমাদের সামনে তুলে ধরেছে।

অরসিক যাই বলুন না কেন—সহৃদয় পাঠক মাত্রই জানেন, কবিরা নিছক আকাশচারী বোমারু বিমান নন। নিরীহ সাহিত্য-পথচারী পাঠকের মাথায় কল্পনার উর্ধ্বাকাশ থেকে দুর্বোধ্য, দুরূহ, ব্যাখ্যাতীত অথবা অর্থহীন শব্দের গোলক নিক্ষেপ করা তাঁর কাজও নয়, উদ্দেশ্যও নয়। এমন কি ঐ ধরনের ব্যাপারকে তিনি পুণ্যব্রত বলেও মনে করেন না। এই কথা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, সাহিত্যের সকল অংশের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা দেবার দায়-দায়িত্ব কবির আছে, অথবা ক্যব্যের ক্ষেত্রে ঐ ধরনের গাণিতিক শুষ্ক বিশ্লেষণ সম্ভবপর। আমাদের বক্তব্য এই যে, কবিরা নিতান্তই স্বকপোল-কল্পিত উদ্ভটের প্রকাশে জীবনের মূল্যবান সময়ের অপব্যয় করেন না। মানুষের সুখদুঃখ আনন্দ বেদনা—রঙীন অবকাশের সুখ এবং বেদনার করুণ মুহূর্তকে আপন মনের ভাবনা-রসে জারিত করেন। 'আপন মনের মাধুরী' মিশিয়ে তাকে সাহিত্যশিল্পে রূপায়িত করেন।

ছবি ও গান তো সব সময় সব কবিই, সব শিল্পীই নিজ নিজ তুলিকায় আঁকেন। কেউ হয়ত বলবেন, তাঁদের ছবিগুলি একই ধরনের,—তাহলে তাঁদের গানের সুরও তো বৈচিত্র্যহীন ও একঘেঁয়ে হয়ে যায়। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এই রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধময় প্রত্যক্ষ যে জগৎ এবং সব কিছুর অতীত যে ধ্যানের—যে স্বপ্নের জগতের কথা কবি বলেন—যে জগৎকে কবি বাণীরূপ দেন—তা আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন মনে হলেও তাদের মূল বক্তব্য কি একটিই নয়! প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যিকের লক্ষ্য কি এই নয় যে, এই জগৎ সংসারের অন্তঃস্থলে প্রবাহিত একটি ঐক্য বা সামঞ্জস্যের সুর—একটি বিচিত্র উপলব্ধির মাধ্যমে তাঁরা জানতে খুবই ইচ্ছুক, এবং সেই 'জানার চেষ্টা' ও 'জানা' নিয়েই সাহিত্য রচনা! তাহলে এই এক কথা, এক ব্যাপারই কি সকলের কাছে আমরা শুনি! প্রত্যেক ঐশ্বর্যবান শিল্পী একটিমাত্র বিষয় অবলম্বন করে কোন কৌশলে অনন্য সৃষ্টি আমাদের সামনে তুলে ধরেন! একটিই তো আকাশ—কিন্তু তাকে

উদ্দেশ্য করে অসংখ্য কবিতা লেখা হয় কেন—এবং আকাশ অবলম্বনে লেখা একাধিক কবিতাই আমাদের ভালো লাগে কেন!

এর উত্তরে এই বলা যায়—এ হচ্ছে সেই ভিন্ন ভিন্ন রচয়িতার মনোধর্ম তথা মনোভঙ্গির পার্থক্যের জন্যেই—একই বিষয় নিয়ে লেখা কবিতা বা অন্য কিছু—একাধিকবার নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীন ও অনন্য হ'য়ে ওঠে। আমাদের বোধের কাছে- অনুভূতির কাছে—সহৃদয় রসিক পাঠকমাত্রেরই কাছে—ভিন্ন ভিন্ন অর্থে, তার একতম মূলে অর্থেরই বিচিত্রাস্বাদন ক্রিয়া। অর্থাৎ দুইজন রচয়িতা একই বিষয় অবলম্বনে লিখতে পারেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁদের রচনা একটি অন্যটির অনুসরণমাত্র হয়নি। আলাদা দু'টি ব্যক্তিত্বের স্পর্শে দু'টি সৃষ্টিই পৃথক ভাবে দেখা দেয়। দু'টির আবেদনও অতি স্বাভাবিক ভাবেই এক নয়।

এর কারণ খুঁজতে গেলে সেই মনোধর্ম বা মনোভঙ্গির পার্থক্যের কথাই বলতে হয়। এ যেন সেই বিশেষ ব্যক্তি-মনের—সেই শিল্পী সত্তার একান্ত গহন আত্মার আত্মপ্রকাশ। এই ধরনের সৃষ্টি কখনও অন্যের সৃষ্টির সঙ্গে গভীর সাদৃশ্য নিয়ে দেখা দেয়না। Wordsworthএর To the Skylark ও Shellyর To a Skylark কবিতায় Skylark সম্বন্ধে দুই কবিই সচেতন—দুজনই একই উপকরণ গ্রহণ করলেন—কিন্তু ভাবে ও ভঙ্গিতে কতো পার্থক্য। তাদের মধ্যে কোনো মিল থাকা সম্ভবও নয়। শিল্পীসত্তার এই বিশেষ ভঙ্গিটিকে আলঙ্কারিকেরা বলেন 'রীতি'। রীতিবাদীরা একেই কাব্যের আত্মা বলেছেন। সাহিত্যে বিশেষ ব্যক্তিমনের বিশেষ শিল্পী-চরিত্রের একান্ত আপন—বিশেষ আত্মপ্রকাশের এই যে ভঙ্গিটি—এ-কেই বলা হয় শিল্পী তথা সাহিত্যিকের ষ্টাইল। এই আত্মপ্রকাশের ভঙ্গি—সাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রকাশভঙ্গির মূল্য অপরিসীম না হলেও অনেকখানি।

অনুভূতি, কল্পনা, বস্তু জ্ঞান অর্থাৎ এক কথায় সাহিত্যের বক্তব্য বিষয়টুকুই সব নয়। কেননা, অনেকেরই অনেক বক্তব্য থাকে। এমন কি তাঁদের বক্তব্যবিষয় বেশ গুরুত্বপূর্ণ এবং মহানও হতে পারে। কিন্তু প্রকাশের ভঙ্গিটি যদি অভিনব না হয়—যদি তা স্রষ্টার স্বকীয় এবং বিষয়ানুগ না হয়, তাহলে বক্তব্যের মধ্যে যতোই শাঁস থাকনা কেন—সাহিত্যিকের সৃষ্টি-কর্ম 'শাসালো' হয়েও 'রসালো' হবেনা এবং সেই কারণেই রসিকের উপভোগ্য সাহিত্য-কীর্তি হিসাবে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

পৃথিবীতে এমন ভাগ্যবান যশস্বী রচয়িতার সংখ্যা বিপুল নয়—যাঁদের রচনা দেখা মাত্রই বলে দেওয়া যায়—এটি কার রচনা। বস্তুত শক্তিমান সাহিত্য-শিল্পীকে চিনতে হলে শুধু তাঁর চিন্তা-ভাবনার উপকরণ দেখে অভিভূত হলে চলবেনা। তার দ্বারা তাঁদের চেনার সৌভাগ্যও হবে না, কিংবা কবির বিচিত্র বস্তুজ্ঞান ও কল্পনাশক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সাহিত্য সম্বন্ধে শেষকথা বলাও চলবেনা। তাঁর প্রকাশরীতি যা একান্ত ভাবে তাঁর নিজের—সেই প্রকাশ-রীতির মধ্যেই তাঁর ব্যক্তি ও শিল্পী সত্বার পরিচয় কতখানি আছে! আগেই বলেছি, ষ্টাইল সাহিত্যিকের সেই স্বকীয়তা যা দেখে বলা যায় এই বিষয়ের রচয়িতা আর কেউ নয়—এর রচয়িতা তিনিই। সাহিত্যিকের এই স্বকীয়তা শুধুমাত্র কোনো বিষয় বস্তু বা বাক্‌ভঙ্গিকে আশ্রয় ক'রেই গ'ড়ে ওঠেনা। যে রীতি বা ষ্টাইলের মধ্যে সাহিত্যিকের সার্থক পরিচয় রয়েছে তাঁর প্রধান কাজ হ'লো বৈচিত্র্যসৃষ্টি। এই বৈচিত্র্য বাইরে কলা-কৌশলের ওপর একান্তনির্ভর নয়। সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্ব, মননশীলতা, বাকবৈদগ্ধ্য প্রভৃতির কল্যাণ মিশ্রণে ষ্টাইল প্রকাশ পায়। এই ষ্টাইলকেই রবীন্দ্রনাথ বলছেন 'মুখশ্রী।'

বিভিন্ন সাহিত্যিকের রীতিও ভিন্ন প্রকারের। মধুসূদন, বিহারীলাল, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতির রচনা রীতিই তাঁদের স্বাতন্ত্র্যের গৌরবময় পরিচয় বহন করে। রচনার মধ্যেই রচয়িতার পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা একজন পড়ছেন,—

দিনের ভাঁটার শেষে রাত্রির জোয়ার
এল তার ভেসে-আসা তারাফুল নিয়ে কালো জলে,
অন্ধকার গিরিতট-তলে
দেওদার তরু সারে সারে
মনে হল, সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,...ইত্যাদি,

এখানে রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ না করলেও, কবিতার রচয়িতা কে—তা আর বলে দিতে হয়না।

প্রত্যেক ঐশ্বর্যবান-সাহিত্যিক—তা তিনি কবিই হোন বা কথা-সাহিত্যিকই হোন—কিংবা প্রবন্ধকার বা সমালোচকই হোন—প্রত্যেকেই এই ষ্টাইল বা রীতির অধিকারী। মনে হয় এঁদের মধ্যে কারও যদি কতকগুলি রচনা কবি-নাম-পরিচয় নিয়ে বাঁচে এবং বাকিগুলির যদি নাম-পৃষ্ঠাটি নষ্ট হয়ে যায়—তবু পরবর্তীকালের সাহিত্য-রস পিপাসু পাঠক ও গবেষক এই নাম-পরিচয়হীন

রচনার প্রকৃত রচয়িতাকে তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত ষ্টাইলের সূত্র ধরে নিশ্চয় চিনে নিতে পারবেন।

অনেকে মনে করেন ষ্টাইলের অর্থ সাধারণ রচনারীতিমাত্র। এ ধারণা যুক্তিযুক্ত নয়। এই রচনারীতির প্রাণ—কবির শব্দপ্রয়োগ-প্রিয়তা, বিশেষ বিশেষ Image, অতীত অভিজ্ঞতার চিত্র সম্পর্কে আকর্ষণ ও আগ্রহের মধ্যেই বিদ্যমান। ষ্টাইল শুধু বহিরঙ্গের একটি ভূষণ মাত্র নয়। এরই আড়ালে রচয়িতার আন্তর-পরিচয়টিও খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু এতেও ষ্টাইলের চরম পরিচয় নয়। বাংলার বিখ্যাত একজন সাহিত্যিকের মতে 'ভাব ও ভাষার পূর্ণ-সাযুজ্যই ষ্টাইল বটে,এবং যে রচনায় ইহা ঘটিয়াছে তাহা সাহিত্যকলাসম্মত রসসৃষ্টি বটে। কিন্তু সেইজন্য সকল রচনাই সমান শ্রেষ্ঠ নয়। ভাবের যথাযথ প্রকাশ—Good Art বা রস রচনা বটে। কিন্তু Great Art হইতে হইলে ভাব-কল্পনার বিশিষ্ট গৌরব চাই। মানবহৃদয়-বিশ্বের ব্যাপ্তি ও গভীরতা যাহার মধ্যে যতখানি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে—mind এবং soul উভয়ই যাহার ষ্টাইল পুষ্ট করিয়াছে, যে রচনায় জটিল বিষয় বিস্তার যেমন সুসম্বদ্ধ আকারে পরিণত হইয়াছে, তেমনই colour ও mystic perfume বাদ পড়ে নাই, এবং যাহার মধ্যে Soul of humanty, বিশ্বমানবের প্রাণ স্পন্দন অনুভূত হইয়া থাকে, তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রসসৃষ্টি, তাহাই Great Art—এতএব তাহাই শ্রেষ্ঠ ষ্টাইল।' 'প্রত্যেক সাহিত্য স্রষ্টার কল্পনা ও ভাবদৃষ্টির আত্যান্তিক স্বাতন্ত্র্য'থেকেই 'ষ্টাইলের জন্ম হয়' বটে—কিন্তু সর্বোৎকৃষ্ট রসসৃষ্টির মধ্যেই তার শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি।

সাহিত্য কি প্রকৃতির অনুকরণ ঃ

পাশ্চাত্ত্যের সাহিত্য-সমালোচকের মতে, সাহিত্য হচ্ছে মানুষের জীবন দর্শনের, জীবনের নানা অভিজ্ঞতার শ্রেষ্ঠ দলিল। ভাষার মাধ্যমে জীবনের সার্থক অভিব্যক্তি এই সাহিত্যেই আমরা পাই। এর মধ্যে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যা আমাদের সহজেই জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে উৎসুক করে তোলে।

গ্রীক দার্শনিক প্লেটো আর্টকে mirror of truth—সত্যের মুকুর—বলেছিলেন। সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর মত হচ্ছে, সাহিত্য সত্যের যথাযথ অনুকৃতি—তার মধ্যে আর সবই গৌণ। তাঁর Truth কথাটি সবাই স্বীকার করে নিলেও তাঁর Imitation কথাটি সবাই স্বীকার করে নেননি। তাঁর শিষ্য আরিস্টটলই সেই Truthকে সম্ভাব্য বা সাহিত্য-সত্য রূপে ব্যাখ্যা করেন। সাহিত্য—সত্যের যথাযথ অনুকরণ কিনা অথবা সম্ভাব্য সত্যের যথাযথ অনুকরণ কিনা, এই প্রশ্নের ভিত্তিতে নানা তর্ক-বিতর্কের পর ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে ম্যাথ্যু আরনল্ড্-এর আছে শুনলাম, সাহিত্য হচ্ছে 'a criticism of life—জীবন-সমালোচনা এবং এই মীমাংসাই শেষ পর্যন্ত গৃহীত হলো। তখন Imitationকথাটির পরিবর্তে Interpretation কথাটি প্রচলিত হলো। সাহিত্যশাস্ত্রকারদের মতে সাহিত্যে জীবনেরই সর্বাঙ্গ-সুন্দর প্রকাশ ঘটে। হাড্‌সন সাহিত্য সম্বন্ধে জর্জ এলিয়টের যে মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন—তাতে সাহিত্য ও জীবনের একটি সুন্দর সম্পর্কের কথা লেখিকা বলেছেন। জর্জ এলিয়টের মতে সাহিত্য'—is the nearest thing to life; it is a mode of amplifying experience and extending our contact with our fellow-men beyond the bounds of our personal lot.' জীবন ও জগতে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মহান ও শুভ, সাহিত্যে তারই ছবি দেখতে পাই। সাহিত্য প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, 'যাহা প্রকৃতির প্রতিকৃতি মাত্র, সে সৃষ্টিতে কবির তাদৃশ গৌরব নাই। তাহার কারণ সে কেবল প্রতিকৃতি—অনুলিপি মাত্র—তাহাকে সৃষ্টি বলা যায় না। যাহা সত্যের প্রতিকৃতি মাত্র নহে, তাহাই সৃষ্টি। যাহা স্বভাবানুকারী অথচ স্বভাবাতিরিক্ত—তাহাই সৃষ্টি।' এখানে স্বভাবাতিরিক্ত বলতে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের সেই 'অতিরিক্ত কিছুর' কথাই বলছেন। তাঁর মতে সাহিত্য অনুকরণ নয়—সৃষ্টি।

প্রত্যক্ষ জগতের ভাব ও ভাবনা, সুখদুঃখ প্রভৃতি একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। অনেকের মনে হতে পারে মানুষের ব্যক্তিগত ভাব ও ভাবনা কি করে নির্বিশেষ রসরূপ লাভ করতে পারে! লৌকিক ভাবকে লোকাতীত রসরূপ দান করা আয়াস-সাধ্য ব্যাপার, কিন্তু কবি প্রতিভায় এই লৌকিক ভাব যখন লোকাতীত বা অলৌকিক রসরূপ লাভ করে তখন তার আবেদন ব্যক্তির সীমা অতিক্রম করে নির্বিশেষ ও নির্ব্যক্তিক রূপ লাভ করে। বিশ্বজগৎ ও মানব জীবন কবির দৃষ্টি এড়িয়ে যায়না। তাঁর যা কিছু স্বপ্ন-কল্পনা—এই দু'টি বিষয় নিয়েই গড়ে

ওঠে। কিন্তু কবি যা প্রত্যক্ষ করেন—তারই যথাযথ প্রতিকৃতি তিনি অঙ্কন করেন না। তাঁর কল্পনা ও অনুভূতির রঙে রসে মিশ্রিত হয়ে—সেই দেখা বিষয় এমন এক অপূর্ব রূপে আত্মপ্রকাশ করে তখন মনে হয়, হয়তো এই ছিল—যা ছিল এবং যা আছে—এ যেন তারই ছবি। কবি কাব্যের মধ্যে যে চরিত্র বা ভাবকে রূপায়িত করেন—মানুষ তার মধ্যেই নিজের রূপটি দেখতে পায়। এই ছবি তার জীবনের ফোটগ্রাফ নয়—এর মধ্যে কবি-কল্পনার প্রাধান্যই বেশি।

কবির সৃষ্টি পাঠক ও স্রষ্টার মধ্যে একটি সুন্দর সম্বন্ধ গ'ড়ে তোলে। যিনি রূপ সৃষ্টি করেন—তাঁর সৃষ্টি-কর্ম তাঁকে ছাড়িয়ে গিয়ে—বিশেষের বন্ধন কাটিয়ে—নির্বিশেষ আর্ট-রূপ লাভ করে। সার্থক সৃষ্টির মালিকানা আর তখন কবিরও নয়—বিশেষ পাঠকেরও নয়। তবে রচনার উপর উভয়ের দাবীকে একেবারে অস্বীকার করাও যায় না—আর তা কখনও অস্বীকার করাও হয়নি। সাহিত্য সুন্দরকে সুন্দরতম করে প্রকাশ করে। কিন্তু তাতে জীবনের পরিচয়টুকু অবশ্যই থাকবে। নয়ত জীবন-নিরপেক্ষ রসহীন রচনা পাঠকের মনকে আকৃষ্ট করতে পারেনা। সাহিত্যে যুগপৎ স্বভাবের অনুকরণ এবং স্বভাবের ' অতিরিক্ত কিছু' থাকে বলেই তা সহৃদয়ের পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করতে পারে।

সাহিত্য দর্পণকারের উক্তিটি আর একবার উদ্ধৃত করতে হ'লো। তিনি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে লক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন—

পরস্য ন পরস্যেতি
মমেতি ন মমেতি চ।
তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ
পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে ॥

অর্থাৎ পরের হয়েও পরের নয়, আমার হয়েও আমার নয়—এই আচার্য বিশ্বনাথের মতে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের লক্ষণ। কবির লেখনীতে কাব্য লৌকিক সীমা অতিক্রম ক'রে অলৌকিক রসরূপ লাভ করে। এই লোকোত্তর চমৎকারিত্বই কাব্যের প্রাণ। কবি তো তিনিই—'বিধাতা যাহারে দেয় অলৌকিক আনন্দের ভার'—এবং সেইজন্যই তো 'তাঁর বক্ষে বেদনা অপার তাঁর নিত্য জাগরণ।' প্রত্যক্ষ জগৎ ও জীবনকে মহৎ আবেগের দ্বারা রূপায়িত করার মধ্যেই কবি-সৃষ্টির সার্থকতা। তাই রবীন্দ্রনাথের মতে,—'কবির সৃষ্টি—তাঁহাদের অন্তর্গত

নিত্য প্রকৃতির—সমগ্র প্রকৃতির সৃষ্টি। তাহা একটি অনির্বচনীয় অপরিমেয় শক্তির বিকাশ, তাহা অন্যান্য কবি কর্মের মতো ক্ষণিক বিক্ষোভজনিত নহে।'

সাহিত্য প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ নয়। শুধু তাই কেন এই দিক থেকে বিচার করে দেখলে নৃত্য, সংগীত, চিত্র, ভাস্কর্য কোনোটিই প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ নয়। তারা সৃষ্টি-প্রেরণাজাত। তাদের মধ্যে মানুষের আকুলতা, আবেগের চিহ্নটুকু বিদ্যমান। কবিও সামাজিক মানুষ। তিনি মানব-সমাজ ও বস্তুজগৎ থেকে তাঁর রচনার উপকরণ বাছাই করে নেন। তাঁর রচনার মধ্যে তাঁর কালের ও তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবও থাকে। এই ব্যক্তি বা man এবং কাল বা momentকে আমরা শ্রেষ্ঠ রচনার মধ্যে পেয়ে থাকি। তবুও তো সাহিত্যিকরা যে কোনো শ্রেষ্ঠ-শিল্পীর রচনায় বস্তু-সত্যের যথাযথ অনুকরণ দেখিতে পাইনা। বস্তু-সত্যের যথাযথ বর্ণনা দেওয়াও শিল্পীর দায়িত্ব নয়। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকের যা বৈশিষ্ট্য সাহিত্য ও সাহিত্যিকের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তার পার্থক্য অনেকখানি। সাহিত্যিক—জীবনের কাছাকাছি একটি সমগ্র রসপূর্ণ জীবন সৃষ্টি করেন। বাস্তব-সত্য অতিক্রম ক'রে তবেই সাহিত্য সত্য-রূপ লাভ করে। সাহিত্যিক বাস্তব জীবনের আভাসমাত্র দেন। বস্তু-সত্য, কবির আদর্শ এবং রসসৃষ্টির প্রেরণা প্রভৃতি মিলে যে রচনা গ'ড়ে উঠে তাকে আর যাই বলিনা কেন—অনুকরণ বলা যায় না। সাহিত্য বিশেষ জীবনের ভিত্তিতেই মহাজীবনকে গ'ড়ে তোলে; রবীন্দ্রনাথের মতে 'সাহিত্য যেখানেই জীবনের প্রভাব—সমস্ত বিশেষ কালের প্রচলিত কৃত্রিমতা অতিক্রম ক'রে সজীব হ'য়ে ওঠে, সেখানেই সাহিত্যের অমরাবতী।'

আর্ট ফর্ আর্টস্ সেক্ঃ

পাশ্চাত্ত্য জগতে সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি, ইতিহাস, দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতিতে ফরাসী বিপ্লব ও জার্মান ভাববাদের প্রভাবে যে রোমান্টিসিজম্ দেখা দেয়—সেই রোমান্টিসিজম্—কল্পনার অবাধ মুক্তি, ভাব-মুক্তির শুভ সংবাদ বহন ক'রে আনে। সাহিত্যে এই সময়ে বিরাট ভাব-বন্যা দেখা দেয়। ফরাসী বিপ্লবের মূলে যে বন্ধন-মুক্তির ঘোষণা (শ্লোগান) ছিল—তা সেই যুগের অনেককে

অভিভূত করে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোলরিজ, শেলি প্রভৃতি কবিরা এই বিপ্লবকে সাদর সম্ভাষণও জানিয়েছিলেন। সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি—ফরাসী বিপ্লবের মূলকথা। এই বিপ্লব সেকালের অনেক শিল্পী ও সাহিত্যিকের জীবনে অনেক প্রশ্নও জাগিয়ে তোলে। একদল লেখক সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতার দাবী জানিয়ে বসলেন। তাঁদের মতে, রাষ্ট্রেও যেমন কোনো বাধা-নিষেধ না মানার আন্দোলন চলছে—সাহিত্যেও সেই ধরনের আন্দোলন দেখা দিক। তাঁরা চাইলেন Freedom of Art. এই দলের মুখ্যদের মধ্যে ছিলেন সুইনবার্ন, অস্‌কার ওয়াইল্‌ড প্রভৃতি। তাঁরা বললেন সমাজ ও রাষ্ট্রের কোনো কর্তৃত্বই সাহিত্য মানবে না—এবং সাহিত্যও সমাজ ও রাষ্ট্রের কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করবেনা। সাহিত্যে অবাধ কল্পনা এবং তার প্রকাশ—সর্বপ্রকার ভাব ও ভাবনার শর্তহীন মুক্তি—তাঁরা দাবী করলেন। মানুষ যে সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাষ্ট্রনীতিক স্বাধীনতা চাইছে—সেই সঙ্গে আর্ট-এর স্বাধীনতাও তাঁদের কাম্য। বিশেষ ক'রে এই আর্ট সামাজিক মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন একটা কিছু নয়। তাঁদের দাবী হ'লো Freedom of Art—এবং এই দাবীই Art for Art's Sake নীতির উদ্ভাবন করে। তাঁদের মতে সাহিত্যের জন্যেই সাহিত্য—ললিতকলার জন্যেই ললিতকলা। সাহিত্য কোনো নীতি মানবে না—কোনো ধর্ম বা কল্যাণকে স্বীকার করবে না—সমাজ ও রাষ্ট্রের কোনো দায়িত্বই সে পালন করবে না—এমন কি সমাজ ও রাষ্ট্রের ভ্রূকুটিও সে উপেক্ষা করবে। সাহিত্য ও শিল্পকলার উদ্দেশ্য শুধু রসসৃষ্টি—তা সে যেভাবে যে উপায়েই হোক। সে সময় সাহিত্যে এই অবাধ-মুক্তির নীতিটি অনেককে আকৃষ্ট করেছিল। আমাদের দেশেও পরবর্তীকালে এই নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। অনেকে এই মতের স্বপক্ষে বলেছেন—অনেকে বিপক্ষেও বলেছেন।

ফরাসী বিপ্লবের যে বিরাটতায়, যে মন্ত্রে সবাই অভিভূত হয়েছিল—তার পরিণামে যখন ব্যর্থতা দেখা দিল—তখন Freedom of Art আন্দোলন—Sense of fact বা রূঢ় বাস্তববোধের পথ ধরে চললো। এই Sense of fact নীতি আরও তীব্র ও স্পষ্ট রূপে দেখা দিল। সাহিত্যে Sense of fact—সত্যের নগ্ন চিত্র—এমন কি কদর্য কামনার চিত্র অঙ্কনের সহায়কও হলো। Art for Art's Sake নীতির সঙ্গে এই নীতির সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ট ছিল। Art for Art's Sake-এ (রসের জন্য রস) জীবন-জিজ্ঞাসা তেমন প্রাধান্য

লাভ করেনি। মানুষের কথা নয়—মানব জীবনের ভোগলিপ্সা, আসক্ত লিপ্সাই পরের দিকে সাহিত্যে বড়ো হ'য়ে দেখা দিল। তার জের আমাদের সাহিত্যেও অনেকদিন ধরে চলেছিল।

জীবনের রসতৃষ্ণা থেকে শিল্পের জন্ম। শিল্পসৃষ্টি জীবনের তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে। সাহিত্যে মানব জীবনের আত্মোপলব্ধির আনন্দটুকু রয়েছে। 'Art for Art's Sake'-মতবাদীরা বললেন—বিষয়বস্তু—ভালো কি মন্দ বিচারের ওপর শিল্প সম্পদ বা সমৃদ্ধি নির্ভর ক'রে না—কি ক'রে শিল্পী শিল্পকে সুন্দর করে প্রকাশ করলেন—সেটাই বড়ো কথা। তাঁরা বিষয়বস্তুকে অনেকটা তুচ্ছ ভেবেই বলেন যে, প্রত্যেক শিল্পীই রুমাল গামছা বোতল থেকে আরম্ভ ক'রে প্রিয়ার মুখ, মানব ভাগ্য প্রভৃতির ওপর সমান গুরুত্ব আরোপ ক'রে, তাদের সাহিত্যের উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন। Style এবং diction—এই দু'ইটি তাঁদের কাছে সাহিত্যের বড়ো ব্যাপার হ'লেও তাদের যে কৌশলে উপস্থাপিত করা হয়—সেই কৌশলের দিকেই তাঁদের লক্ষ্য ছিল বেশি। এই প্রবল মতবাদ সাহিত্য-সৃষ্টি তথা শিল্প-সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্যের বিনষ্টি ঘটাচ্ছিল।

তবে এই মতবাদের আবির্ভাবের ফলে একটি শুভযোগও দেখা দেয়। শিল্পসৃষ্টির বিষয় বস্তু—দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সময়ের কোনো কোনো শিল্পী এও দেখালেন যে, শিল্পের উপকরণ এই পৃথিবীর সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে। তাকে জানার ও প্রকাশ করার মতো মন চাই। Art for Art's Sake-মতবাদীরা বললেন—আর্ট কখনও কারও উপকার করতে যায় না—শিল্পী কখনও কোনো জিনিসের ভালো-মন্দ বিচার করতে বসেন না—শিল্পীর লক্ষ্য রাখতে হয় সার্থক সৌন্দর্য সৃষ্টির দিকে। বস্তুর আড়ালে যে সৌন্দর্য রয়েছে তাকে প্রকাশ করাই শিল্পীর দায়িত্ব। আর্ট কখনও কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে ব্যবহৃত হবে না—আর্ট কখনও উদ্দেশ্যমূলক হবে না—সে নিজেই তার উদ্দেশ্য স্বরূপ হবে। আর্টের বিচার হবে—কতখানি সার্থক হয়েছে সে সুন্দরের রূপায়ণে—তার ওপরে। তার মূল্য নির্ধারিত হবে—তার সৃষ্টির সার্থকতায়। এই সৃষ্টি বলতে তারা মনে করতেন—বস্তুকে দেখার মৌলিকতা, অভিনবত্ব এবং কৌশল। দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে সাহিত্য নয়—দৃষ্টিভঙ্গিকে কলা-নৈপুণ্যের ভিত্তিতে ফুটিয়ে তুলতে হবে। প্রকাশভঙ্গি ও কলা-কৌশলের দিকে সবাই এমন ঝুঁকে পড়লেন যে—তখন শিল্পের অন্যান্য উদ্দেশ্যের কথা—বিশেষ ক'রে শিল্প ও জীবনের নিবিড় সম্পর্কের কথা গৌণ হয়ে গেল।

একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, তাঁরা নিছক রসসৃষ্টির উদ্দেশ্যে শিল্পসৃষ্টি করতে গিয়েও শিল্পসম্পদ অনেকখানি বাড়িয়ে তুলেছিলেন। কিন্তু সমাজ-নিরপেক্ষ শিল্পসৃষ্টি করতে গেলে নিজেকেও ফাঁকি দিতে হয়। আমরা সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছি যে—সাহিত্যে নীতির আতিশয্য থাকা উচিত নয়—তা ব'লে নীতি-বিরুদ্ধ কিছু থাকাও বাঞ্ছনীয় নয়। Art for Art's Sake-মতবাদীরা নীতির কথা গোড়াতেই অস্বীকার করেছেন।

মহৎ সাহিত্যের বা শিল্পের দায়িত্ব শুধু শিল্পসৃষ্টিতেই নয়। তাতে জীবনের স্বীকৃতি না থাকলে—জীবন-নীতির স্বীকৃতি না থাকলে আমরা তাকে সার্থক সৃষ্টি ব'লে মেনে নিতে পারি না। শরৎচন্দ্র Art for Art's Sake নীতিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার না করলেও একথাও বলেছিলেন 'Art for Art's Sake কথাটি যদি সত্য হয়, তাহলে কিছুতেই তা Immoral হ'তে পারে না এবং অকল্যাণকর হ'তে পারে না এবং অকল্যাণকর এবং Immoral হ'লে Art for Art's Sake কথাটাও কিছুতেই সত্য নয়...' শরৎচন্দ্রের Freedom of Art কিছুটা সমাজ-নীতি শাসিত—কাজেই তাঁর 'Art for Art's Sake' নীতির সম্বন্ধে পূর্ণ সমর্থনের এমন কোনো আভাস অন্তত তাঁর বক্তব্যের মধ্যে পাই না। চেষ্টারটন তো স্পষ্টই বললেন, 'There must always be a moral soil for any great aesthetic growth.'

যাঁরা Art for Art's Sake নীতিকে স্বীকার করে নিয়েছেন—তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন যে, 'The fact must cause one to reflect in almost every epoch of history, when the arts blossomed and taste ruled, one finds that humanity declined...' (Schiller) শিলারের মতে রুচি বা নীতিও আর্ট-এর সার্থক বিকাশ এবং মানবতা সমভাবে থাকতে পারে না। তাঁর মতে রুচি বা নীতি এবং রাজনীতিক স্বাধীনতা পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং 'beauty establishing her sovereignty only upon the ruins of the heroic virtues'. কিন্তু প্রশ্ন হ'ল—আর্ট যদি রুচিকে একেবারে অস্বীকার ক'রে ভোগ-লালসার রূপকে প্রতিষ্ঠিত করতে যায়—সেখানে জীবন-প্রতিকূল শিল্পকর্মও যে মানব সভ্যতার পরিপন্থী হয়ে পড়ে! যিনি শিল্পী তিনি সামাজিক—সমাজ তাঁকে সৃষ্টি করেছে—অন্য দিকে তিনিও সমাজকে গ'ড়ে তুলছেন। সমাজকে বাদ দিয়ে কোনো শিল্পকর্মই কখনও সার্থকতা লাভ করতে পারে না। অতিরিক্ত আর্ট-নিষ্ঠা যদি

শিল্পীকে মানব-সম্পর্কহীন করে তোলে—তা হলে তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। 'Art for Art's Sake'—যাঁরা বলেন- তাঁরা আর্টকেই একমাত্র উদ্দেশ্য করে তোলেন। কিন্তু আর্ট মানব জীবনের অন্যান্য উদ্দেশ্যের মতোই একটি উদ্দেশ্য। বস্তুকে অবলম্বন ক'রে বস্তুর উর্ধ্বলোকে নিজের চেতনাকে ব্যাপ্ত করতে পারলেই শিল্পীর সৃষ্টির সার্থকতা। বিষয়বস্তুর পার্থক্য রসসৃষ্টির জন্যই স্বীকার করতে হয়। কিন্তু কেবল মাত্র কলা কৌশলের উপর—এবং বিষয়বস্তুর বিচারে—সব বিষয়ই এক—One subject is as good as another—এই মতবাদ যা মনোভাবের উপর নির্ভর ক'রে রসসৃষ্টি সম্ভব নয়। সাহিত্য জীবনকে রসসমৃদ্ধ করে। মানব জীবন যে তা থেকে নিজের বাঞ্ছিত আনন্দটুকু লাভ করে—তা একমাত্র জীবন ও শিল্পের নিবিড় যোগ রয়েছে বলেই। সাহিত্য, সাহিত্যিক ও পাঠক—এই তিনের যোগেই সৃষ্টির সার্থকতা। তাই Art for Art's Sake নয়—Art for Life's sake বলাই যুক্তিযুক্ত। যে নীতির উদ্দেশ্য ভোগে লালসায় ব্যাহত—সে রসের বা আর্টের নীতি অসংশয় স্বীকৃতি লাভ করেনা। আর্টের পরিচয় জীবন-নিরপেক্ষ রূপায়ণেও নয়—রাজনীতিক উদ্দেশ্য সাধনেও নয়। আর্ট পরাধীনও নয়—একেবারে নির্বাধ স্বাধীনও নয়। আর্ট ও জীবন পরস্পর অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। জীবনের পরিপূর্ণতার জন্যে—তার পথ নির্দেশের জন্যেই এই আর্ট বা সাহিত্য। তাই আর্টের নিজের sakeএ নয়—সমাজ জীবনের sake-এই তার অবতারণা।

সাহিত্যে ট্র্যাজেডি ঃ

মানব জীবন ধারা বয়ে চলেছে অবিরাম গতিতে। এই জীবন সুখদুঃখ, ভালোমন্দ, হাসিকান্না দিয়ে গড়া। শুধু সুখই পাবো—মানুষের জীবনের এমন বাসনা থাকলেও তার জীবনে দুঃখ আছে, বেদনা আছে—আছে অতৃপ্তির হাহাকার। ভালো করে ভেবে দেখলে দেখা যায়, সুখের চেয়ে দুঃখ-বেদনার পরিমাণই মানুষের জীবনে বেশি। মানুষের জীবনের গভীরেই ট্র্যাজেডির বীজ উপ্ত আছে। জীবনের দুঃখ অপমান যে গভীর বেদনার সৃষ্টির

করে—তা থেকেই ধীরে ধীরে ট্র্যাজেডি বাইরে রূপ পেতে থাকে। মানব জীবনের নানা ঐশ্বর্যের পাশেই এই ট্র্যাজেডি বর্তমান। যেখানে অটুট শান্তি বিরাজমান সেখানেই কোন এক অভিশাপে ট্র্যাজেডি এসে সব ভেঙে চুরমার করে দেয়। বাইরের শক্তি, অদৃশ্য শক্তি বা নিয়তি প্রভৃতি নানা প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে সংগ্রামে জীবন বিপর্যস্ত হয়। অপমানের জ্বালা জীবনে জাগায় অভিমান। সেই অভিমান—সাধারণ নিয়মের পথ থেকে জীবনকে নিয়ে যায় অনেক দূরে। তারপরে 'দিক হারা নিজেকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না।'

প্রাচীন গ্রীক নাটক থেকেই ট্র্যাজেডি—সাহিত্যের অন্যতম রস রূপে গৃহীত হয়েছে। অন্যান্য গ্রীক-কলার মতো ট্র্যাজেডিও একটি সরল ও ঋজু ভঙ্গি নিয়েই গ্রীক সাহিত্যে দেখা দিয়েছিল। সফক্লস, য়্যুরিপিডিস, ইস্‌কাইলাস প্রভৃতি ট্র্যাজেডি রচনায় বিপুল খ্যাতি লাভ করেন। তাঁদের রচনায় দেখতে পাই, নিয়তির দুর্বার গতিকে মানুষের এমন কি দেবতারও রোধ করা সম্ভব নয়। গ্রীক ট্র্যাজেডিতে Nemesis বা নিয়তি একটি প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। গ্রীক নাটকে কোনো বিরাট পুরুষের নৈতিক বা বুদ্ধি-বিভ্রমজনিত পতনের বর্ণনা থাকতো। দেবতারা ঘটনা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে বিশেষ অংশ গ্রহণ করতেন। কাহিনীর প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির সঙ্গে তাঁরাও জড়িয়ে পড়তেন। কাহিনীকে বিষাদময় পরিণতির দিকে নিয়ে যাবার ব্যাপারে—নায়কের জীবনে বিপর্যয় ঘটানোর ব্যাপারে—তাঁরা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতেন। মানুষ নিয়তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হতো। গ্রীক নাটকের নায়কেরা সাধারণত বিরাট পুরুষের প্রতীক স্বরূপ ছিলেন। আরিস্‌টটল্ ট্র্যাজেডির বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে গিয়ে বলেন—

Tragedy is the representation of an action which is serious, complete in itself, and a creation of limited length; it is expressed in a speech made beautiful in different ways in different parts of the play; it is acted, and not merely recited; and by exciting pity and fear it gives a healthy outlet to such emotions.'

ট্র্যাজেডিতে মোটামুটি কি কি বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার তার প্রায় সবগুলিই উদ্ধৃতাংশে বলা হয়েছে। অ্যারিস্‌টটল্ প্রদত্ত সংজ্ঞার ওপর ভিত্তি ক'রেই পরবর্তীকালে ট্র্যাজেডির লক্ষণগুলি নির্ণীত হয়েছে। মানুষের জীবনে কিভাবে,

কেমন ক'রে যে ট্র্যাজেডি দেখা দেয়—তা বলা দুষ্কর। বাইরের জগতের সঙ্গে চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষার বিরোধের ফলে অনেক সময় ট্র্যাজেডি দেখা দেয়। একদিকে যেমন মানুষের মর্যাদাবোধ, অভিমানও ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করতে পারে —অন্যদিকে তেমনই মানব জীবনের অনেক গুণ থাকা সত্বেও তার অন্তর্নিহিত চারিত্রিক দুর্বলতাও ট্র্যাজিডির কারণ হতে পারে। ট্র্যাজেডির ঘটনাগুলির মধ্যে নায়কের যে ভয়াবহ ও বিষাদপূর্ণ পরিণতি দেখা দেয়—তা আমাদের অর্থাৎ দর্শকের মনে করুণা ও ভয়ের সঞ্চার করে—এবং করুণা ও ভয়ের সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনের pity ও fear-এর বেগ অনেকখানি শমিত হয়। সেইখানেই রয়েছে ট্র্যাজেডির আনন্দ। আমাদের মনেও এক ধরনের idea রয়েছে। এই idea থেকে কতকগুলি emotion আমাদের জীবনে গ'ড়ে উঠে। এই emotionএর আতিশয্য থেকে একমাত্র ট্র্যাজেডিই আমাদের মনকে কিছুটা হাল্‌কা করতে পারে। ট্র্যাজেডি যে আনন্দ দেয়—করুণা ও ভয়ের সৃষ্টি ক'রে যেভাবে বেদনার উপশম করে—তাকে আরিস্‌টটল্ বললেন Katharsis (Catharsis—মোক্ষণ)। ট্র্যাজেডি emotionএর অতিরিক্ততা থেকে মনকে হাল্‌কা করে—জীবনের এত দুর্যোগ—এত বিপর্যয়—এত দুঃখ বেদনার মধ্যেও আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি করে। অত্যন্ত দুঃখময় পরিবেশেও ট্র্যাজেডি আমাদের ভারমুক্ত করতে পারে।

আরিস্‌টটল্-এর ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা নিয়ে অনেকদিন থেকে অনেক আলোচনাও হচ্ছে। বর্তমান যুগে পাশ্চাত্ত্য জগতে কয়েকজন বিখ্যাত সাহিত্যরসিক ট্র্যাজেডির স্বরূপ বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁরা আরিস্‌টটল্-এর সংজ্ঞাকে কেউ একেবারে অস্বীকার করতে পারেননি—বরং তাঁর সংজ্ঞাকে কেন্দ্র করেই তাঁরা ট্র্যাজেডি নিয়ে আলোচনা করেছেন। Dixon তাঁর Tragedy গ্রন্থে যে 'extremes of pity and alarm'এর কথা বলেছেন—তা আরিস্‌টটল্-এর pity ও fear ছাড়া আর কিছু নয়। এই pity ও fearএর উদ্রেক ও মোক্ষণের কথাই প্রায় সর্বত্রই বলা হয়েছে।

আরিস্‌টটল্ও যখন বলেন 'Tragedy's function is to purge away our excess emotions'—সেখানে 'emotions' এর মধ্যে pity ও fear ও রয়েছে। Theory of Drama গ্রন্থে Nicoll ট্র্যাজেডির আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, ট্র্যাজেডি প্রকৃত পক্ষে বিস্ময়ভাবকেই জাগাতে চায়। এই বিস্ময়

ভাবটিকে তিনি emotion of awe বলেছেন। ট্র্যাজেডিতে করুণ-রস (Pathetic) থাকবেনা—এমন কথা কেউ বলেন না। করুণ রস কতখানি থাকলে ট্র্যাজেডি হবেনা—এমন কোনো সীমারেখাও কেউ টেনে দেননি। যদি তাই হতো তাহলে সেক্‌স্‌পীয়রের বিখ্যাত ট্র্যাজেডি ম্যাকবেথ, হেমলেট কিং লীয়র, ওথেলো প্রভৃতিকে বাদ দিতে হতো। কারণ তাদের মধ্যে করুণরসের আধিক্য, অতি নাটকীয়ভাব প্রভৃতি সব দোষ বা গুণই বিদ্যমান আছে। ট্র্যাজেডির আদি যে রূপ আমরা দেখতে পাই এবং যার ওপর নির্ভর করে ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা গ'ড়ে উঠেছে তাতে সংলাপের সুসংহত সংক্ষিপ্ততা—একটি মাত্র প্লট—কাহিনীর পরিণতি দেখাবার জন্যে যে কয়টি চরিত্র না-হ'লে-নয় সেই কয়টি চরিত্র—এবং এই সঙ্গে স্থান কাল পাত্রের দৃঢ় ঐক্যও থাকতো। দেবতা বা দৈবচক্র থাকলেও মানব-চরিত্রগুলির মধ্যেও ট্র্যাজেডির যথেষ্ট উপকরণ থাকতো। তাদের পতনের কারণ কেবলমাত্র অদৃশ্য নিয়তিই হতো না—তারা নিজেরাও কারণস্বরূপ ছিল। এই সংসারে বাস করতে গেলে নিজের ইচ্ছা পদে পদে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়। মানুষের মধ্যে যখন সেই প্রতিকূলতার—সেই বাধা-বিরোধের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার প্রবল ইচ্ছা দেখা দেয়—তখন থেকেই শুরু হয় ট্র্যাজেডির ক্রিয়া। গ্রীক-ট্র্যাজেডির মূলে সকল দুর্বলতার ঊর্ধ্বে জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রবল আকাঙ্ক্ষাও বিদ্যমান ছিল। গ্রীক রচয়িতারা আন্তর-প্রকৃতির কথা বললেও—বহিরঙ্গের দিকই তাঁদের লক্ষ্য বেশি ছিল।

গ্রীক সভ্যতার ধারা ক্ষীণ হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক ট্র্যাজেডির ধারাটিও প্রায় শুব্ধ হয়ে আসে। অনেকদিন পর রোমে আবার তার নতুন রূপে আবির্ভাব ঘটে। সেনেকা ছিলেন রোমান ট্র্যাজেডির সার্থক রচয়িতা। সেনেকার রোমান ট্র্যাজেডির মাধ্যমে ট্র্যাজেডি রচনার ধারাটি ইংলণ্ডে এসে পৌঁছে। রোমান ট্র্যাজেডিতে horror-ই প্রধান অংশ গ্রহণ করে। সেনেকা প্রাচীন গ্রীক উপকথা থেকে বিষয় বস্তু সংগ্রহ করে গ্রীক ক্লাসিকাল ট্র্যাজেডির অনুকরণে নাটক লেখেন। কিন্তু তাঁর অনুকরণ নিতান্তই গ্রীক ট্র্যাজেডির বাহ্যরীতির নিষ্প্রাণ অনুসরণেই সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রীক নাটকের গভীরে তিনি প্রবেশ করেননি। গ্রীকনাটকে যে নিয়তিবাদের কথা রয়েছে তার পরিবর্তে তিনি প্রতিহিংসার (revenge) মনোভাবকে ট্র্যাজেডির কারণ বলে গ্রহণ করেন। রক্তপাত, নিষ্ঠুরতা—তাঁর রচিত ট্র্যাজেডির অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে দেখা দেয়। গ্রীক

নাটকে যে পরিমিতি বোধ ছিল তাঁর নাটকে তার অভাব লক্ষিত হয়। সেনেকা ছিলেন, অনেকটা রোমান্টিক্-ভাবাপন্ন লেখক—তাই হয়ত নিজের রুচি অনুযায়ী তিনি নতুন ক'রে ট্র্যাজেডি রচনা করেছিলেন। এলিজাবেথীয় যুগের নাট্যকাররা সেনেকাকেই গ্রীক নাটকের প্রতিনিধি বলে স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন। Moralityর ঐতিহ্য অনুযায়ী 'উপদেশাত্মক' ভাষণ প্রভৃতি সেযুগের ইংরাজরা ভালবাসতেন বলে সেনেকা সহজেই তাঁদের প্রিয় হলেন। ·সেনেকার নাটকের দীর্ঘ সংলাপ অভিনয়ের জন্য লিখিত হয়নি—কিন্তু এলিজাবেথীয় নাট্যাকাররা অভিনয়ের জন্যেই দীর্ঘ সংলাপ জুড়ে দিলেন। ইংলণ্ডে যাঁরা ট্র্যাজেডি রচনা করছিলেন তাঁদের মধ্যে কিড্, মার্লো, সেকস্পীয়রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিডের The Spanish Tragedy, মার্লোর Tamberlaine the Great, Dr Faustus প্রভৃতি, সেক্স্পীয়রের ম্যাক্বেথ, হ্যামলেট, কিং লীয়র প্রভৃতি ট্র্যাজেডি রচনার সার্থক দৃষ্টান্ত। ট্র্যাজিক পরিবেশ গঠনে সেক্স্পীয়র সিদ্ধহস্ত ছিলেন। অনেকে বলেন যে, তিনি ট্র্যাজেডি রচনায় আবার গ্রীক বৈশিষ্ট্য পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সেকস্পীয়রের রচনা থেকেই ট্র্যাজিক কাহিনী সংস্থাপনায়, চরিত্র চিত্রণে কিছুটা অভিনবত্ব দেখা দেয়। সেক্স্পীয়রের ট্র্যাজেডির নায়কের অসাধারণত্ব লক্ষণীয়। তবে সেই সঙ্গে চরিত্রগুলিতে সামান্যতম চারিত্রিক দুর্বলতাও তিনি মিশিয়ে দিয়েছেন। এই দুর্বলতা অনেক সময় নায়কের জীবনে ট্র্যাজেডিকে ঘনিয়ে এনেছে। সমাজের উচ্চস্তরের মানব-চরিত্রই ছিল তাঁর ট্র্যাজেডির নায়ক। প্রধান প্লটের সঙ্গে তিনি অনেক গৌণ প্লটও জুড়ে দিয়েছিলেন। গ্রীক নাটকে নিয়তি বা অদৃষ্ট ছিল ট্র্যাজেডির প্রধান কারণ—সেক্স্পীয়রের নাটকে tragedy of characterও দেখা দিল। সেক্স্পীয়র যে গৌণ প্লটগুলি নিতেন তাদের সঙ্গে প্রধান প্লটের ঐক্য তিনি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ব্যাপারগুলিকেও তিনি অস্বীকার করেননি। তাঁর নাটকে নায়ক চরিত্রের অন্তর্নিহিত দুর্বলতার রন্ধ্রপথে ট্র্যাজেডি দেখা দিয়েছে। সেক্স্পীয়রের নাটকের ট্র্যাজেডি শেষ পর্যন্ত প্রশান্তিতেই পরিণতি লাভ করেছে। Miltonএর ভাষায় বলা যায় যে, তাঁর ট্র্যাজেডি পরিণতি লাভ করে 'with calm of mind all passion spent'.

সেকস্পীয়রের পরে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুখ্যত horror tragedyই রচিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে এসে আমরা ইবসেনের নাটকে

আবার ট্র্যাজেডির এক অভিনব রূপ প্রত্যক্ষ করি। তিনি ট্র্যাজেডি রচনার জন্যে তাঁর সময়ের সামাজিক পটভূমিকে গ্রহণ করেছিলেন। গ্রীক নাটকের অদৃশ্য নিয়তিও সেখানে কিছুটা অংশ গ্রহণ করেছে। ইবসেন থেকে Social Tragedyর ধারা প্রবাহিত হ'লো। তার পরে আধুনিক সভ্যতার নানা সমস্যা-কণ্টকিত গার্হস্থ্য জীবন সাহিত্যের বিষয়বস্তু হয়ে উঠল। Domestic Tragedy রচনার সূত্রপাত হ'ল। Robertson, Bernard Shaw প্রভৃতির নাটকে পারিবারিক জীবনের ট্র্যাজেডির রূপালেখ্য আমরা পেলাম। কিন্তু খাঁটি গ্রীক ট্র্যাজেডি আদি মহাকাব্যের মতোই আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। তার প্রধান কারণ, মানুষের জীবন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির বিরাট পরিবর্তন। আমাদের জীবনের গঠনও আর পুরানো দিনের সঙ্গে মেলেনা।

ট্র্যাজেডির নায়কের যে সকল বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয় তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে—নায়ক আদর্শ পুরুষ হয়েও অনিবার্যভাবে ভাঙা পথ বেয়ে চলেন। ট্র্যাজেডির নায়ক অনেক দিক থেকেই ভালো—কিন্তু কতকগুলি radical defectএর জন্যে তাঁর error of judgment হয়—তিনি মারাত্মক ভুল ক'রে বসেন। কখনও কখনও কোনো বিষয়ের প্রতি অত্যধিক fixationও (প্রসক্তি) তাঁর ট্র্যাজেডির কারণ হয়। আবার যেখানে অন্যায় বা ভুল না ক'রেও ট্র্যাজেডির পেষণ থেকে অনেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন না—সেখানে tragedy of circumstance দেখা দেয়। জীবনের নানা দ্বন্দ্ব সংঘাত নায়ক চরিত্রকে একেবারে বিপর্যস্ত করে দেয়। জীবনের দুর্বলতা, অভিমান প্রভৃতি একান্ত নিষ্ক্রিয় চরিত্রেও ট্র্যাজেডি এনে দিতে পারে। Nicoll এ ধরনের চরিত্র সম্বন্ধে বলেন—Finally there is perhaps one other species of hero that might be considered, again a subdivision of the wrongly acting character. In this type the hero accepts a life of crime not because of some flaw in his being, but because of circumstances which operate harshly against him and in his crimes he remains honest and pure-souled. নায়কের জীবনে যে পরাজয় আসে—তাকে সে মাথা নিচু করে মেনে নেয় না—তার অনিচ্ছাকৃত স্বীকৃতিতেই ট্র্যাজেডির সার্থকতা। বিসর্জনের রঘুপতি, প্রফুল্ল নাটকের যোগেশ, চন্দ্রশেখরের চন্দ্রশেখর-শৈবলিনী-প্রতাপ-দলনী, কৃষ্ণকান্তের

উইলের গোবিন্দলাল, সীতারামের সীতারাম, শরৎচন্দ্রের দেবদাস প্রভৃতি সার্থক ট্র্যাজিক চরিত্র। এদের জীবনকে কেন্দ্র ক'রে যে ট্র্যাজেডি গ'ড়ে উঠেছে—তা সমগ্র রচনাকেই ট্রাজেডি-রসাশ্রিত ক'রে তুলেছে। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে ট্র্যাজেডি নেই। ভারতীয় জীবনদর্শনই এমনভাবে গড়া যে তাতে ট্র্যাজেডির স্থান নেই। আমাদের প্রাচীনেরা মৃত্যুকে মহিমময় ক'রে তুলেছেন—জীবনের শত দুর্যোগেও তার বিশালতাকে খর্ব করেননি। সব কিছুরই শেষ পরিণাম মঙ্গল—এই বিশ্বাস তাঁদের ট্র্যাজেডি রচনার অনুকূল পরিবেশ রচনা করতে পারেনি। যেখানে অমৃতত্ব বড়ো—সেখানে মানব জীবনের frailty গৌণ ভাবেই দেখা দেয়। তাই ট্র্যাজেডি লক্ষণাক্রান্ত হয়েও সংস্কৃত কাব্য-নাটক শুভপরিণামান্ত হয়েছে।

ট্র্যাজেডি প্রসঙ্গে Voltaire বলেছিলেন 'Kings, emperors, generals of armies, principal chiefs of republics—it does not matter, but tragedy always requires characters raised above the common plane.' পাশ্চাত্ত্য দেশে ট্র্যাজেডির নায়কের এই আভিজাত্যের কথা রেনাশাঁসের যুগ থেকে অনেকেই মেনে নিয়েছিলেন। ট্র্যাজেডির উপকরণ হলো 'great themes and illustrious persons.' রোমান্টিক্ ট্র্যাজেডিতে এই আভিজাত্যই ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু অনেক সময় সেখানেও পুরোপুরি আদর্শটি বজায় থাকেনি। নিও-ক্লাসিক ট্র্যাজেডি বরং বিশুদ্ধ idealistic রূপ পরিগ্রহ করে—কিন্তু রোমান্টিক ট্র্যাজেডিতে idealistic ও realistic ভাব মিশে গেছে। সেখানে 'The tragic hero is often set in a world of common place men and things,' তবুও সর্বত্রই ট্র্যাজেডি রসাশ্রিত চরিত্রগুলি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে।

ট্র্যাজেডির প্রধান উদ্দেশ্য আনন্দোপলব্ধি। মানুষ ট্র্যাজেডির নায়কের বিপর্যয়ে নিজের সত্যরূপের প্রতিকৃতি দেখতে পায়। নিজের জীবনের অনেকখানি বোঝা সে হালকা করে নেয় এই ট্র্যাজেডির করুণরসে নিজেকে সিক্ত ক'রে। মানুষের এই বেদনা-বোধের মধ্যে আনন্দের অনুভূতি রয়েছে। ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে ট্র্যাজেডির কথা বলা না হলেও, আমরা নবলব্ধ দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা তার মধ্যেও ট্র্যাজেডির লক্ষণ দেখতে পাই। তাই তো অনেকে বলেন, রামায়ণ-মহাভারত যতোই শুভ-পরিণামান্ত হোক না কেন—তার বিষাদময় সুরটি

উপেক্ষা করার নয়। ভীষ্ম, কর্ণের জীবনের ট্র্যাজেডি আমাদের অভিভূত করে। সাহিত্য ও জীবনের সাধারণীকরণের সফলতাতেই ট্র্যাজেডি আমাদের কাছে এত প্রিয়। ট্র্যাজেডি-বোধে আত্মোপলব্ধির কথাটাই বড়ো ব'লে—মানুষ তার মধ্যে নিজের পরিচয় অনেকখানি পায় ব'লেই— বিশ্বের প্রায় শ্রেষ্ঠ রচনাগুলিই ট্র্যাজেডির উজ্জ্বলতম পরিচয় বহন করছে।

সাহিত্যে কমেডি ঃ

সাহিত্যে ট্র্যাজেডি যতখানি জায়গা জুড়ে আছে সেই তুলনায় কমেডির স্থান খুব কম না হলেও বেশি নয়। মানুষ ট্র্যাজেডির বিরাট পরিবেশে নিজের স্বরূপ অনেকখানি জানতে পারে। কান্নাটি এমন কিছু তৃপ্তিদায়ক নয়—কিন্তু তার মধ্যে দিয়ে সত্যের দিকটা সুন্দর হয়ে প্রকাশ পায় ব'লেই—দুঃখ-বেদনার রূপটি মানুষকে বেশি আকর্ষণ করে। বিচ্ছেদের হাহাকার, সব সময় অতৃপ্তি ও অভাববোধ—আমাদের মধ্যে সে বেদনাবোধের সৃষ্টি করে—ট্র্যাজেডির মধ্যে তার স্বরূপটি দেখে মানুষ নিজে পরিতৃপ্ত বোধ করে। এই যে আনন্দবোধ বা পরিতৃপ্তি তা মুখ্যত আত্মোপলব্ধির আনন্দ। তবে সাহিত্যে যে কমেডি নামক একটি বিশেষ লক্ষণের পরিচয় পাই তার মূল্যও সাহিত্য ক্ষেত্রে অনেকখানি।

ট্র্যাজেডির মতো কমেডিও প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত। আরিস্‌টটল্‌ ট্র্যাজেডির লক্ষণ যেমন নির্ণয় করেছিলেন তেমনই কমেডির লক্ষণ সম্বন্ধেও বলেছিলেন 'A comedy is an imitation of worse than the average'. কমেডির নায়ক যে সব সময় হাস্যকর ভুল করবে তাও নয়। তার বিশেষ এক ধরনের ভুল করাই হাস্যরসের সৃষ্টি করে। হাস্যরসাশ্রিত রচনাই কমেডি। বর্তমানে কমেডি বলতে আমরা মিলনান্ত কথাটি সংজ্ঞা হিসাবে ব্যবহার করি। সাহিত্য প্রধানত ট্র্যাজেডি ও কমেডির পথ ধ'রেই চলে।

বর্তমান দিনে মানুষ সম্বন্ধে সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তাকে হাস্যরসিক জীব (laughing animal) বলা হয়েছে। ভগবানের সৃষ্টিতে আর কোনো জীবই মানুষের মতো হাসতে পারে না। অন্যান্য জীবের মধ্যে কারও অনুভব করার

ক্ষমতা আছে, কিন্তু তা প্রকাশ করার ক্ষমতা নেই—কারও ক্ষুধা বা ক্রোধ প্রকাশ করার ক্ষমতা আছে। কিন্তু আনন্দ প্রকাশের জন্য মানুষের যে হাসিটি আছে—তা একান্তভাবে মানুষের নিজস্ব। তবে হাসিটি তো আর এমনিতেই প্রকাশ পায় না—সেই সঙ্গে মানুষের হিউমার-বোধটাও (sense of humour) থাকে। অপ্রত্যাশিতকে পাওয়ার আনন্দ, খুশির প্রকাশ, এবং অপরের জীবনের হাস্যকর ত্রুটি-বিচ্যুতি বোঝার ক্ষমতা মানুষের রয়েছে। এই বোধটি প্রাণীজগতে আর কারও নেই। মানব জীবনের anomalies এবং abnormalities-কে জীবনের অসঙ্গতি বলা যায়। অবশ্যি ট্র্যাজেডিতেও এই অসঙ্গতি বর্তমান।

কমেডি-বোধ অপেক্ষাকৃত পরের দিকে রূপ লাভ করে। বিশেষ ক'রে সামাজিক মানুষের মধ্যেই এই কমেডি-বোধ সার্থক ভাবে দেখা দেয়। যখন মানুষ সমাজ-বন্ধনে বাঁধা পড়লো—যখন তার আত্মীয়-স্বজন-প্রতিবেশী-মুখর সমাজ ব্যবস্থা দেখা দিল—তখন নিজেদের মধ্যে আনন্দের আদান-প্রদানের ব্যাপারের যে মানসরূপটি আমরা পাই—তাকেই কমেডি আখ্যা দেওয়া যায়। সাধারণ সমাজ জীবনে হঠাৎ কোনো অসঙ্গতি দেখলে—জীবন-পথে চলার সাধারণ নিয়মটির হাস্যকর ব্যতিক্রম দেখলে—অথবা ভাবভঙ্গির মধ্যে হাস্যকর কিছু থাকলে—হয় আমরা মুচকি হাসি—নয়তো সশব্দে হাসি।

আনন্দের অভিব্যক্তির মধ্যেও এই কমেডির আভাস রয়েছে। সভ্যতার প্রথম যুগের মানুষের—এমন কি অর্ধসভ্য গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের মধ্যেও—নিজের আনন্দ প্রকাশ করবার উপায় খোঁজার বিরাম ছিল না। নাচ, গান বা অন্যের হাস্যময় ভুলত্রুটির ব্যাপারে বেশ কিছুটা হেসে নিয়ে তারা আনন্দ উপভোগ করতো। নাচ-গান ছিল নিজের হর্ষকে প্রকাশ করার সংকেত। কাউকে কিছু করতে দেওয়া হ'লে—সে যদি তা না পারে—অথবা যা ফল পাবার যদি তার ঠিক উল্‌টোটা পাওয়া যায়—তা নিয়ে হাসি ঠাট্টার আর বিরাম ছিল না।

ধীরে ধীরে এই কমিক-বোধ—সাহিত্যেও প্রবেশ করে। প্রাচীন মহাকাব্যগুলিতেও আমরা এই ধরনের কমিক-রসাশ্রিত ঘটনা বা চরিত্র সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করি। মহাকাব্যে সাধারণত বোকা, দম্ভী প্রভৃতির যে চরিত্র দেখতে পাই—তার মূলেও সেই কমেডি-বোধ বিদ্যমান। প্রাচীন যুগের রুচি অনুসারে পেটুক, ভীরু প্রভৃতি চরিত্রও হাস্যরসের খোরাক মেটাবার জন্যে

সাহিত্যে উপস্থাপিত করা হতো। যেমন মহাভারতে ভীমের খাওয়ার ব্যাপারটি অস্বাভাবিকও বটে, হাস্যকরও বটে।

সভ্যতার আদি পর্ব শেষ হবার পরেই কমেডি বোধও কিছুটা সূক্ষ্ম হয়ে উঠল। তখন তাকে বিশেষ কোনো সীমার মধ্যে আর আবদ্ধ রাখা গেল না। সাহিত্যের ক্ষেত্রে কমেডি আরও স্থান-বিস্তারের দাবি নিয়ে এলো। মহাকাব্যে ত কমেডির লক্ষণ আমরা পেয়েছি। পরের দিকে কমেডি নাটকেও এসে জায়গা জুড়ে বসলো। কিন্তু সেখানে আর এক সমস্যা দেখা দিল। মহাকাব্য ও গীতি কবিতা—বক্তা ও শ্রোতার ওপর নির্ভর করে,—কিন্তু হাস্যকর বিষয়গুলি শুধু আবৃত্তির দ্বারা সুপ্রকাশিত হয় না—হাব-ভাব-ভঙ্গি দিয়ে দেখাতে পারাতেই তার সার্থকতা। এইভাবে সাহিত্যে কমেডি একটি স্বতন্ত্র আসন লাভ করে। প্রথম দিকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ভিত্তিতেই কমেডি রচিত হয়। গ্রীক নাট্য সাহিত্যে বিখ্যাত ট্র্যাজেডি রচয়িতা সফক্লস, য়ুরিপিডিস প্রভৃতির মতো সার্থক কমেডি রচয়িতা হচ্ছেন আরিস্টফেনেস।

ধীরে ধীরে কমিক-রসের আদি স্থূলতা কেটে গিয়ে একটি সূক্ষ্ম রূপ দেখা দেয়। যখন সমাজের নানারকম জটিলতা দেখা দিচ্ছে—সামাজিক মানুষের সম্পর্ক যতই সংকট মুহূর্তে এসে দাঁড়াচ্ছে – তখন থেকে কমেডি রচনার উপকরণ ও অবলম্বনও বদলে যায়। ছদ্মবেশ, ভুল বোঝা (misunderstanding), একজনকে অপর কেউ ব'লে ভাবা ইত্যাদি নিয়ে কমেডি রচিত হতে থাকে। Plautus ও Terence-এর নাটকগুলি, সেক্স্পীয়রের প্রথম দিককার কমেডিগুলি মুখ্যত এই আদর্শেই রচিত। তার পরে থেকে অসম্ভব হাস্যকর ব্যাপারগুলি ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে, আর সে জায়গায় নাটকের প্রধান ঘটনার গতিবেগের আশেপাশেই মানব জীবনের অসঙ্গতিগুলি কয়েকটি কমিক চরিত্র সৃষ্টি ক'রে তাদের কার্যকলাপ ও সংলাপের মধ্যে নাটকের হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস পান। এমন কি ট্র্যাজেডি ও ট্র্যাজেডির সম্ভাবনা-পূর্ণ রচনাতেও কমিক দৃশ্যাদি জুড়ে দেওয়া হয়। সেক্স্পীয়র কমেডির একটি মান স্থির করতে পেরেছিলেন ব'লে অনেক সমালোচকরা স্বীকার করে থাকেন। তাঁর সমসাময়িক বেন জনসন—কমেডির আদর্শ প্রচার করতে গিয়ে Comedy of Humours রচনা করেন। সেক্স্পীয়রের রোমান্টিক কমেডিগুলিতে বাস্তব-অবাস্তব পরিবেশের সমাবেশ, সম্ভব-অসম্ভব ঘটনার পাশাপাশি অবস্থান প্রভৃতির দ্বারা নাট্যকার এমন এক আবহাওয়া সৃষ্টি করতে চেয়েছেন

যেখানে মানুষ বাস্তবের স্বার্থপরতা ও সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করে এই পৃথিবীতেই স্বর্গের আনন্দ লাভ করতে পারে। এই দিক থেকে তাঁর 'As You Like It' একখানি সার্থক কমেডি। জনসনের কমেডিগুলিকে অনেকে সমালোচনামূলক বা Critical comedy ব'লে থাকেন। মানব চরিত্রের বড়ো বড়ো দোষ-ত্রুটি ট্র্যাজেডির বিষয়বস্তু—কিন্তু ছোটখাটো দোষ-ত্রুটিগুলি কমেডির বিষয়। রাজতন্ত্র পুনঃ প্রবর্তনের যুগে (Restoration Period) কমেডিই সাহিত্যে প্রাধান্য লাভ করে। এই কমেডিগুলিতে অনেক সময় অশ্লীলতাও এসে পড়েছে। সমাজ-জীবনের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে সেই সময় যে কমেডি রচিত হয়—তাকে Comedy of manners বলা হয়েছে। এইগুলির বৈশিষ্ট্য ছিল—বড়ো বড়ো কথা বলা, চাল দেওয়া, ভান, শঠতা, প্রতারণা প্রভৃতি।

বর্তমান যুগে কমেডি যেন অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছে। মানুষের জীবনের ক্লান্তি হতাশা প্রভৃতি কমেডি রচনার প্রতিকূল অবস্থারই সৃষ্টি করে। বর্তমান যুগে মানুষ শান্তি-রাজ্যের স্বপ্ন দেখে। সামাজিক ত্রুটি বিচ্যুতি শুধরে নেবার চেষ্টা করে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি প্রভৃতি কমেডি রচনার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে না। বিশেষ ক'রে পরপর দু'টি যুদ্ধ মানুষের হিউমার-বোধও অনেকখানি নষ্ট করে দিয়েছে। জর্জ বানার্ড'শ বর্তমান যুগে অর্থাৎ যুদ্ধ-বিধ্বস্ত সমাজ পরিবেশে থেকে কয়েকখানি কমেডি রচনা করেন। তাঁর কমেডির হিউমারে—খোঁচাটাই বড়ো। বর্তমান দিনে আর্থনীতিক, সামাজিক সংকটের মধ্যে প'ড়ে মানুষের হাসি মিলিয়ে গেছে। এখন আমরা ভালো ক'রে হাসতেও ভুলে গেছি। যেটুকু আছে সেও অমায়িকতার দেঁতো হাসি—এ যেন অনেকটা কবরখানার হাসির মতো। তাই এখন আর খাঁটি কমেডি রচিত হয় না।

কমেডির মূল লক্ষ্য হাস্যরস। মিলনান্ত কোনো কাহিনী হ'লেই আমরা তাকে কমেডি বলি। কমেডির সেই পুরানো পরিচয় অনেকখানি দূরে সরে গেছে। কমেডি এখন একটি স্বতন্ত্র শিল্পরূপ লাভ করেছে। প্রাচীন গ্রীক ট্র্যাজেডির মতোই গ্রীক কমেডিও বর্তমানে আর রচিত হয় না—হ'তে পারে না। গ্রীকদের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক ট্র্যাজেডিরও যেমন লোপ ঘটেছে—ঠিক তেমনি গ্রীক কমেডিরও পুনরাবির্ভাব সম্ভব নয়। এখন কমেডি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ভেতর দিয়ে কেবল হাসাবারই চেষ্টা করে না। শুভ পরিবেশের মাধুর্য—মিলনের আনন্দ—দুঃখোত্তীর্ণ, কল্যাণসূচক আনন্দময় পরিণাম প্রভৃতি

এখন কমেডির উপকরণ ও অবলম্বন স্বরূপ। শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' বর্তমানকালের বিচারে মিলনান্ত—তাই একে আমরা কমেডি বলি। মধ্যযুগের মঙ্গল কাব্যে কমিক উপকরণ যথেষ্টে ছিল। মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্রের রচনায় তার সার্থক নিদর্শন পাওয়া যায়। আমাদের দেশে কমিক উপকরণ নিয়ে উনবিংশ শতাব্দীতেও সাহিত্য রচনা শুরু হয়। যোগেন্দ্র বসু, বঙ্কিমচন্দ্র, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি, বর্তমান যুগে রাজশেখর বসু (পরশুরাম) প্রভৃতি অনেকেই কমিক উপকরণ নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন। ইংরাজিতে Comedy of Intrigue, Comedy of dialogue, Comedy of manners, Romantic Comedy প্রভৃতি যে সব কমেডি-বিভাগ পাওয়া যায় বাংলা সাহিত্যেও তার দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

ট্র্যাজেডি ও কমেডি উভয়েই আনন্দদান করে। একটি বিষাদের পথ ধ'রে—অন্যটি হর্ষের পথ ধ'রে—পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। অনেক সময় দু'টিই হাসি-কান্নার মধ্যে দিয়েই আনন্দরস পরিবেশন করে।

সাহিত্যে নীতি ঃ

কবি-সমালোচক মোহিতলাল এক জায়গায় বলেছেন, 'সাহিত্যের যদি কোনো বিধি-বিধান বা নীতিশাস্ত্র থাকে তবে তাহা মুক্ত প্রাণের নীতি। ভালো মন্দ, লাভ ক্ষতি, স্বর্গ নরক প্রভৃতির হিসাব করিয়া মানুষ সমাজ নীতি ধর্মনীতি প্রভৃতি যাহা কিছু গড়িয়া তোলে · এই নীতি তাহা হইতে স্বতন্ত্র।' উক্ত প্রবন্ধেই পরের দিকে সাহিত্যের নীতি আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলছেন '··ইহাতে কোনোরূপ বাধ্যতা বা অধীনতার ভাব নাই। প্রাণ ইহাকে প্রাণেই বোঝে, সংহিতার ব্যাখ্যা শুনিয়া ইহাকে বুঝিতে হয় না।' আচার্য মোহিতলাল সাহিত্যের এক বিশেষ নীতির কথা এখানে আলোচনা করেছেন। কিন্তু সাহিত্যে নীতির স্থান আছে কিনা—সাহিত্য ও নীতির মধ্যে সম্পর্ক কি—নীতি-রহিত সাহিত্য রচনা সম্ভব কিনা—এই সব প্রশ্ন নিয়ে অনেকদিন ধ'রে আলোচনা চলছে।

মানব সভ্যতার পত্তনের সময় থেকেই দীর্ঘকালের সাধনার ফলে মানুষ নানা রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটনে সমর্থ হয়েছে—নানা বিষয়ের আবিষ্কার করেছে, নানা

বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, নানা বিষয় সৃষ্টিও করেছে। মানুষের নানা সৃষ্টির মধ্যে সাহিত্য মানব মনের শ্রেষ্ঠ শিল্পকার্য রূপে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি লাভ করেছে। আমাদের দেশের প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ সাহিত্য সম্বন্ধে যে সকল মতামত জ্ঞাপন করেছেন—তাঁর মধ্যে একটি মত এই যে, সাহিত্য—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ লাভের উপায় স্বরূপ। কেউ তাকে বলেন 'আনন্দ নিষ্যন্দী রূপক'। যাঁরা সাহিত্যকে স্থূল বৈষয়িক-জ্ঞানের উপায় মাত্র মনে করেন—উল্লিখিত মতবাদীরা তাঁদের সাহিত্য-ধারণাকে নিন্দা করেছেন।

পাশ্চাত্ত্য জগতের সাহিত্য-সমালোচকের মধ্যে সাহিত্য ও নীতি এবং সাহিত্যের নীতি প্রভৃতি বিষয়ে নানা মতানৈক্য লক্ষিত হয়। কেউ বলেন—সাহিত্য অন্য-ফল-নিরপেক্ষ বিষয় মাত্র। তার একমাত্র উদ্দেশ্য—রূপসৃষ্টি। এত কোনো প্রচার থাকবে না—তত্ত্ব কথার আড়ম্বর থাকবে না। সাহিত্য হ'বে শুধু রসময় রূপালেখ্য। অনেকের মতে সাহিত্য রূপসৃষ্টি করলেও—তাই তার একমাত্র পরিচয় নয়। আবার কেউ বলেন, সাহিত্য আমাদের মনের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে প্রভাবিত ক'রে আমাদের অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ ক'রে তোলে এবং আমাদের মনকে অত্যন্ত দুর্বল ক'রে দেয়। কেউ বা মনে করেন, সাহিত্য আমাদের বিক্ষিপ্ত প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন ক'রে অন্তরে শান্তির ধারা প্রবাহিত করে।

এই সব অভিমতের উত্তরে বলা যায়—সাহিত্য যে প্রবৃত্তির বা বাসনার উদ্রেক ক'রে আমাদের জীবনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে—তাকে আমরা কখনও উৎকৃষ্ট সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করতে পারি না। সাহিত্যরস আস্বাদনের ওপরেই মুখ্যত নির্ভর করে। কিন্তু সাহিত্যে কোন রসের আস্বাদ পাওয়া যায়—তা বিচার সাপেক্ষ।

প্রাচীন রসবেত্তার মতে 'অপার কাব্য সংসারে' কবিই একমাত্র প্রজাপতি, অর্থাৎ তিনি প্রজাপতি ব্রহ্মার মতো নব নব সৃষ্টির ব্যাপারে মগ্ন। ব্রহ্মা যেমন প্রাণী জগৎ সৃষ্টি করেন—কবিও তেমনি প্রাণ বিশিষ্ট মানব চরিত্রের কল্পনা করতে পারেন—তাকে জীবন্ত রূপ দিতে পারেন। ঐ সৃষ্ট চরিত্রগুলি রচয়িতার অনুভূতির রসে রঞ্জিত এবং তার ভাব ও ভাবনার রূপক রূপে বিধৃত। আবার কবির ভাব ও ভাবনা যখন তাঁর ব্যক্তিগত ভূমিকাকে অতিক্রম ক'রে বিশ্বব্যাপী হয় তখনই সাহিত্য রস-সাহিত্য আখ্যা লাভ করে।

নীতির দিক থেকে সাহিত্যের প্রধান সার্থকতা এই যে—ওটা কবি ও কাব্যরসিককে—নানা চরিত্র, নানা অবস্থা, নানা পরিবেশ—নানা ভাব ও ভাবনার সঙ্গে একাত্মতা লাভে সহায়তা করে। সাহিত্য-বোধের ফল যে সব সময় আমাদের ব্যবহারিক জীবনের স্থূল প্রয়োজন সিদ্ধির সহায়ক হবে তা মনে করা সঙ্গত হবেনা এবং তাকেই সাহিত্যের নীতি বলে মেনে নেওয়াও সম্ভব নয়। রামায়ণ-মহাভারত পাঠ ক'রে আমরা যুদ্ধবিদ্যা, শস্ত্র বিদ্যা, রাজনীতি বা অন্য কিছুতে পারদর্শিতা লাভ করি না। কিংবা যুদ্ধবিদ্যা বা শস্ত্র বিদ্যার প্রতি প্রতিকূল বা অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি করাও মহাকাব্যগুলির উদ্দেশ্য নয়। নানা প্রতিকূল ও অনুকূল ঘটনা-পরিবেশের মধ্যে দিয়ে মানব জীবনের যে সীমাহীন রহস্যের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে—তাই এই কাব্যগুলির বিষয় বস্তু এবং এই মহাকাব্য দু'খানি থেকে আমরা মানব জীবন ও জগতের সেই রহস্যের উপলব্ধির শিক্ষাই লাভ করি।

বর্তমান দিনে সাহিত্য-নীতিতে প্রচার ধর্মের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সাহিত্য-জগতে আলোড়ন দেখা দিয়েছে। প্রচার বা প্রপাগাণ্ডা সাহিত্যের নীতি হতে পারে কিনা—প্রচারধর্মী সাহিত্যকে বিশুদ্ধ সাহিত্য বলা যায় কিনা—তা নিয়ে তর্কের আর শেষ নেই। একদল বলেন, প্রচারধর্মী বা প্রচারপন্থী সাহিত্য সাহিত্যই নয়। আর একদল বলেন, এমন কোনো রচনা কি আছে যার মধ্যে প্রচারের ঝোঁক নেই!

সাহিত্য সম্বন্ধে এক কথায় কিছু বলার চেষ্টা ধৃষ্টতামাত্র। সাহিত্য—শিল্পীর জীবনবেদ অথবা তাঁর জীবনাদর্শের সার্থক প্রকাশ। এই প্রকাশকেই আমরা রসমধুর প্রকাশ বলতে পারি। এর সঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তাদর্শের যোগও রয়েছে। কারণ সাহিত্য শুধুমাত্র অনুভবেরই প্রকাশ নয়। চোখে দেখা এবং স্বপ্নে দেখা বা অনুভূতি যোগে দেখা—দুইই সাহিত্যে রসরূপ লাভ করে। কিন্তু যখন কেউ কোনো একটা বিশেষ মত প্রকাশ করবার জন্যে—অথবা বিশেষ কোনো মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হ'য়ে—সাহিত্য রচনা করেন তখনই তাকে শুদ্ধ প্রচারধর্মী বলা যেতে পারে।

বিশুদ্ধ সাহিত্যরসে-বিশ্বাসী পাশ্চাত্যের সাহিত্য-রসিকরা উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্টি-কর্মকে প্রকৃত সাহিত্য বলে স্বীকার করেননি। তাঁরা বাইরের কোনো প্রভাবকেই স্বীকার করেন না—চিন্তার স্বাধীনতা, ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা, সাহিত্য রচনার স্বাধীনতা তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। বিশেষ মত-প্রচার যে

রচনায় আছে এবং বিশেষ মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত রচনাকে তারা অপাঙ্‌ক্তেয় ব'লে মনে করতেন। অনেকে আবার উক্ত মতবাদীদের বক্তব্যের উত্তরে বলেছেন যে বিশুদ্ধ সাহিত্য ব'লে তাঁরা যাকে সমর্থন জানান তাও তো এক ধরনের প্রচারধর্মের আবরণে আচ্ছাদিত। কীট্‌স কাব্য রচনার মধ্যে উদ্দেশ্য-প্রবণতার প্রতি কটাক্ষ করেছিলেন। তাঁর মতের বিরুদ্ধবাদীরা বলেন—কীট্‌স্‌ও তো সুন্দরের মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর রচনাকেও উদ্দেশ্যমূলক এবং প্রচারধর্মী বলা যেতে পারে। অতএব সাহিত্যে প্রচার ব্যাপারটা এমন কিছু দোষের নয়। প্রচলিত ও গতানুগতিক আদর্শের প্রচারক মাত্র নয় বলেই এর সাহিত্যমূল্য একেবারেই নেই—একথাও বলা যায় না।

আমাদের মনে হয় সাহিত্য ও নীতি নিয়ে এত বিরোধ যে দেখা দিয়েছে তার মূলে কতগুলি ভুল ধারণাও রয়েছে। সাহিত্য পাঠে পাঠকের মনে কোন ভাবের উদয় হয়—তার মানদণ্ডে সাহিত্যের বিচার করা যুক্তিসঙ্গত হবে না। নীতি শিক্ষাকে সাহিত্য পাঠের ফল বলে অনেকে মেনে নিতে চান। তাঁদের মতের প্রতিবাদে কথা উঠবে—সাহিত্যিকের কাজ সাহিত্য সৃষ্টি—তিনি তো শিক্ষকতা করেননা। সুতরাং নীতিশিক্ষার উদ্দেশ্যে সাহিত্য রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। যুগে যুগে কবির ব্যক্তিমানসের প্রেরণায় সাহিত্য রসরূপ লাভ করেছে। মুখ্যত নীতি শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে আর যাই রচিত হোক অন্তত রস-সাহিত্য রচিত হয়নি। মানব জীবনের উপর সাহিত্যের প্রভাব সর্বজনস্বীকৃত হলেও—সেই প্রভাবই সাহিত্য বিচারের একমাত্র মানদণ্ড হতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, নীলদর্পণ নাটক নীলকর সাহেবদের অত্যাচার অন্যায় জুলুম বন্ধ করবার পক্ষে অনেকখানি সহায়ক হয়েছিল বটে—'আন্‌কল্‌ টম্‌স্‌ কেবিন' দাস ব্যবসা বন্ধ করার ব্যাপারে অনেকখানি সাহায্যও করেছিল—তবুও শুধু সেই সাফল্যের ভিত্তিতেই 'নীলদর্পণ' বা 'আন্‌কল্‌ টম্‌স্‌ কেবিন'-এর সাহিত্য-মূল্য বিচার করা যায় না এবং বিচার করা যুক্তিসঙ্গতও নয়। অন্যদিকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনেক বিখ্যাত গ্রন্থকে অশ্লীলতার দায়ে ফেলা যায়। অথচ তাদের অশ্লীলতা বিশুদ্ধ রসসৃষ্টির পক্ষে কোনো বাধা সৃষ্টি করেনি। পাঠক তার মধ্যে থেকে সাহিত্য রস বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করতে পারেন। আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে, বোকাচিওর 'ডেকামেরনে' আরও অন্যান্য গ্রন্থে অশ্লীলতার অনেক নিদর্শন রয়েছে। তবুও তাদের সাহিত্য-মূল্য তাতে কিছু মাত্র কমেনি।

হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, বৌদ্ধ জাতক, ঈশপের গল্প প্রভৃতি একদিকে গল্প হিসাবে যেমন উপভোগ করা যায়—আবার তার ভেতর থেকে তেমনই নীতি কথাও লাভ করা যায়। পাশ্চাত্ত্যের কোনো এক সমালোচকের মতে, যুগে যুগে নাটকের বিষয়-বস্তু ও অন্তর্নিহিত ভাববস্তুর পরিবর্তন ঘটলেও তার রূপটি নিত্যকালের জন্য অক্ষয় হয়ে থাকে। সেক্‌স্‌পীয়র প্রসঙ্গে তাঁর মত হচ্ছে, এই নাট্যকারের নাটকে যেসব বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তা ও ভাব বাণীরূপ লাভ করেছিল তার বেশির ভাগই বর্তমান দিনে নতুন কোনো ভাব জাগাতে পারে না। অনেকের মতে সে সব পুরানোও হয়ে গেছে। কিন্তু নাটকগুলির গঠন কৌশলের বিস্ময় ও মাধুর্য আজও অটুট রয়েছে। বিখ্যাত দার্শনিক ক্রোচ সাহিত্যের মাধ্যমে নীতি প্রচারকে সমর্থন জানিয়েছেন বটে, তবু তিনিও সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও রূপ-যোজনাকে অভিন্ন করে দেখতে পারেননি। প্রকৃতপক্ষে:সাহিত্যের এই দু'টি দিক পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় ও গভীর ভাবে জড়িত। কবি জীবন্ত চরিত্র সৃষ্টি করেন। তিনি কেবল ভাবের সঙ্গে রূপের যোগসাধনই করেননা—কবি-প্রতিভা যে রূপের সৃষ্টি করে সেই রূপ কবির জীবনাদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই আদর্শ—সজীব রূপ পরিগ্রহ করলেও রস জগতে স্থান লাভ করে।

স্রষ্টার রূপসৃষ্টিকে কখনও তাঁর জীবনাদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। তার প্রমাণ রয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র-শরৎচন্দ্রের চরিত্র সৃষ্টিতে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতিবিবি, রোহিণী, শৈবলিনী, প্রভৃতি চরিত্র শরৎচন্দ্রের অন্নদাদিদি, রাজলক্ষ্মী অভয়া, কমল লতা, সাবিত্রী, চন্দ্রমুখী, কিরণময়ী প্রভৃতি চরিত্র আলোচনা করলে দেখা যায় যে, উভয় রচয়িতার রূপসৃষ্টিই বিশেষ ভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এককালের যাচাই করা সত্য অন্য কালে আর সত্যরূপে স্বীকৃতি লাভ করেনা। মতের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের মূল্যও পরিবর্তিত হ'তে পারে ব'লে অনেকের ধারণা। এই ধারণার সপক্ষে যে যুক্তি দেখানো যায় না তা নয়। তবে এইসঙ্গে আর একটি কথাও ভেবে দেখা দরকার। অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী, তারা, মন্দোদরী প্রভৃতির জীবনের নানা বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও এ চরিত্রগুলি আদর্শ নারী চরিত্ররূপে পরিগণিত হয়েছে। বর্তমান দিনের বিচারে এই আদর্শ নিয়ে বিরোধ দেখা দেবে সন্দেহ নেই। সেদিনের সতীত্ব বিচারের মান আজ আমাদের কল্পনারও অতীত। তা ব'লে আমরা জীবনাদর্শের বিচারে এই যুগকে সেই যুগের চেয়ে বড়ো

বলছিনা। তবুও মূল্যবোধের যে পরিবর্তন এসেছে তা অনস্বীকার্য। আবার একথাও অনস্বীকার্য যে, এই মূল্যবোধের ও মতের পরিবর্তন সত্ত্বেও রামায়ণ মহাভারতের সাহিত্যমূল্য কোনোদিক থেকেই কিছু মাত্র হ্রাস পায়নি। সাহিত্য শুধু জীবনের ছবি নয়—সে জীবনের নানা জটিলতা—নানা অজানা রহস্যের সন্ধান দেয়। সাহিত্যের রস কোনো এক বিশেষ যুগ বা বিশেষ কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সাহিত্যে মতের প্রকাশের চেয়ে মনের প্রকাশই বেশি ঘটে। সেখানে বিশেষ একটি দিনের স্বীকৃতিই শেষ কথা নয়—নিত্যকালের রস প্রকাশেই তার সার্থকতা। তবে সাহিত্য কোনো নীতির দ্বারা চালিত না হলেও সাহিত্যের নিজস্ব একটা নীতি আছে। সাহিত্যের নীতি কোনো বিশেষ কালের সামাজিক বিধি বিধানের অধীন নয়—ঐ নীতি দেশ কাল অতিক্রম ক'রে সকল দেশের সকল কালের মানুষের আনন্দরস পরিবেশনে সার্থক হ'য়ে ওঠে। সাহিত্যে সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণের সুরটি ধ্বনিত হয়। তাই তো দেখি, যে সাহিত্য মানবজীবনকে তার উপাদান উপকরণ সংগ্রহ ক'রে দেয়—সেই সাহিত্যই আবার মানব জীবনকে সুন্দরতর ক'রে তোলে। সাহিত্যের উদ্দেশ্য আনন্দ সৃষ্টি—এই কথা আমরা অকুণ্ঠায় মেনে নিই। কিন্তু আনন্দ সৃষ্টির অছিলায় সাহিত্যে যদি এমন কোনো বিকৃতি দেখা দেয়, যদি সাহিত্য কোনো অন্যায়কে প্রচার করে—তাহলে সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। কাজেই সাহিত্য শুধুমাত্র নীতি প্রচার করবেনা বটে—কিন্তু নীতি-বিমুখী কোনো অসত্যও তার অবলম্বন হবেনা।

ধ্বনি ও রস ঃ

প্রাচীন দিন থেকেই আমাদের দেশে, কাব্যের আত্মা কি—এই প্রশ্নের প্রসঙ্গে ধ্বনি ও রস নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রে এদের ভিত্তিতে ধ্বনিবাদ ও রসবাদ নামক দুইটি অভিমতও গ'ড়ে উঠেছে। আচার্য ভরতের নাট্যশাস্ত্রে রসের উল্লেখ থাকলেও রসবাদ পরের দিকে গ'ড়ে ওঠে। ধ্বনিবাদ এই রসবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। ধ্বনিবাদকে রসবাদ প্রতিষ্ঠার প্রধান উপায় বলা যেতে পারে। এই

দুইটি মতবাদের লক্ষণগুলি এত কাছাকাছি যে অনেক সময় এদের পার্থক্যও বোঝা যায় না। এই অতিনিকটতার জন্যে রসবাদকে অনেক সময় রসধ্বনিবাদও বলা হয়। ধ্বনিবাদ ও রসবাদ গ'ড়ে ওঠার আগেও কাব্য-বিচারের ব্যাপারে নানামত প্রচলিত ছিল। এই দু'টি মত প্রতিষ্ঠিত হবার আগে কেউ অলংকার, কেউ রীতি, কেউ শব্দ, কেউ বক্রোক্তি প্রভৃতি সাহিত্যের আত্মা বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। আচার্য ভরত রসকে কাব্যের মূলাধার বললেও সেই সঙ্গে তিনি কাব্যের অলংকার, গুণ, রীতি প্রভৃতিকেও অস্বীকার করেননি। আচার্য ভরতের মতের অনুসরণে পরবর্তীকালে অনেকে কাব্যের আত্মার স্বরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তার মধ্যে সাহিত্যদর্পণ রচয়িতা আচার্য বিশ্বনাথের উক্তিটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বহুল প্রচলিত ও বহুল আদৃত। তিনি বললেন বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্—রসাত্মক বাক্যই কাব্য। অনেকদিন ধ'রে তাঁর এই মতটি সাহিত্য পাঠক ও সমালোচকের কাছে সমাদৃত হয়েছে। আচার্য ভামহ তাঁর 'কাব্যালংকার' গ্রন্থে শব্দ ও অর্থের মিলনকে কাব্য বলেছেন। তিনি বললেন—'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্।' আচার্য ভামহের মতে কাব্যে অলংকারই সবচেয়ে বড়ো ব্যাপার। তাঁর মতে, রসও এক ধরনের অলংকার। 'কাব্যাদর্শ' প্রণেতা আচার্য দণ্ডীও অলংকারের প্রাধান্যকে স্বীকার করেছেন। আচার্য বামন তাঁর 'কাব্যালংকার সূত্রে' অলংকারকে বর্হিভূষণ ব'লে—রীতিকে কাব্যের আত্মা বললেন। তাঁর মতে—রীতিরাত্মা কাব্যস্য। বিশিষ্টা পদরচনা রীতিঃ। বিশেষো গুণাত্মা। আচায কুন্তক তার 'বক্রোক্তি জীবিত' গ্রন্থে বক্রোক্তিকেই কাব্যের প্রাণ বলে ঘোষণা করেছেন। ধ্বনিবাদীরা বললেন—কাব্যের আত্মা ধ্বনি--কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিরিতি। এই মতে অলংকার, রীতি, বক্রোক্তি প্রভৃতি যা কিছু আছে তাদের অতিরিক্ত ধ্বনিকেই কাব্যের প্রাণ বলা হলো। ধ্বনিবাদীদের মতে এই ধ্বনিই রস—এই ধ্বনিই কাব্যের প্রাণ।

ধ্বনি কি ঃ

ধ্বনিবাদের প্রথম পথিকৃৎ কে তা নিয়ে এখনও কেউ কিছু স্থির ক'রে বলতে পারেননি। ধ্বন্যালোককেই প্রথম রচনার সম্মান দেওয়া হয়।

ধ্বন্যালোকে—(১) কারিকা (২) বৃত্তি ও (৩) লোচন (টীকা) এই তিনটি বিষয় আছে। কারিকার রচয়িতা কে তা জানা যায়নি ; বৃত্তি আনন্দবর্ধনের নামে প্রচলিত ; আর লোচন বলে যে টীকা অংশ আছে—তার রচয়িতা অভিনব গুপ্ত। ধ্বনিবাদীরা বললেন, কাব্যস্যাত্মাধ্বনিঃ—ধ্বনিই কাব্যের আত্মা। এঁরা রসকে অস্বীকার করেননি—রস ও ধ্বনির মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্যও দেখাননি। তাঁদের মতে রসই ধ্বনি এবং রসধ্বনিই শ্রেষ্ঠ ধ্বনি।

ধ্বনির স্বরূপ বুঝতে হ'লে শব্দ ও অর্থ বলতে কি বোঝায় তাই প্রথমে আমাদের জানা দরকার। শব্দ এবং অর্থ পরস্পর অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। এদের একটিকে ছেড়ে অন্যটির কথা ভাবা যায় না। শব্দ ও অর্থের সার্থক মিলনেই কাব্য রূপলাভ করে। প্রধানত শব্দের দুইটি শক্তি কে স্বীকার করা হয়—একটি, শব্দের অভিধা শক্তি—অন্যটি, লক্ষণা শক্তি।

যে শক্তির দ্বারা শব্দের মুখ্যার্থ প্রকাশ পায়-তাকে শব্দের অভিধা শক্তি বলে। শব্দের মুখ্য অর্থটিকে বাচ্যার্থও বলা হয়। 'বাঘ' বললে বাঘ নামক জীবকেই বোঝায়। সোজাসুজি যে মানেটা হচ্ছে তা শব্দের অভিধা শক্তির দ্বারাই পাচ্ছি। অন্যদিকে যে শক্তির দ্বারা শব্দ মুখ্যার্থের পরিবর্তে গৌণ অর্থটি প্রকাশ করে—তখন শব্দের সেই শক্তিকে লক্ষণা শক্তি বলা হয়। এই শক্তির দ্বারা যে অর্থ প্রকাশ পায়—তাকে লক্ষ্যার্থ বলা হয়। 'তুমি পানিনি পড়েছো ?'—'আমি কালিদাস, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ পড়েছি।' এখানে পানিনি, কালিদাস, বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ বলতে তাঁদের রচিত সাহিত্যের কথাই বলা হয়েছে। উক্ত নামগুলির মুখ্যার্থ বক্তার অভিপ্রেত নয়—তাঁর বক্তব্যের গৌণ অর্থই গ্রহণ করতে হবে।

উল্লিখিত দুইটি শক্তি ছাড়া কেউ কেউ শব্দের তাৎপর্য শক্তির উল্লেখও করেছেন। শব্দের যে শক্তির দ্বারা প্রত্যেকটি মুখ্যার্থবোধক শব্দের সমন্বয়ে একটি বাক্যের সামগ্রিক অর্থ—ভাবে প্রকাশিত হয় সেই শক্তিকে শব্দের তাৎপর্য শক্তি এবং সেই বাক্যের সামগ্রিক অর্থকে তাৎপর্যার্থ বলা হয়। কিন্তু ধ্বনিবাদীরা বলেন—শব্দের ঐ শক্তিগুলির দ্বারা বাক্য রসরূপ অর্থাৎ কাব্যরূপ লাভ করতে পারে না। কাব্যসৃষ্টির ব্যাপারে এই তিন শক্তির বাইরে অতিরিক্ত আর একটি শক্তিও আছে। এই শক্তি একমাত্র সহৃদয় সামাজিকের অন্তরেই প্রতীয়মান হয়। শব্দের এই শক্তিকে বলা হয় ব্যঞ্জনা শক্তি এবং তার দ্বারা যে অর্থ প্রকাশ পায় তাকে ব্যঙ্গার্থ বা প্রতীয়মান অর্থ বলে। এই ব্যঙ্গার্থই ধ্বনিবাদীদের শেষ কথা।

ব্যঙ্গ্যার্থ কি ?

ব্যঙ্গ্যার্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ধ্বনিকার বলেন—

প্রতীয়মানং পুনরণ্যদেব
বস্ত্বস্তি বাণীষু মহাকবীনান্।
যত্তৎ প্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং
বিভাতি লাবণ্যম ইবাঙ্গনাসু। (ধ্বন্যালোক)

অর্থাৎ নারীদের লাবণ্যের মতো মহাকবিদের বাণীতে প্রতীয়মান অর্থ নামে আর একটি ব্যাপার থাকে; যা তাদের প্রসিদ্ধ অবয়বের অতিরিক্ত অন্য কিছু।

শব্দের অভিধাশক্তি ও লক্ষণা শক্তির দ্বারা যে অর্থ বোধ জন্মে তার ব্যঞ্জনা শক্তি বা ব্যঙ্গ্যার্থকেই ধ্বনিবাদীরা বলেন ধ্বনি। তাঁদের মতে—

যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থম্ উপসর্জনীকৃত-স্বার্থৌ।
ব্যঙ্‌ক্তঃ কাব্য বিশেষঃ স ধ্বনিরিতি সূরিভিঃ কথিতঃ॥ (ধ্বন্যালোক)

অর্থাৎ যেখানে কাব্যের অর্থ বা শব্দ নিজেদের অপ্রধান ক'রে প্রতীয়মান অর্থকে ব্যঞ্জিত করে, সেখানে সেই ব্যঙ্গ্যার্থ বা প্রতীয়মান অর্থরূপ কাব্যবিশেষকেই পণ্ডিতগণ ধ্বনি বলে অভিহিত করেন। ধ্বনিবাদীরা এই ধ্বনিকেই কাব্যের আত্ম. বলেছেন—তাঁদের মতে কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিরিতি।

ধ্বনিই যে কাব্যের প্রাণ—এ কথা অনেকে মেনে নিতে দ্বিধা করেছেন—অনেকে এই মতকে অস্বীকারও করেছেন। অনেকের মতে যখন শব্দের লক্ষণাশক্তির মধ্যেই ধ্বনি আছে—সেখানে আবার ধ্বনির পৃথক অস্তিত্ব স্বীকারের কোনো তাৎপর্য নেই। এই সব মত খণ্ডন করে ধ্বনিবাদীরা যুক্তি দিয়ে দেখিয়ে দিলেন—ধ্বনির পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হবে। তাঁদের মতে বাচ্যার্থকে অবলম্বন করেই ধ্বনি গ'ড়ে ওঠে বটে—কিন্তু বাচ্যার্থেই তার পরিচয় নয়—ধ্বনি বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে। প্রতীয়মান অর্থের উদাহরণ স্বরূপ আনন্দবর্ধন একটি প্রাকৃত শ্লোক উল্লেখ করেছেন। তার বাংলা অনুবাদ এই দাঁড়ায়।

হে-ধার্মিকপ্রবর! তুমি এখন নিশ্চিন্ত হয়ে ভ্রমণ করতে পার। কারণ সেই কুকুরটি গোদাবরী তীরস্থিত লতাকুঞ্জ-বাসী দৃপ্ত সিংহের দ্বারা নিহত হয়েছে।

এখানে 'ভ্রমণ করতে পার' কথাটি বাচ্যার্থ অতিক্রম করে 'ভ্রমণ কোরনা —এই প্রতীয়মান অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থের মধ্যে একটি

পার্থক্য রয়েছে। লক্ষ্যার্থ বাচ্যার্থের অতিরিক্ত বটে—কিন্তু ব্যঙ্গ্যার্থ মুখ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থের অতিরিক্ত অন্য কিছু।

যাঁরা বলেন অলংকারের দ্বারাই কাব্যের সৌন্দর্য প্রকাশ পায়—যাঁদের মতে 'কাব্যম্ গ্রাহ্যম্ অলংকারাৎ'—অতএব ধ্বনির পৃথক অস্তিত্বের সার্থকতা নেই—তাঁদের মত খণ্ডন করতে গিয়ে ধ্বনিবাদীরা বলেন, 'ব্যঙ্গ্য-প্রাধান্যে হি ধ্বনিঃ। ন চৈতৎ সমাসোক্ত্যাদিষু অস্তি।' অর্থাৎ ব্যঙ্গ্যের প্রাধান্যেই ধ্বনি হয়—অলংকারে তাঁকে পাওয়া যায় না। অলংকার অঙ্গের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে—কিন্তু অঙ্গের লাবণ্য বৃদ্ধি করতে পারে না—একমাত্র ধ্বনিতেই তাকে পাওয়া যায়। ধ্বনিই অঙ্গী—অলংকার, রীতি, বক্রোক্তি প্রভৃতি তার অঙ্গ। ধ্বনি ও অলংকারে, পার্থক্য এই যে—ধ্বনি বাচ্যাতিরিক্ত, কিন্তু অলংকার বাক্যের গণ্ডীতে আবদ্ধ। বাচ্যালংকারে শব্দ ও অর্থ কখনও গৌণ নয়—কিন্তু ধ্বনিতে মুখ্য শব্দ ও অর্থ গৌণ হয়ে অন্য একটি অতিরিক্ত অর্থকে প্রকাশ করে। এই ধ্বনি সহৃদয় পাঠকের আহ্লাদের কারণস্বরূপ হয়। দেহের লাবণ্যের গৌরবকে আমরা নিঃসংশয়ে স্বীকার করি—এর ওপর অলংকারে বিভূষিত হ'লে সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু অলংকার ছাড়াও দেহ-লাবণ্যের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। ধ্বনিবাদীরা শব্দের অভিধা ও লক্ষণাশক্তিকে বাদ দিয়ে শব্দের ব্যঞ্জনা শক্তিকে গ্রহণ করেছেন। ব্যঙ্গ্যার্থ কারও অধীন নয়। অলংকার, গুণ প্রভৃতি বাচ্যার্থের দ্বারাই ধ্বনির প্রকাশ ঘটে। কাজেই বাচ্যার্থকেও উপেক্ষা করলে চলবেনা। ধ্বন্যালোকের মতে, আলোকার্থী যেমন দীপশিখার প্রতি যত্নবান হ'লেই আলো পেতে পারেন তেমনই যিনি ব্যঙ্গ্যার্থ চান—তাঁকেও বাচ্যার্থের প্রতি যত্নবান হতে হবে।

ধ্বনিবাদীরা ব্যাকরণ থেকেই ধ্বনি শব্দটি গ্রহণ করেছেন। বৈয়াকরণদের মতে শব্দের প্রথম বর্ণের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তার অর্থবোধ সম্ভব নয়। শব্দের অন্ত্যবর্ণ উচ্চারণ করার পর অর্থ প্রকাশ পায়। এই অন্ত্যবর্ণই, তাঁদের মতে ধ্বনি। অন্ত্যবর্ণে যে ধ্বনি আমরা শুনি, তার দ্বারা শব্দের অর্থপ্রতীতি জন্মে। 'শ্রোত্রে অনুভূত পদই স্ফোট। স্ফোট সাক্ষাৎভাবে অর্থের প্রতীতি জন্মায়, অতএব প্রধানীভূত। এই প্রধানীভূত স্ফোটের ব্যঞ্জক হইল 'ধ্বনি' বা 'চরমবর্ণাত্মক শব্দ।'

'ব্যাকরণ শাস্ত্রের মতে চরম বর্ণাত্মক শব্দরূপে ধ্বনি যেমন প্রধানীভূত

স্ফোটকে বুঝায়, সেইরূপ আলংকারিকদের মতে বাচ্যার্থ-ধ্বনি কাব্যের প্রধানীভূত ব্যঙ্গ্যার্থকে বুঝায়।' (কাব্যালোক)

ধ্বনির প্রকার ভেদঃ

ধ্বনিবাদীরা ধ্বনিকে দুইভাগে বিভক্ত করেন—(১) অবিবক্ষিত বাচ্য এবং (২) বিবক্ষিতান্যপর বাচ্য। যে বাক্যের বাচ্যার্থ বক্তার একেবারেই অভিপ্রেত নয়, ব্যঙ্গ্যার্থই যার প্রকৃত অর্থ—তাকে অবিবক্ষিত বাচ্য বলে। যেমন,

'হৃদয়ে মোর রইল আঁকা তোমার ছবি'

এখানে 'ছবির' কথা বলা হয়েছে তা কখনও হৃদয়ে, আঁকা থাকতে পারে না। এখানে বাচ্যার্থ অতিক্রম করে যে অর্থটি প্রকাশ পাচ্ছে তাই ব্যঙ্গ্যার্থ।

এই অবিবক্ষিত বাচ্যও আবার দুই ধরণের—(ক) অর্থান্তরে-সংক্রামিত বাচ্যধ্বনি, এবং (খ) অত্যন্ত-তিরস্কৃত বাচ্যধ্বনি।

(১) যেখানে বাচ্যার্থ নিজ অর্থ না বুঝিয়ে অন্য অর্থ বোঝায়, সেখানে অর্থান্তরে-সংক্রমিত বাচ্যধ্বনি হয়। যেমন 'আমি বলি, তোমার সেখানে যাওয়াই ভালো।' এখানে 'বলি' অর্থে আমার মতে বা আমি উপদেশ দিই।'

যেখানে বাচ্যার্থ নিজ অর্থকে অত্যন্ত তিরস্কৃত (দুরীভূত) ক'রে অর্থাৎ পরিত্যাগ ক'রে একেবারে বিপরীত অর্থ বুঝায় সেখানে অত্যন্ত-তিরস্কৃত বাচ্যধ্বনি হয়। যেমন, 'অন্ধ আমি অন্তরে বাহিরে' (ধৃতরাষ্ট্রের উক্তি-গান্ধারীর আবেদন)—এখানে বাইরের অন্ধতার মানে বুঝি—ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিলেন। কিন্তু অন্তরের অন্ধতা অর্থে 'স্নেহের আতিশয্যে বিচার শক্তি হীন' এই অর্থ ই বোঝাচ্ছে। 'কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে, হে প্রচেতঃ', (মেঘনাদবধ)—এখানেও বক্তার অভিপ্রেত বক্তব্যটি বাচ্যার্থে প্রকাশ পাচ্ছেনা—'সুন্দর' কথাটি ব্যঙ্গ ক'রে অসুন্দর অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে।

(২) বক্তার অভিপ্রেত হ'য়েও বাচ্যার্থ যখন অন্য একটি অর্থকে প্রকাশ করে তখন বিবক্ষিতান্যপর বাচ্যধ্বনি হয়। রসধ্বনি এই বিবক্ষিতান্যপর বাচ্যের অন্তর্ভুক্ত। বিবক্ষিতান্যপর বাচ্যধ্বনিও দুই ধরনের—(ক) সংলক্ষ্যক্রম ধ্বনি এবং (খ) অসংলক্ষ্যক্রম ধ্বনি।

(ক) যেখানে বাচ্যার্থ থেকে ব্যঙ্গ্যার্থের বোধের ক্রম সম্যক্‌ভাবে জানা যায়—যেখানে সংলক্ষ্যক্রম ধ্বনি হয়। এখানে বাচ্যার্থ থেকে ধ্বনির ক্রম-প্রকাশের পূর্বাপর সম্বন্ধটি লক্ষ্য করা যায়। 'কুমার সম্ভবম্' কাব্যের একটি শ্লোককে আনন্দবর্ধন সংলক্ষ্যক্রম ধ্বনির উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করেছেন। যেমন,

এবং বাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী।
লীলাকমল পত্রানি গণয়ামাস পার্বতী ॥

'দেবর্ষি এই (পার্বতীর বিবাহের কথা) বললে পিতার পার্শ্বে উপবিষ্টা অধোমুখী পার্বতী লীলাকমলের পত্রগুলি গণনা করতে লাগলেন।'

এখানে লীলাকমলের গণনার দ্বারা পার্বতীর লজ্জার ভাব ব্যঞ্জিত হচ্ছে। আচার্য সুধীরকুমার দাশগুপ্ত কর্তৃক উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা'র একটি সংলক্ষ্যক্রম ধ্বনির উদাহরণ এই—

সুদূর গগনে কাহারে সে চায়,
ঘাট ছেড়ে ঘট কোথা ভেসে যায়,
নবমালতীর কচি দলগুলি
আনমনে কাটে দশনে। (নববর্ষা)

এখানে বাচ্যার্থ সুস্পষ্ট—কিন্তু আনমনা বিরহিনী বধূর মনোভাবটি ব্যঞ্জিত হচ্ছে। সংলক্ষ্যক্রম ধ্বনিও আবার দুইভাগে বিভক্ত—(১) বস্তুধ্বনি (২) অলংকার ধ্বনি।

যেখানে ব্যঞ্জনার দ্বারা বাচ্যাতিরিক্ত বস্তু বাচ্য থেকেও প্রধান ভাবে ব্যঞ্জিত হয় সেখানে বস্তুধ্বনি হয়। বাচ্যার্থ থেকে ব্যঙ্গ্যার্থ প্রধান না হ'লে বস্তুধ্বনি হয়না। 'ঘাট ছেড়ে ঘট কোথা ভেসে যায়'—বস্তুধ্বনির সার্থক উদাহরণ।

প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল,
আত্মবিস্মৃতিতে, হায়, অকস্মাৎ সতী
মুছিলা সিন্দুর বিন্দু সুন্দর ললাটে।

এখানে প্রমীলার বৈধব্য এবং মেঘনাদ বধের ইঙ্গিত রয়েছে।

বক্তব্য বিষয় বা অলংকার যখন নিজেদের গৌণ করে অলংকারান্তরের ব্যঞ্জনা ঘটায় তখন অলংকার ধ্বনি হয়। যেমন,

হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুকায়ব
কো দূর করব পিয়াসা॥
চন্দন তরু যব সৌরভ ছোড়ব,
শশধর বরিখব আগি।
চিন্তামণি যব নিজগুণ ছোড়ব
কি মোর করম অভাগী॥

এখানে ধ্বনির অলংকারটি অতিশয়োক্তি—কিন্তু বাচ্যার্থও অস্পষ্ট নয়।

দেখ আসি সুখে
রোহিনী গঞ্জিনী বধূ, পুত্র যার রূপে
শশাঙ্ক কলঙ্কী মানে।

এখানে অলংকার ব্যতিরেক, বাচ্যার্থও অস্পষ্ট নয়।

(খ) যেখানে বাচ্যার্থ থেকে ব্যঙ্গ্যার্থ কিভাবে প্রকাশ পায়—তার ক্রম লক্ষ্য করা যায় না—বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ যুগপৎ প্রকাশিত মনে হয়—সেখানে অসংলক্ষ্যক্রম ধ্বনি হয়। এখানে ক্রম যে একেবারে থাকে না তা নয়—কিন্তু এত সূক্ষ্ম ও দ্রুত যে—ক্রমটি আমরা কিছুতেই বুঝতে পারি না। এই কারণে এই অসংলক্ষ্যক্রম ধ্বনিকে অক্রমধ্বনিও বলা হয়। এই ধ্বনিই শ্রেষ্ঠ ধ্বনি। এখানে বাচ্যার্থ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যঙ্গ্যার্থের বোধ জন্মে। বিভাবের কথা যখন বলা হচ্ছে—তখনই ব্যঞ্জিত হচ্ছে—সঞ্চারী ভাব। অথবা, সঞ্চারী ভাবের উপস্থাপনার সঙ্গে সঙ্গেই স্থায়ীভাব ব্যঞ্জিত হয়। প্রায় সব রসাত্মক বাক্যকেই অসংলক্ষ্য ক্রমধ্বনির সার্থক উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করা যায়।

অসংলক্ষ্য ক্রমধ্বনিও দুইভাগে বিভক্ত—(১) ভাবধ্বনি (২) রসধ্বনি।

যেখানে সঞ্চারীভাব প্রাধান্য লাভ ক'রে চমৎকারিত্ব প্রাপ্ত হয়, সেখানে হয় ভাবধ্বনি। এর প্রতীয়মান অর্থটি সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব থেকেই প্রকাশ পায়। যেমন,

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চায়।

এখানে স্থায়ীভাব রতি—কিন্তু উৎকণ্ঠা, আবেগ প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাবের দ্বারাই তার প্রকাশ ঘটেছে।

যেখানে বাচ্যার্থ থেকে একেবারে ব্যঙ্গ্যার্থ-বোধ জন্মে সেইখানে রসধ্বনি হয়। ব্যঙ্গ্যার্থ এখানে অলক্ষ্যক্রম হয়ে রসকে প্রকাশ করে। ধ্বনিকারের মতে, আনন্দময় বর্ণনার দ্বারা যার আস্বাদ লাভ করা যায়—তাকে রস বলে। এই রসই ধ্বনি এবং এই রসই কাব্যের প্রাণ। বিভাব, ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাবের রসযোগে স্থায়ীভাবের যে বোধ জন্মে তাকেই বলে রস। আচার্য অভিনব গুপ্তের মতে—

নহি তচ্ছূণ্যং কাব্যং কিংচিদস্তি। (ধ্বন্যালোক)
তাহা শূন্য (অর্থাৎ রসশূন্য) কোনো কাব্য নাই।

এবং, এই সঙ্গে কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিরিতি—কাব্যের আত্মাই ধ্বনি।

কবি যখন বলেন—

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ান তারা।
বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা॥ ইত্যাদি

তখন তাঁর রচনায় স্থায়ীভাব (রতি)—বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারী ভাবের যোগেই প্রকাশিত হয়েছে তা আমরা বুঝতে পারি। অথবা,

পথ বেঁধে দিল বন্ধন হীন গ্রন্থি,
আমরা দুজন চল্‌তি হাওয়ার পন্থী।
রঙিন নিমেষ ধূলার দুলাল
পরাণে ছড়ায় আবীর গুলাল,
ওড়্‌না ওড়ায় বর্ষার মেঘে দিগঙ্গনার নৃত্য,
হঠাৎ আলোর ঝল্‌কানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত।

এখানেও কয়েকটি উদ্দীপন বিভাবের আপাত-প্রকাশের দ্বারা শৃঙ্গার রসের ভাবটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

আমরা আগেই বলেছি যে ধ্বনিবাদীরা ধ্বনিকে প্রাধান্য দিলেও রসকে উপেক্ষা করেন নি। রস তাঁদের অনভিপ্রেত নয়। ধ্বন্যালোকে বলা হচ্ছে—'রসাদয়ো হি দ্বয়রোপি তয়োর্জীবভূতাঃ'—অর্থাৎ রসাদি এই দু'য়েরই (নাট্য ও কাব্য) জীবভূত, এবং সেই কারণেই 'তেন রস এব বস্তুত আত্মাবস্তুলংকার ধ্বনী.তু সর্বথা রসং প্রতি পর্যবস্যেতে'—অর্থাৎ তাই রস—বস্তুত-আত্মা.—বস্তু ও অলংকার ধ্বনি সবদিক থেকেই রসে পর্যবসিত হয়।

ধ্বনিবাদীদের দ্বারা সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগঃ

ধ্বনিবাদীরা সাহিত্যকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন—(১) ব্যঙ্গ্য (২) গুণীভূত ব্যঙ্গ্য (৩) চিত্র।

ব্যঙ্গ্য রচনার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। সেখানে দেখেছি যে, প্রতীয়মান অর্থ ই প্রাধান্য লাভ করে। যেখানে এই প্রতীয়মান অর্থ প্রাধান্য লাভ করে না—সেখানে হয় গুণীভূত ব্যঙ্গ্য। বস্তু, অলংকার ও রস—এই তিনটির মধ্যেই প্রতীয়মান অর্থ গুণীভূত ভাবে অর্থাৎ গৌণভাবে থাকতে পারে। রচনার মধ্যে প্রতীয়মান অর্থ যদি গৌণভাবে থাকে তাহলে গুণীভূত ব্যঙ্গ হবে। এমন অনেক রচনা আছে যেখানে ধ্বনিটি গৌণ—অথচ সহৃদয় পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করতে পারে। গুণীভূত ব্যঙ্গ্যের দ্বারা রূপক, নিদর্শনা, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলংকার সার্থকভাবে বিধৃত। যেমন,

অকলঙ্ক হইতে শশাঙ্ক আশা লয়ে।
পদতলে রহিয়াছে দশরূপ হয়ে॥

এখানে বাচ্যার্থে অতিশয়োক্তি হয়েছে—কিন্তু ব্যঞ্জনা ধ্বনি হ'য়ে উঠতে পারেনি।

ধ্বনিবাদীরা চিত্রকে কাব্য বলে স্বীকার করেন নি। যে রচনা ব্যঙ্গ্যার্থকে প্রকাশ করতে সক্ষম নয়—যা শুধু বক্তব্য বিষয়ের বৈচিত্র্যকে অবলম্বন ক'রে প্রকাশিত হয় তাই চিত্র। চিত্র-কাব্যের প্রতি ধ্বনিবাদীরা বিরূপ ছিলেন। কারণ তাঁদের মতে যাঁরা রসসৃষ্টির দিকে মনোযোগ না দিয়ে কেবল অলংকার-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে থাকেন, অথবা সচেতন ভাবে নীতিবাক্য প্রয়োগ করতে থাকেন—তাঁদের রচনা রসরূপ লাভ না ক'রে চিত্ররূপ লাভ করে। যেমন,

চির সুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে।
কি যাতনা-বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।

এখানে কাব্যরস কোথায়!

রস ও ভাব কি:

রসকে অবলম্বন করেই ধ্বনিবাদীরা ধ্বনিকে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন। রস সে কাব্যের আত্মা এই কথা আচার্য ভরত থেকেই প্রচলিত। তাঁর দেওয়া সূত্র অবলম্বন ক'রে পরবর্তী কালে আলংকারিকেরা রসের ব্যাখ্যা করতে শুরু করেন। আচার্য ভরতের সূত্রটি এই—'বিভাবানুভাব-ব্যভিচারি সংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ'—অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে রসনিষ্পত্তি হয়। এই সূত্র অবলম্বন ক'রে—ভট্ট লোল্লট, ভট্ট শঙ্কুক, ভট্ট নায়ক, আচার্য অভিনব গুপ্ত প্রভৃতি রসের আলোচনায় মনোনিবেশ করেন। ভট্ট লোল্লটের মতকে উৎপত্তিবাদ বলা হয়। তিনি 'রসনিষ্পত্তি' অর্থে রস উৎপন্ন হয় ব'লে মনে করেন। অভিজ্ঞান শকুন্তলম্-এর, দৃষ্টান্ত দেখিয়ে তিনি বলেন যে বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে দুষ্মন্তের হৃদয়ে রতি ভাবের উৎপত্তি হয়। আচার্য লোল্লট ভাবে ও রসে কোনো পার্থক্য না দেখিয়ে রতিভাবের উৎপত্তিকেই রতি বা শৃঙ্গার রস বলে কল্পনা করেছেন। তাঁর মতে অভিনয় কালে দর্শকের মনে নাটকের চরিত্র ও নটনটীর চরিত্রাভিনয়ে একটি অভেদ-বোধ জন্মে। এই অভেদ সাময়িক এবং এর কোনো বাস্তব সত্বা নেই। ভট্ট লোল্লটের মত ন্যায়-দর্শনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ভট্ট শঙ্কুক ন্যায়-দর্শনের মতানুসারে রসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, সামাজিক হৃদয়ই কাব্য-নাটকের রসাস্বাদ করেন। অভিনয়কালে দর্শকরা অভিনেতাদের মধ্যে নাটকের চরিত্রকে অনুমান করেন। এই অনুমান সত্যও নয়—আবার মিথ্যাও নয়। এ শুধু অনুমান—তাছাড়া আর কিছুই নয়। ভট্টশঙ্কুকের এই মতকে অনুমিতিবাদ বলে।

ভট্ট নায়ক সাংখ্যদর্শনের মতানুসারে রসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন—রসের উৎপত্তিও ঘটেনা—তা অনুমিতও হয় না—শুধু ভুক্ত হয়। কাব্যের রস-

নিষ্পত্তির ব্যাপারে তিনি ভাবকত্ব ও ভোজকত্বের ওপরে বিশেষ জোর দিয়েছেন ভাবনা যত কবির—আর তাকে গ্রহণ করার দায়িত্ব সহৃদয় সামাজিকের। কবির ভাবনার ফল ভোগ করেন—শ্রোতা বা দর্শক। ভট্ট নায়কের এই মতবাদকে ভুক্তিবাদ বলে। ভুক্তিবাদে যে ভোগীকরণের কথা বলা হয়েছে—তা সহৃদয় সামাজিকের রসচর্বনাব্যাপার। এর পরে ভট্টনায়কের বক্তব্যের দুর্বলতা নিরসন করবার প্রয়াস আচার্য অভিনবগুপ্তের মতবাদে পাওয়া যায়। এই মতবাদকে অভিব্যক্তিবাদ বলা হয়। তাঁর মতে সামাজিকের হৃদয়ে রতিবোধ প্রভৃতি আগে থেকেই আছে। অভিনয় দেখার সময় সামাজিক হৃদয়ের কামনা-বাসনা আলোড়িত হতে থাকে এবং স্থায়ীভাব থেকে তা রসরূপ লাভ করে। আগে থেকেই রতি প্রভৃতি ভাব দর্শকের হৃদয়ে না থাকলে আনন্দবোধ তথা রসবোধ জন্মেনা। অভিনবগুপ্ত ধ্বনিবাদের উপর ভিত্তি ক'রে রস বিচার করেন। আচার্য মম্মট ভট্ট তাঁর 'কাব্যপ্রকাশ' গ্রন্থে রসবাদকে আরও সূক্ষ্ম ভাবে বিশ্লেষণ করে সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলেন। সাহিত্যদর্পণকার আচার্য বিশ্বনাথের 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'—ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রে রস সম্বন্ধে চরম কথা। তাঁর মতে রস অখণ্ড, 'স্বপ্রকাশানন্দ চিন্ময়ঃ'—তা 'বেদ্যান্তর স্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরঃ'--তা 'লোকোত্তর-চমৎকারপ্রাণঃ'।

যে রস নিয়ে ভারতীয় রসবেত্তারা এত আলোচনা করেছেন—সেই রস কি? রসাস্বাদ কাকে বলে?

স্থূলভাবে রস বলতে কোনো এক রকমের আস্বাদনকে বোঝায়। আমরা যা থেকে আস্বাদ লাভ করি তাই রস। খাদ্য বস্তুর রসাস্বাদনে দেখতে পাই কোনোটি মিষ্টি, কোনোটি তেতো, কোনোটি বা অম্ল। সাহিত্যের রসও এই ধরনের আস্বাদন। তবে খাওয়ার রসাস্বাদ আর সাহিত্যের রসাস্বাদ এক নয়। বস্তুর আস্বাদ গ্রহণ বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের ওপর অনেকখানি নির্ভর করে। কিন্তু সাহিত্যের রস আস্বাদনের জন্যে সহৃদয় সামাজিকের চিত্তই একমাত্র উপায়। সাহিত্যের রসাস্বাদ—ব্রহ্মের আস্বাদের মতো। তাই আলংকারিকদের মতে সাহিত্যের রসাস্বাদ অলৌকিক। এই রস আস্বাদন করে যে আনন্দ পাওয়া যায় তাও অলৌকিক। আচার্য অভিনবগুপ্ত বলেন, 'শব্দ সমর্প্যমান-হৃদয়সংবাদ-সুন্দর-বিভাবানুভাব-সমুদিত প্রাঙ্‌নিবিষ্ট রত্যাদিবাসনানুরাগ-সুকুমার-স্বসংবিদানন্দঃ-চর্বনাব্যাপার-রসনীয়রূপো রসঃ'—

অর্থাৎ, 'শব্দে সমর্পিত হইলে এবং হৃদয়ের সংবাদ অর্থাৎ একরূপতা দ্বারা

সুন্দর হইলে সামাজিকের চিত্তে বিভাব ও অনুভাব হইতে সমুদিত হয় পূর্বে নিবিষ্ট রতি প্রভৃতি বাসনা। সেই বাসনার অনুরাগ-দ্বারা সুকুমার হইলে স্ব-সংবিদানন্দের চর্বণ-ব্যাপারের যে রসণীয় বা আস্বাদনীয় রূপ—তাহাই হইতেছে রস। [আচার্য সুধীর কুমার দাসগুপ্তের অনুবাদ—কাব্যালোক]

এই রস উৎপন্ন হয়—না অনুমিত হয়, না ভুক্ত বা অভিব্যক্ত হয়—তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত আছে। রস গ'ড়ে ওঠার মূলে স্থায়ীভাব, বিভাব, অনুভাব, ব্যাভিচারী বা সঞ্চারীভাব প্রভৃতি উপাদান স্বরূপ থাকে। ভাব ছাড়া রস হয় না। আচার্য ভরত তাই বলেছেন—'ন ভাবহীনোঽস্তি রসো ন ভাবো রস-বর্জিতঃ'—অর্থাৎ ভাব ছাড়া রস নেই—রস ছাড়া ভাব নেই। ভাব বলতে এক প্রকার হৃদয়ানুভূতিকে বোঝায়, যা লৌকিক ক্ষেত্রে বস্তু বা ঘটনার দ্বারা আমাদের হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করে। ইংরাজি Emotion কথাটি ভাব অর্থে প্রয়োগ-করা যায়। প্রাচীন ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রে ভাবের বিশদ আলোচনা রয়েছে।

স্থায়ীভাব ঃ

মানুষের হৃদয়ে নানারকম ভাবের উদয় হয়। কখনও সে আনন্দে উল্লসিত, কখনও সে শোকে মুহ্যমান, কখনও ক্রুদ্ধ, কখনও ক্ষুব্ধ, কখনও বা তীব্র ঘৃণার ভাব তার মনে দেখা দেয়। মানুষের ভাবেরও যেমন পরিবর্তন ঘটে, তেমনই আবার নতুন ভাবের আবির্ভাবও ঘঠে। আবার এমনও দেখা যায় যে, পূর্ব সংস্কারবশত কতকগুলি ভাব মানুষের মধ্যে থেকে যায়। তাই অনেক ভাবের আবির্ভাব ঘটলেও কিছু কিছু ভাব মানুষের মনে নিত্যকালের জন্যে বাসা বাঁধে। এই ধরনের ভাবগুলিকে আলংকারিকেরা স্থায়ীভাব বলেন। স্থায়ীভাব সম্বন্ধে আচার্য ভরতের বক্তব্যটির অনুবাদ করলে এই দাঁড়ায়—অনেক লোক পরিবৃত হলেও রাজা যেমন একাই রাজা নাম লাভ করেন—কারণ তিনিই সুমহান পুরুষ—সে রকম বিভাব অনুভাব ব্যভিচারী ভাব পরিবৃত হয়ে স্থায়ীভাবও রস নাম লাভ করে। আচার্য বিশ্বনাথ বলেন—

অবিরুদ্ধা বিরুদ্ধা বা যং তিরোধা তুমাক্ষমাঃ।
আস্বাদাঙ্কুর-কন্দহসৌ ভাবঃ স্থায়িতি সম্মতঃ॥ (সাহিত্যদর্পণ)

অরিরুদ্ধ বা বিরুদ্ধ ভাবগুলি যাকে তিরোহিত করতে পারেনা—যা আস্বাদরূপ কন্দ ও মূলের মতো—তাই স্থায়ী ভাব বলে পরিচিত হয়।

নানা ভাব থাকা সত্ত্বেও স্থায়ীভাবই—ভাবের গুরু। আচার্য ভারত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে আটটি স্থায়ী ভাবের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন—

রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেতি স্থায়িভাবাঃ প্রকীর্তিতা॥ (নাট্যশাস্ত্র)

অর্থাৎ রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময়—এই আটটি স্থায়ী ভাব ব'লে ঘোষিত।

সাহিত্যদর্পণকারের মতে স্থায়ীভাব নয়টি—

রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেত্যষ্টৌ প্রোক্তাঃ শমোহপিচ॥ (সাহিত্যদর্পণ)

আচার্য ভরত-উক্ত আটটি স্থায়ীভাবের সঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ শম-ও যোগ করে দিলেন। আচার্য ভরত-উক্ত ভাব-সংযোগে যে আটটি রস পরিণতি লাভ করে—তা এই—

শৃঙ্গার-হাস্য-করুণা-রৌদ্র-বীর-ভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ॥ (নাট্যশাস্ত্র)

শৃঙ্গার, হাস্য, করুণা রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত— এই আটটির সঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ শমভাব-জনিত শান্ত রসও যোগ করে দিলেন। পরের দিকে রস যখন দর্শনের পর্যায়ে এসে পড়ে—তখন থেকে ভক্তিবাদ ইত্যাদির প্রভাব হেতু এই শান্তরস রস-পর্যায় ভুক্ত হয়।

রসের মূল উপাদান স্থায়ীভাব হলেও বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারী ভাব সংযোগেই রস-নিষ্পত্তি সম্ভব।

বিভাব ঃ

বস্তু জগতের প্রত্যক্ষ অনুভূতি বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারাই সম্ভব। বাইরের বস্তুর সংস্পর্শে বা সংযোগে আমাদের মধ্যে নানারকম অনুভূতি জেগে ওঠে। যদি কারও মৃত্যু ঘটে—আমরা শোকার্ত হই। দুর্জন দেখলে ঘৃণা করি, ফুল দেখলে সুখী হই। মনেব এই ভাবগুলি বাইরের বস্তু। এই ধরনের শোক, ঘৃণা, আনন্দ প্রভৃতির কারণ সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রকাশ পেলে তাকে বিভাব বলা হয়। তবে বাইরের জগতে স্থূল বিষয়গুলি অনুভবের কারণ হয়—ওরা স্থূল ভাবেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য—তা'রা সাহিত্যের বিষয় বস্তু হ'তে পারে না। লৌকিক জগতে যা কারণ—সাহিত্য জগতে তাই বিভাব। বিভাব দুই প্রকার—(১) আলম্বন বিভাব (২) উদ্দীপন বিভাব।

আলম্বন বিভাবঃ

যে বিষয়বস্তুকে মুখ্যভাবে অবলম্বন ক'রে রস অভিব্যক্ত হয় তাকে আলম্বন বিভাব বলে। শকুন্তলা নাটকে দুষ্মন্ত-শকুন্তলা আলম্বন বিভাব। কারণ 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের স্থায়ীভাব যে রতি তা দুষ্মন্ত-শকুন্তলাকে কেন্দ্র ক'রেই গ'ড়ে উঠেছে। চণ্ডীদাসের পূর্বরাগের একটি পদের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হলো—

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ান তারা।
বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে
যেমতি যেগিনী পারা॥

এখানে রাধিকা আলম্বন বিভাব।

উদ্দীপন বিভাবঃ

রসকে যা উদ্দীপিত করে—তাই উদ্দীপন বিভাব। আলম্বন বিভাবের দ্বারা রসের উদ্‌গম হ'তে থাকে—আর উদ্দীপন বিভাব তাকে প্রকাশ করতে থাকে। এই কারণে আলম্বন বিভাবই মুখ্য—উদ্দীপন বিভাব শুধু রসকে উদ্দীপিত করে বলেই সে গৌণ। পূর্বোক্ত আলম্বন বিভাবের উদাহরণটিতে দেখা যায় যে বিরল, মেঘ প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাব স্বরূপ রয়েছে। এখানে আর একটি উদাহরণ দেওয়া হলো—

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥

এখানে স্থায়ীভাব রতি। ভরা বাদর, মাহ ভাদর প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাব। যার বিরহে রাধার এমন অবস্থা সেই আলম্বন বিভাব কৃষ্ণ এখানে অনুল্লিখিত।

অনুভাব ঃ

আমাদের মনে কোনো ভাবের উদয় হলে বাইরে তার প্রকাশ ঘটবেই। যদি হাসির ব্যাপার হয়—তাহলে মুখে সে হাসির ভাবটি দেখা দেয়। শোকে চোখে জল এসে পড়ে, রাগে চোখ লাল হয়ে ওঠে। ভাবের এই ধরনের প্রকাশ যদি সাহিত্যে প্রযুক্ত হয় তাহলে তাকে বলা হয় অনুভাব। বিভাবের দ্বারা রসোদ্গম হয়—অনুভাবের দ্বারা তার ক্রিয়াটুকু প্রকাশ পায়। আচার্য ভরত রতি-ভাবের অনুভাবস্বরূপ অষ্ট-সাত্ত্বিক ভাবের উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে,

স্তম্ভঃ স্বেদোঽথ রোমাঞ্চঃ স্বরভঙ্গোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রু প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ॥

অর্থাৎ স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, মূর্ছা—এই আটটি সাত্ত্বিক ভাব। শোকভাবের অনুভাব রূপে অশ্রু, ক্রন্দন, মূর্চ্ছা প্রভৃতি থাকতে পারে।

ব্যভিচারীভাব ঃ

যে ভাবগুলি স্থায়ীভাবের পরিপোষক অর্থাৎ যারা স্থায়ীভাবের দিকে সঞ্চারণ করে—স্থায়ীভাবের মধ্যে যাদের উদয় বিলয়—তাদের বলা হয় ব্যভিচারী ভাব। ব্যভিচারী ভাবকে সঞ্চারী ভাবও বলে। এদের কোনো স্থায়ীরূপ নেই। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকে চিন্তা, হর্ষ, উদ্বেগ, স্মৃতি প্রভৃতি সঞ্চারী ভাব। এরা মূল রতি-ভাবেরই পরিপোষক। আলংকারীকদের মতে নির্বেদ, আবেগ, দৈন্য, শ্রম, মদ, জড়তা, মোহ ইত্যাদি তেত্রিশটি সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব আছে। এগুলি স্থায়ীভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের সহকারী হিসাবে রস-প্রতিষ্ঠার সহায়ক হয়। অনেকে স্থায়ী ও ব্যাভিচারী ভাবের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক স্বীকার না করলেও রস-প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ব্যভিচারী ভাব যে স্থায়ী ভাবের অঙ্গ -তা অস্বীকার করা যায় না। ব্যভিচারী ভাবই স্থায়ীভাবের বৈচিত্র্য সম্পাদন ক'রে তাকে সার্থক ক'রে তোলে।

কি ক'রে রস প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে—এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে রস কি এই কথাটি আমাদের আগে আলোচনা করা উচিত। রস এবং রস-নিষ্পত্তির জন্যে যে সব ভাবের প্রয়োজন আমরা তার আলোচনা করেছি। রসবেত্তারা রসকে অলৌকিক বলেছেন। এই রস অভিব্যক্ত হয়। রস একান্ত-

ভাবে অনুভূতির ব্যাপার। কবি কাব্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে রসসৃষ্টি করে থাকেন। বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্—রসাত্মক বাক্যই কাব্য। কাব্যের জগতও অলৌকিক। বাস্তবের সীমায় থেকে কবি অলৌকিক কাব্য সৃষ্টি করেন। লৌকিক জগতের ভাবগুলি যখন কাব্যে রসরূপে প্রকাশ লাভ করে—তখন তা লৌকিক সীমা ছেড়ে অলৌকিক হ'য়ে ওঠে। সাহিত্যদর্পণকারের মতে সামাজিকের রতি প্রভৃতি স্থায়ীভাব—বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাবের দ্বারা ব্যক্ত হয়ে রসে পরিণত হয়। এখানে এই কথাও স্মরণ রাখা দরকার যে—সব অঙ্গ বর্তমান থাকিলে রস পূর্ণতা রস লাভ করে বটে—কিন্তু কোনো একটি অনুপস্থিত থাকলে রসবোধ জন্মাবেনা—এই মত ঠিক যুক্তিযুক্ত ব'লে স্বীকার করা যায় না।

বিভিন্নপ্রকার রসের উদাহরণঃ

আদি, রতি বা শৃঙ্গার—

আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদি কালের হৃদয় উৎস হতে।
আমরা দুজন করিয়াছি খেলা কোটি প্রেমিকের মাঝে
বিরহ বিধুর নয়ন সলিলে, মিলন মধুর লাজে।
পুরাতন প্রেম নিত্য নতুন সাজে।

কিংবা,

অধরের কানে যেন অধরের ভাষা,
দোঁহার হৃদয় যেন দোঁহে পান করে—
গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালোবাসা
তীর্থ যাত্রা করিয়াছে অধর সংগমে।
দুইটি তরঙ্গ উঠি প্রেমের নিয়মে
ভাঙিয়া মিলিয়া যায় দুইটি অধরে।
ব্যাকুল বাসনা দুটি চাহে পরস্পরে,
দেহের সীমায় আসি দুজনের দেখা।

এখানে স্থায়ী ভাব—রতি।

হাস্যরস—

১। অল্পেতে খুসি হবে দামোদর শেঠ কি।
মুড়কির মোয়া চাই চাই ভাজা ভেটকি।
আন্‌বে কটকি জুতো. মটকিতে ঘি এনো, ইত্যাদি।

২। দেখি যদি গৌরমূর্তির রক্তবর্ণ আঁখি,
অমনি প্রাণের ভয়ে 'ওগো বাবা' বলে ডাকি ;
পালাই ছুটি উধর্বশ্বাসে. যেন বাঘে খেলে !
চাদর এবং পরিবারে সমভাবে ফেলে ; ইত্যাদি।

অসঙ্গত উক্তির জন্য হাস্যরস হয়েছে। স্থায়ী ভাব—হাস।

করুণরস—

শিশু একবার
জ্যোতিহীন আঁখি মেলি যেন চারিধার
খুঁজিল কাহারে। নারী কাঁদিল কাতর,
'ও মাণিক, ওরে সোনা, এই যে মা তোর ;
এই যে মায়ের কোল, ভয় কিরে বাপ
বক্ষে তারে চাপি ধরি তার জ্বর তাপ
চাহিল কাড়িয়া নিতে অঙ্গে আপনার—
প্রাণপণে।

এখানে স্থায়ী ভাব—শোক।

রৌদ্ররস—

(ক) অধীর হইলা শূলী কৈলাস আলয়ে
নড়িল মস্তকে জটা, ভীষণ গর্জনে
গর্জিল ভুজঙ্গ বৃন্দ ; ধক্ ধক্ ধকে
জ্বলিল অনল ভালে
স্থায়ী ভাব—ক্রোধ

(খ) 'এতক্ষণে রে লক্ষ্মণ', কহিলা সরোষে
রাবণ, 'এ রণক্ষেত্রে পাইনু কি তোরে,
নরাধম? কোথা এবে দেব বজ্রপাণি?
এখানেও স্থায়ীভাব—ক্রোধ।

বীররস—

সাজ হে বীরেন্দ্রবৃন্দ লঙ্কার ভূষণ—
দেখিব কি গুণ ধ'রে রঘুকুলমণি,
অ-রাবণ অ-রাম বা হবে ভব আজি।
স্থায়ী ভাব—উৎসাহ।

ভয়ানক রস--

রূপ নারানের মুখে পড়ি বালুচর
সংকীর্ণ নদীর পথে বাধিল সমর
জোয়ারের স্রোতে আর উত্তর সমীরে—
উত্তাল উদ্দাম। 'তরণী ভিড়াও তীরে'—
উচ্চকণ্ঠে বারম্বার কহে যাত্রীদল।
কোথা তীর! চারিদিকে ক্ষিপ্তোন্মত্ত জল
আপনার রুদ্র নৃত্য দেয় করতালি·
লক্ষ লক্ষ হাতে। আকাশেরে দেয় গালি
ফেনিল আক্রোশে।
স্থায়ী ভাব ভয়।

বীভৎস রস—

সে রোগের পাশে
বিশাল উদর বসে উদারপরতা
অজীর্ণ ভোজন দ্রব্য উগরি দুর্মতি
পুনঃ পুনঃ হস্তে তুলি আনন্দে গিলিছে
সুখাদ্য।
স্থায়ী ভাব—জুগুপ্সা।

অদ্ভুত রস—

(ক) কি আশ্চর্য নৈকষেয় ! কভু নাহি দেখি
কভু নাহি শুনি হেন, এ তিন ভুবনে !
নিশার স্বপন আজি দেখিনু কি জানি !
সত্য করি কহ মোরে, মিত্র রত্নোত্তম !
না পারি বুঝিতে কিছু ; চঞ্চল হইনু
এ প্রপঞ্চে দেখি।......

স্থায়ী ভাব—বিস্ময়।

(খ) সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে
ভীষণ দর্শন মূর্তি।

এখানেও স্থায়ী ভাব—বিস্ময়।

শান্তরস—

(ক) এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর,
পুণ্য হ'ল অঙ্গ মম, ধন্য হ'ল অন্তর।
সুন্দর হে সুন্দর ঃ
আলোক মোর চক্ষু দুটি মুগ্ধ হয়ে উঠল ফুটি
হৃদ্‌ গগনে পবন হ'ল সৌরভেতে মন্থর
সুন্দর হে সুন্দর।

স্থায়ীভাব—শম।

(খ) একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে
সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক তোমার এ সংসারে
ঘন শ্রাবণ মেঘের মতো
রসের ভারে নম্র নত
একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে
সমস্ত মন পড়িয়া থাক তব ভবন দ্বারে।

এখানেও স্থায়ীভাব—শম।

সাহিত্য ও সমাজ জীবনঃ

সাহিত্য ও সমাজ জীবন, জীবন ও শিল্প প্রভৃতি নিয়ে অনেক আলোচনা অনেক দিন ধ'রে চলছে। এই বিষয়গুলি এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির কথা ভাবা যায় না। মানব সমাজ—মানব জীবনের সুখ-দুঃখ ভালো-মন্দ—তার নানা প্রয়োজন নিয়েই গ'ড়ে উঠেছে। সমাজের কথা বলতে গেলে জীবনের কথা সেই সঙ্গে এসে পড়ে। জীবনের বিকাশ ঘটে এই সমাজের মধ্যেই। সার্থক জীবনের মধ্যেই সমাজের পরিচয় নিহিত। সাহিত্য মানবজীবনের বিচিত্রানুভূতির সার্থক আলেখ্য। জীবন-রসের সমাবেশেই সাহিত্যের সৃষ্টি। এই সাহিত্যেই মানুষের নানা অনুভূতির বাঙ্ময় প্রকাশ ঘটে। অপূর্ব জাগতিক রহস্য প্রতিমুহূর্তে মানুষের ভাবনার দ্বারে এসে নিজেকে জানান দিতে চেষ্টা করে। মানুষও তার পরিচয় লাভের জন্যে উৎসুক হয়ে থাকে। বাইরের জগৎ ও মানবজীবন নিয়ে সাহিত্যের কারবার। সাহিত্যে মানবজীবনের সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার সার্থক প্রকাশ ঘটে। মানুষ যে দিন থেকে তার ভাব ও ভাবনাকে সাহিত্যে রূপ দিতে পেরেছে সেদিন থেকেই মানব সমাজ ও মানব জীবনের সঙ্গে সাহিত্য অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়েছে। দেহ ও প্রাণের মধ্যে যে সম্পর্ক—সমাজ জীবন ও সাহিত্যের মধ্যে সে একই সম্পর্ক রয়েছে। আর্ট-কে গোড়াতে যে জীবনের অনুকৃতি বলা হয়েছিল—তাকে একেবারে অস্বীকার না ক'রে, আর্ট-কে পরের দিকে সম্ভাব্য-সত্যের অনুকরণ বলা হয়। সাহিত্য মানব-জীবনের যথাযথ অনুকরণ নয় বটে, কিন্তু তার মধ্যে মানব জীবনের একটি সম্ভাবনাময় রূপ-প্রকাশ ঘটে। মানব জীবনকে উপেক্ষা ক'রে কোনো শিল্পই—তা সে সাহিত্যই হোক আর ললিত কলাই হোক—স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না। সামাজিক মানুষের দ্বারাই মানব সমাজের জন্যে সাহিত্য রচিত হয়। 'The aim of all writers in different ages has been to defend society and mankind'—কাজেই সমাজ জীবন ও সাহিত্যের মধ্যে একটি নাড়ির যোগ রয়েছে।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে কবিরা তাঁদের যুগধর্মানুযায়ী সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। পুরানো দিনের সামাজিক মানুষের ধ্যানধারণার প্রতিফলন ঘটেছে সেকালের সাহিত্যে ও শিল্পে। কালিদাসের যুগের সাহিত্য—কালিদাসের

কালকে কেন্দ্র ক'রে রচিত। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, তাঁর রচনা তাঁর কালকে অতিক্রম ক'রে নিত্যকালীন রূপ ধারণ করেছে। অতি প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত মানুষের সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার প্রতিফলন ঘটেছে বিভিন্ন দেশ-কালের সাহিত্যে।

সকল দেশের সকল কালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মে একটি নিত্যতার যে আবেদন আছে—তা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। তবে সেই আবেদন প্রধানত রসের আবেদন—আর একটু স্পষ্ট করে বললে বলা যেতে পারে—জীবনরসের আবেদন। এই কালিদাস, সেক্‌স্‌পীয়র প্রভৃতি মহাকবিদের রচনার আজও অপমৃত্যু ঘটেনি এবং মানব সভ্যতার অস্তিত্ব যতদিন থাকবে—ততদিন ঘটবে বলেও মনে হয় না। কালিদাসের কালে বর্ষা-বিরহের যে সঙ্গীত মন্দাক্রান্তা ছন্দে ধ্বনিত হয়েছিল আজও তার আবেদন গৌণ হয়নি। জীবনের একটি বিশেষ মুহূর্তের অনুভূতিই মেঘদূত কাব্যে আভাসিত হয়েছে। কিং লীয়রের মর্মন্তুদ আর্তনাদ, হ্যামলেটের জীবনের শোচনীয় ট্র্যাজেডি আমাদের অন্তরকে শুধু স্পর্শই করে না—সেখানে যে আঘাতের সৃষ্টি করে—যে বেদনার অনুভূতি জাগায়—তাতেই উক্ত রচনাগুলির সার্থকতা। জীবনের বিশেষ অনুভূতি, বিশেষ কথা যে রচনায় সার্থক ভাবে রূপায়িত হয়—সেই রচনাই সার্থক সাহিত্যরূপে পরিগণিত হয়।

সাহিত্যে জীবনের যে রসপ্রকাশ ঘটে—সে জীবন সমাজ-বহির্ভূত নয়। কোনো জীবনই—সমাজ-বিচ্ছিন্ন নয়। সাহিত্যে যে জীবনের রূপচ্ছবি দেখতে পাই তা—সামাজিক জীবনেরই রূপচ্ছবি। সাহিত্যিকও সামাজিক মানুষ। তিনি জীবনধর্মী সাহিত্য রচনা করেন। মানুষ তার জীবনের সংবাদ পায় এই সাহিত্যে। বিভিন্ন যুগের মানব সমাজের রূপালেখ্য এই সাহিত্যেই বিধৃত। মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী সমাজের—তথা সামাজিক মানুষের রূপালেখ্য রয়েছে—তার মঙ্গল কাব্য ও পদাবলী প্রভৃতি সাহিত্যে। সেখানে সে যুগের মানব জীবনের দৈনন্দিন চাহিদা—তার সুখশান্তির আকাজ্ক্ষা প্রভৃতির সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে। যুগজীবনের প্রতিচ্ছবি এই সাহিত্যেই পাওয়া যায়। প্রতিটি যুগের সামাজিক মানুষের ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখের লিপিই হচ্ছে এই সাহিত্য। লোভীর উন্মত্ততা, অসহায় লাঞ্ছিত মানুষের দীর্ঘশ্বাস, বঞ্চিতের ক্ষোভ, উদ্ধতের সীমাহীন অন্যায়ের চিত্র—সাহিত্যের মাধ্যমেই আমরা পেয়েছি। এই সাহিত্যই আমাদের যেমন একদিকে আনন্দরসের আস্বাদ পেতে দিয়েছে—

তেমনই অন্যদিকে সমাজের নানা স্তরে মানুষে মানুষে যে দ্বন্দ্ব, যে কুটিল সংঘাত রয়েছে—যে অসাম্যের অভিশাপ রয়েছে—মানব জীবনের যে চাহিদা আছে এবং তা মেটাবার যে উপায় আছে—তার কথাও বলেছে।

সামাজিক হৃদয় সাহিত্য রচনা করলেও—সমাজ ও সাহিত্য অবিচ্ছেদ্য এবং পরস্পর সাপেক্ষ হ'লেও—বৃহত্তর মানব সমাজ সাহিত্যের কাছে অনেকখানি ঋণী। সমাজের চাওয়া-পাওয়া, আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখের কথা সাহিত্যের ভেতর দিয়েই প্রকাশ পায়। মানব জীবনের নানা সমস্যা—এমন কি নানা কালের নানা দেশের মানুষের জীবন-সমস্যাও এই সাহিত্যের ভেতর দিয়েই আমরা পেয়েছি। যা আছে এবং যা হওয়া উচিত এই দু'টি বিষয়ই সাহিত্যে আলোচিত হয়। দশের জীবনের নানা চিন্তাও ভাবনাকে সাহিত্যিক তাঁর রচনায় রূপায়িত করে তোলেন। শুধু যথাযথ রূপদান করাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়—জীবনের গতিপথের পরিণাম-সন্ধানও তার অন্যতম কাজ। সাহিত্য মানুষেরই রচিত বটে—কিন্তু সে মানব সমাজের নিয়ামক স্বরূপও বটে। অন্ধকারে পথ চলতে গেলে আলোর প্রয়োজন। যে প্রদীপ আমার হাতে—তার আলো দূরে গিয়ে পড়ে—এবং সেই আলোতেই পথ দেখতে পাই। সাহিত্যও সমাজের হাতের সেই প্রদীপস্বরূপ। তার আলো—অন্ধকারে পথ চিনিয়ে দেয়।

কিন্তু সব রচনাই সার্থক সাহিত্য আখ্যা পেতে পারে না। যা শুভ, যা কল্যাণময়, যা সৎ—একমাত্র সেই সাহিত্যই—সাহিত্যরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। ভালোকে ভাল আর মন্দকে মন্দ বললেই যে সাহিত্য প্রচারধর্মী হয়ে পড়বে এবং তা একেবারে সাহিত্য-লক্ষণচ্যুত হয়ে পড়বে—এ কথা তর্কাতীত ব'লে মেনে নেওয়া যায় না। রসিক হৃদয়ের কাছে সাহিত্যের যে আবেদন আছে—তা এমনই এক রসের আবেদন—যে রস জীবনে কোনো ব্যাধি বা বিকৃতির কারণ হয় না। আনন্দরস পরিবেশন সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য—অর্থাৎ মানব জীবনের আনন্দোপলব্ধির যথার্থ নির্দেশ দেওয়া সাহিত্যের অন্যতম লক্ষ্য। সেক্‌স্‌পীয়রের রচনা কি আমাদের জীবন-পথের সার্থক নির্দেশটুকু দেয় না! বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা থেকে কি আমরা দেশপ্রীতি, জাতীয়তাবোধের নির্দেশ পাইনি! শরৎচন্দ্রের উপন্যাস কি আমাদের সামনে সমস্যাসঙ্কুল সমাজের রূপটি তুলে ধ'রে—পরোক্ষভাবে, তার আদর্শ কি হওয়া উচিত তা বলে দেয়নি! রবীন্দ্র-সাহিত্যে কি আমরা জীবনের যথার্থ আনন্দরস আস্বাদনের উপায়

ও উপকরণ পাইনি! সাহিত্যের কাছে সমাজ তার পথনির্দেশ লাভ করে। সমাজকে বাদ দিয়ে যেমন সাহিত্য গ'ড়ে তোলা সম্ভব নয়, তেমনই সাহিত্য-নিরপেক্ষ সমাজের কথাও আমরা ভাবতে পারি না।

একদিকে মানুষই সমাজ গ'ড়ে তুলেছে। অন্যদিকে মানব সমাজের অণুপরমাণুতে এই মানব-সৃষ্ট সমাজই প্রভাব বিস্তার করেছে। সমাজ-সচেতন লেখকের রচনায় যে মানুষের পরিচয় আমরা পাই, সেখানে সমাজের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব অনস্বীকার্য।. আবার এই কথাও মনে রাখতে হবে যে, সমাজই সব সময় সাহিত্যকে কেবল প্রভাবিত করবে—তা যথার্থ নয়। দূরদর্শী শিল্পী বা সাহিত্যিকের সৃষ্টিও অনেক সময় ভবিষ্যত সমাজ-জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সাহিত্যিক তাঁর রচনার মধ্যে দিয়ে সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করেন। সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গে W. J. Long যথার্থই বলেছিলেন--'Behind every book is a man ; behind the man is the race ; and behind the race are the natural and social environments whose influence is unconciously reflected', এই সাহিত্য দূরকে নিকট বন্ধু ক'রে তোলে। সাহিত্যের এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেই গ্যেটে সাহিত্যকে 'the humanization of the whole world' ব'লে ব্যাখ্যা করেছিলেন।

সাধারণ অর্থে সাহিত্য 'written record of man's spirit, of his thoughts, emotions and aspiration's—আর বিশেষ অর্থে এ'কে 'artistic record of life' বলা যায়। যে রচনায় মানুষ সুন্দরের আস্বাদ লাভ করে—যেখানে মানব জীবনের সুখদুঃখ, নানা অভিজ্ঞতার নির্ভরযোগ্য রূপায়ণ ঘটে—সেই রচনাই সার্থক সাহিত্য আখ্যা লাভ করে। সাহিত্য যদি নীতির সীমা লঙ্ঘন ক'রে যায়—তাহলে তা কখনও 'মহৎ সাহিত্য' আখ্যা লাভ করতে পারে না। তাই তো পাশ্চাত্ত্য সমালোচক বলেন 'A literature of revolt against moral ideas is a revolt against life ; a literature of indifference towards moral ideas is a literature of indifference towards life.'

লেখক যে যুগে যে সমাজে বাস করেন, সেই যুগ ও সমাজের প্রভাব তাঁর রচনায় কোনো না কোনো ভাবে প্রতিফলিত হবেই। যুগ ও সমাজের প্রভাবকে তিনি একেবারে অস্বীকার করতেও পারেন না—এড়িয়ে যেতেও

পারেন না। সাহিত্যিক কখনও দেশ-কাল-নিরপেক্ষ সাহিত্য রচনা করতে পারেন না। দুর্বল সাহিত্য কখনও সমাজ জীবনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে না। সমাজ-পরিপন্থী রচনাকে যথার্থ সাহিত্য আখ্যাও দেওয়া যায় না। সাহিত্যে সমাজ-জীবনের সুখদুঃখ দাবী-দাওয়ার বর্ণনা থাকবে। সামাজিক হৃদয় সাহিত্যের মধ্যে নিজের সম্ভাব্য প্রতিকৃতি দেখতে পাবে। জীবনকে আত্মস্থ ও প্রকৃতিস্থ করার দায়িত্ব অনেকাংশে সাহিত্যকে বহন করতে হয়। কিন্তু কোনো রচনা যদি সমাজ-জীবনের পরিপন্থী হয়—সমাজ কল্যাণ ও মঙ্গলের বিচারেই তাকে আমরা সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারি না।

সাহিত্যকে criticism of life ব'লে স্বীকার ক'রে নিলে—জীবন ও সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কটিও স্বীকার ক'রে নিতে হয়। এই criticism of life যে রচনায় সার্থকভাবে পাওয়া গেল—সেখানে অন্য কোনো রকম অসাধারণত্ব না থাকলে সাহিত্যও স্থায়িত্ব দাবী করতে পারে না। অনেকে বলেন—সমাজ সমস্যা বা সমাজ বিপ্লব কোনো শ্রেষ্ঠ কাব্যের বিষয় হয়নি—তা বলে তাদের কি অপাঙ্‌ক্তেয় করে রাখা যায়! আমরা আগেই বলেছি, যে সাহিত্য সৃষ্টিতে অসাধারণত্ব আছে—যার আবেদন নিত্যকালের—যেখানে জীবনের আশ্চর্য রহস্যের অনুভূতির নিত্যতা অনস্বীকার্য—সে ধরনের রচনার উক্ত বিশেষত্ব হেতু তাদের সাধারণ রচনার পর্যায়ে ফেলে বিচার করা যুক্তিযুক্ত হবে না। কিন্তু মানুষ দৈনন্দিন জীবনে যে রচনার দ্বারা প্রভাবিত হয়, যে রচনা পথের দিশারী-স্বরূপ দীপবর্তিকা হাতে তাকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যায়—যার মধ্যে তার ভালোমন্দের বিচার বিশ্লেষণ আছে—সেই রচনার সঙ্গে মানুষের সমাজনীতির দিক থেকেই হোক অথবা সাহিত্য-নীতির দিক থেকেই হোক—একটি নিবিড় যোগ রয়েছে। লোকোত্তর সাহিত্যের সঙ্গেও সামাজিকের এই সম্পর্ক বিদ্যমান। কারণ সেখানেও মানুষের সূক্ষ্ম ও বিরাট অনুভূতির সার্থক রূপায়ণ ঘটে—নিত্যকালের মানব মনের অনন্ত জিজ্ঞাসা ও তার সম্ভাব্য উত্তরের সন্ধান সেখানে পাওয়া যায়।

কোনোকালেই জীবনকে বাদ দিয়ে—জীবন-নিরপেক্ষ সাহিত্য রচিত হয়নি। সাহিত্যই মানব জীবনকে অবিনশ্বরতা দান করেছে। একথা সত্য যে, মরদেহের বিনাশ ঘটবেই—কিন্তু সাহিত্য লোকে মানব জীবন অমরত্ব লাভ করেছে—সেখানে তার ক্ষয় নেই, বিনাশ নেই, সেখানে সে মৃত্যুঞ্জয়। রবীন্দ্রনাথের মতে

মানুষ সাহিত্য সৃষ্টি করে আপনাকে মৃত্যুঞ্জয় করার জন্যে—যুগ ও কালের শত রূপান্তরের বাধা অতিক্রম ক'রে তার ভাবনা যাতে ভবিষ্যতে বেঁচে থাকে তাই তার একমাত্র কামনা। সাহিত্য সেই কামনা প্রভূত পরিমাণে রূপায়িত ক'রে এবং ক্ষণজন্মা পুরুষের ললাটে অমরত্বের জয় তিলক পরিয়ে দেয়। তাঁর মতে, এই জীবন মহাশিল্পী···সে যুগে যুগে দেশ দেশান্তরে মানুষকে নানা বৈচিত্র্যে মূর্তিমান করে তুলছে। ··· জীবনের এই সৃষ্টি কার্য যদি সাহিত্যে যথোচিত নৈপুণ্যের সঙ্গে আশ্রয় লাভ করতে পারে তবেই তা অমর হয়ে থাকে।' তাইতো 'where ever men are heroic, they will acknowledge the mastery of Homer ; where ever a man thinks on the strange phenomenon of evil in the world, he will find his own thoughts in the book of Job ; in what ever place men love their children, their hearts must be stirred by the tragic sorrow of Œdipus and King Lear'.

কাজেই সমাজ জীবন ও সাহিত্যের নিবিড় সম্পর্ককে আমরা শ্রদ্ধা সহকারে স্বীকার করি। সমাজজীবনকে কেন্দ্র ক'রেই সাহিত্য গ'ড়ে ওঠে। সেই সমাজ জীবনকেই সাহিত্য সত্যের পথে—মহৎ সম্ভাবনার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। তবে এও সত্য যে, সমাজের রূপচিত্র অঙ্কনই সাহিত্যের একমাত্র লক্ষ্য নয়। সাহিত্য সমাজের রূপালেখ্য তুলে ধরলেও—তার নিজের একটি শিল্পরূপও আছে। শিল্পী ও সাহিত্যিক সামাজিক হলেও—শিল্পরসিকও বটেন। তিনি তাঁর ধ্যান-ধারণা-ভাবনাগুলিকে সাহিত্যে রসরূপ দান করেন। কেউ কেউ বলেন, জীবনের বৈচিত্র্য সাহিত্য বৈচিত্র্যের প্রধান অঙ্গ বটে কিন্তু একমাত্র অঙ্গ বলা যায় কি! তার উত্তরে এইটুকু বলা যায়, সাহিত্যে আর যা বৈচিত্র্য আছে তাও জীবনে বিচিত্রতার আস্বাদ এনে দেয়। সেখানেও রস পরিবেষণ ও রস গ্রহণ সম্পর্কটুকু রয়েছে—সেখানেও সাহিত্য সামাজিক মন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়—সামাজিক মনও সাহিত্য থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

সাহিত্যে ক্লাসিসিজম্ ও রোমাণ্টিসিজম্ঃ

ক্লাসিসিজম্ ও রোমান্টিসিজম্ কথা দু'টির সঙ্গে আমরা ইংরাজি সাহিত্যের মাধ্যমে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই পরিচিত হয়েছি। সাহিত্যের আলোচনায়

আমরাও ক্লাসিক সাহিত্য ও রোমান্টিক সাহিত্যের কথা বলে থাকি। অনেক সময়ে এই দু'য়ের মধ্যে একটা পার্থক্য দেখাতেও চেষ্টা করি। গ্যেটে এক সময় বলেছিলেন 'Classicism is health; Romanticism is disease'. তখন তাঁর এই মন্তব্যকে অনেকে স্বীকার করে নেননি। তাঁরা বললেন, তার চেয়ে বরং এই বলা ভালো যে, ক্লাসিসিজম্ হচ্ছে method—আর রোমানটিসিজম্ হচ্ছে energy। কিন্তু এই ধরনের সূক্ষ্ম পার্থক্য দেখানো সত্ত্বেও—তাঁদের মতে, এই দু'য়ের পার্থক্য দেখানোর মধ্যে তেমন কোনো সঙ্গতি নেই। দুইটি যেন পরস্পরের পরিপূরক। ক্লাসিসিজম্ 'tends to order lucidity, proportion'—আর রোমান্টিসিজম্ 'to freedom, to fancy, to caprice'. ক্রোচ ক্লাসিক ও রোমান্টিক কথা দুটির পার্থক্য উহ্য রেখে তাঁর Problemi গ্রন্থে বললেন,'A great poet is both classic and romantic'. কেউ কেউ এই অভিমত মেনে নিয়েছেন। এলিয়ট তো আরও এগিয়ে এসে বললেন—ক্লাসিক ও রোমান্টিক কথা দু'টি একান্ত ভাবে literary Politics-এর ব্যাপার। তবুও কথা দু'টি নিয়ে যখন সাহিত্যক্ষেত্রে ভিন্ন ভাবাদর্শ গ'ড়ে উঠেছে—তখন তাদের স্বরূপ জানা দরকার।

পাশ্চাত্ত্য সমালোচক ক্লাসিক রচনার সংবাদ দিতে গিয়ে বললেন, ক্লাসিক হচ্ছে, 'a book which has stood the test of time, and by its stability and permanance, and the universality and persistency of its appeal, has given unmistakable assurance of immortal life.' সাহিত্যে যে ক্লাসিক ধর্মের কথা আমরা বলি তার একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—মানুষের প্রতি, মানবধর্মের প্রতি, মানুষের শক্তি ও সামর্থ্যের প্রতি—দৃঢ় বিশ্বাস। এ ছাড়া দৃঢ়তা, উপস্থাপনার বিরাটতা, মানবজীবন ও জগতের যে উপকরণ নিয়ে সে সাহিত্য রচিত হতে চলেছে—তার স্বভাবের যথার্থ অবতারণা প্রভৃতিও রয়েছে। সুমিতি বোধ, মানব জীবন, মানব সমাজ ও সাহিত্য—একটি বিশেষ নিয়মের সূত্রে বাঁধা। ক্লাসিক রচনা কখনও নিরুদ্দেশের পানে উধাও হয়ে যায় না। ক্লাসিক শিল্পী কখনও বলবেন না—অবাধ মুক্তির মধ্যে নির্বাধ যে প্রকাশ—তাই আমার প্রাণধর্ম। যাঁরা ক্লাসিক ও রোমান্টিক ধর্মে পার্থক্য দেখান—তাঁরা বলেন, ক্লাসিক ধর্ম বিশেষ নিয়মের পথ ধ'রে চলে। পাশ্চাত্ত্য জগতে যারা এই দুই সাহিত্য-বৈশিষ্ট্যকে আলাদা ক'রে দেখিয়েছেন—তাঁদের একজন বলছেন—'In classical writing every idea is called

up as nakedly as possible and at the same time as distinctly. It is exhibited in white light, and left to produce its effect by its own unaided power. In romantic writing, on the other hand, all objects are exhibited as it were through a coloured and iridescent atmosphere. Round about every central idea the romantic writer summons up a cloud of accessory and subordinate ideas for the sake of enhancing its effect if at the risk of confusing its out lines.' এই সমালোচকই ক্লাসিক ও রোমান্টিক্ সাহিত্যিকের মানসলোকের পার্থক্য দেখাতে গিয়ে বলছেন, 'The temper of the romantic writer is one of excitement, while the temper of the classical writer 'is one of self-possession'. অর্থাৎ তাঁর মতে, রোমান্টিক্ লেখকের মন হচ্ছে—উধাও হয়ে যাওয়া মন—তিনি কল্পনার পাখায় ভর ক'রে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেন। তাঁর 'আছে শুধু পাখা,' আর 'আছে মহানঅঙ্গন।' কিন্তু ক্লাসিক লেখক আবেগ-উচ্ছ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হন না। তাই ক্লাসিক ধর্ম গীতিকবিতা রচনার তেমন উপযোগী নয়। পরিমিতি বোধ, ভাবের সংযত সংহত প্রকাশ, পরম আত্মনির্ভরতার সঙ্গে মানব প্রকৃতির অনুসরণ প্রভৃতিতে ক্লাসিক সাহিত্য-রচয়িতার পরিচয় নিহিত।

পরের দিকে খাঁটি ক্লাসিক ধর্ম আর তেমন রইল না। সপ্তদশ শতাব্দীর পর থেকেই পাশ্চাত্ত্য জগতের ক্লাসিক ধারায় নতুন সুর সংযোজিত হ'তে থাকে। আগে মানব জীবনের যে কল্যাণবোধটি ছিল, পরের দিকে তা অনেকখানি নষ্ট হয়ে যায়। পাশ্চাত্ত্যের সাহিত্যবিচারে যাকে ক্লাসিকাল যুগ বলা হয়—তার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, আবেগের পরিবর্তে একটি সুন্দর মার্জিত কৃত্রিম ভাষার অনুশীলন, পরিমিতিবোধ, আতিশয্য বর্জন,যুক্তিকেন্দ্রিক বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা। এই যুগের সাহিত্যের মধ্যে আমরা এক ধরনের অদ্ভুত সঙ্কীর্ণতা লক্ষ্য করি। ক্লাসিক রচয়িতারা যে রুচি, যে বুদ্ধি ও শৃঙ্খলাবোধকে পরিতৃপ্ত করবার জন্যে সাহিত্য রচনা করেছিলেন—সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই বর্তমান দিনের সমালোচকরা সেই সাহিত্যরচনাকে উৎকৃষ্ট মনে করেন না। ইংলণ্ডের ক্লাসিকাল যুগের লেখকরা বিশেষ ভাবে অগাষ্টান যুগের রোমক সভ্যতা ও লাতিন সাহিত্যের অনুসরণ অনুকরণে প্রবৃত্ত হন। সব সময় যে তাঁরা লাতিন আদর্শে লিখেছেন তাও নয়—ফরাসী সাহিত্যাদর্শ লাতিন সাহিত্যাদর্শের ওপরে নিজের

আসন সার্থক ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

আমরা 'ক্লাসিক', ক্লাসিকাল কথাগুলি নানা অর্থে ব্যবহার করি। কোনো কিছু খুব ভালো হয়েছে বোঝাতে গিয়ে বলি—'ক্লাসিক' হয়েছে। এই অর্থে যে কোনো দেশের যুগোত্তীর্ণ শ্রেষ্ঠ রচনাকে ও তার রচয়িতাকে যথাক্রমে ক্লাসিক ও ক্লাসিকাল লেখক বলতে পারি। সংস্কৃত সাহিত্য, গ্রীক-রোমান সাহিত্য—এই অর্থে ক্লাসিকাল সাহিত্য। যে সাহিত্য কালজয়ী হ'য়ে আজও মানুষের হৃদয়ে সম্মানের উচ্চাসন অধিকার ক'রে আছে—তাকেও বলি ক্লাসিকাল। আবার যখন এদের রীতিকে অনুসরণ করা হয়—তখন সেই অনুসৃত রীতিকে বলি—ক্লাসিকাল রীতি। উচ্চাঙ্গের বা উচ্চমার্গের শিল্প সৃষ্টিকেও আমরা ক্লাসিকাল বলি।

ক্লাসিক ধর্মের যে লক্ষণগুলি আমরা দেখেছি, তাতে আর যাই হোক—তা যে মহৎ শিল্প রচনার কিছুটা পরিপন্থী ছিল—সেকথা মেনে নিতেই হবে। তাতে Good Art হতে পারে, কিন্তু Great Art হয় না। অতিরিক্ত যুক্তিপ্রবণতা, রুচিপ্রবণতা, নীতিপ্রবণতা—রস-সাহিত্যের অনুপন্থী নয়। ক্লাসিকাল লেখকদের রচনায় নিষ্প্রাণ যুক্তিসর্বস্বতা বড়ো বেশি প্রাধান্য লাভ করেছে। নিজেদের রুচি, শিক্ষার আভিজাত্য সম্বন্ধেও তাঁরা খুব সচেতন ছিলেন। তাই অনেক সময় 'ভুল যুগে' জন্মগ্রহণ করেছেন বলে দুঃখও করেছেন। আবেগ-উচ্ছ্বাসকে পরিহার করে যুক্তির পথ ধ'রে চলতে গিয়ে তারা মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতির দিকটি প্রায় পরিহার করে চলেছিলেন। তবুও এরই মধ্যে যে সার্থক সাহিত্য কিছু কিছু রচিত হয়নি—তা বলা যায় না। ও দেশের পোপ, সুইফ্‌ট প্রভৃতির রচনার উৎকর্ষ সর্বজন-স্বীকৃতি লাভ করেছে।

অনেক ক্লাসিকার রীতির লেখক ছিলেন—যাঁরা একেবারে রোমান্টিক্ আবেগ মুক্ত নন। আমাদের কবি মধুসূদন সম্বন্ধে এই কথা বলা যেতে পারে। কাজেই যাঁরা ক্লাসিক ও রোমান্টিক ধর্মের মধ্যে পার্থক্য দেখানো অবাস্তর মনে করেন তাঁরা যে একটিকে method ও অন্যটিকে energy বলেছেন—এবং ক্রোচ যে 'A great poet is both classic and romantic' বলেছেন—সেই ক্লাসিক ও রোমান্টিক্ ধর্মের মিশ্রণ অনেক সাহিত্যিকের রচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি।

সাহিত্যে রোমান্টিসিজম্ ব'লে যে ধারাটি দেখা দিয়েছিল—তার ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও কোলরিজ দুজনে মিলে

Lyrical Ballads নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ঐ তারিখটি থেকে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংরাজি সাহিত্যে রোমান্টিক যুগ বলে গণ্য করা হয়। এই কয়টি বৎসরের মধ্যে ইংরাজী সাহিত্য ক্ষেত্রে এমন কয়েকজন সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটেছিল—যাঁদের নাম-পরিচয় সর্বকালের ইতিহাসের পরিচয় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

সাহিত্যে রোমান্টিক অনুভূতির প্রকাশ এর আগে থেকেই দেখা দিয়েছিল—কিন্তু যে রোমান্টিক আন্দোলন বিশেষ ভাবে ইংরাজি সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করে—তার ওপর ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব অনেকখানি। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোল্‌রিজ—ফরাসী বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণীর দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন। আবার যখন বিপ্লবের ব্যর্থতা দেখা দিল—তখন এঁরা একেবারে ভেঙে পড়লেন। তখন রোমান্টিক লেখকেরা বিপ্লবের বিরুদ্ধেই লিখতে শুরু করেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের রচনার মধ্যে আমরা ফরাসী বিপ্লবের প্রেরণা-দাতা রুশোর ভাবধারার প্রভাব লক্ষ্য করি। রুশো 'প্রকৃতির কোলে ফিরে যাবার' কথা বলেছিলেন। তাঁর মতে মানুষের যত ভেদবুদ্ধি, অসাম্য প্রভৃতি নগর সভ্যতার কুফল। মানুষ যদি প্রকৃতির কোলে শিক্ষালাভ করে তাহলে তার বৃত্তিগুলির স্বাভাবিক স্ফুরণ ঘটতে পারে। রুশোর এই ভাবধারা ওয়াডস্‌ওয়ার্থের রচনায় আভাসিত হয়েছে।

ফরাসী বিপ্লব ছাড়াও এঁদের উপর জার্মান ভাববাদের প্রভাবও এসে পড়েছিল। জার্মান ভাববাদ বলে—সৃষ্টির গোড়ার জিনিসটি হচ্ছে চৈতন্য। মানুষের ভাব-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা—সব কিছুর উৎস মানুষের মন—বাইরের জগৎ নয়। মানবসত্তা, প্রকৃতিসত্তা ও পরমসত্তা—এই ত্রয়ীর মধ্যে একটি সামঞ্জস্যের সুর ধ্বনিত হচ্ছে। এদের জানতে হলে—জ্ঞান দিয়ে নয়—অনুভূতি দিয়ে জানতে হবে। কোলরিজের ওপর এই মতবাদের প্রভাব—পরিমাণে বেশিই ছিল। অনেকে রোমান্টিক নব জাগরণের (Romantic Revival) কথাও বলেন। তাঁদের মতে প্রাচীন দিনের (ইংলণ্ডের এলিজাবেথীয় যুগের) রোমান্টিকতাকে ফিরিয়ে আনার একটি প্রয়াসও এই যুগে (Romantic Revival Period) লক্ষিত হয়। ইংলণ্ডের এলিজাবেথীয় যুগ ও রোমানটিক্ যুগের মধ্যে রয়েছে—ক্লাসিকাল যুগ। রোমানটিক্ কবিরা সচেতন ভাবে বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের বিরোধী ছিলেন। ক্লাসিকাল যুগ জ্ঞান-বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ-জড়বাদের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন—আর রোমান্টিক্ কবিরা এঁদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে

বসলেন। তাঁরা ক্লাসিক রীতিতে সত্যকে জানতে চান না। বিশ্লেষণ নয়, জ্ঞান নয়—উপলব্ধিই তাঁদের প্রধান মন্ত্র। ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতিকে ক্লাসিক কবিরা স্বীকার করেন নি—তাঁরা সর্বসাধারণের আবেগ বা অভিজ্ঞতার রূপচিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন। রোমান্টিক কবিমনের কাছে ব্যক্তির আবেগ-অনুভূতিই সব চেয়ে বড়ো কথা। রোমান্টিক কবি—মানুষের জীবনের—তার মনের বিরাট আশা ও বিরাট সম্ভাবনার খবর রাখতেন ব'লেই—সমাজের জীর্ণ সংস্কারের উপর তাঁদের স্বভাবতই ঘৃণা ছিল। এই বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁদের রচনায় কখনও বিষণ্ণতা, কখনও পলায়নী মনোবৃত্তি প্রকাশ পেয়েছে। রোমান্টিক্ মন বিশ্বাস করে যে, মানুষ জীবনে পরিপূর্ণ সুখ ও সার্থকতা লাভের অধিকারী। রোমান্টিক্ চিন্তানায়কেরা যে শুধু ভাবেই বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন তা নয়—তাঁরা ছন্দ, ভাষা প্রভৃতি প্রত্যেকটির ব্যবহারেই পরিবর্তন বা নতুন-কিছু-প্রবর্তন প্রয়াসী ছিলেন। তাঁরা যে আবেগকে রূপ দিতে চেয়েছেন তার জন্যে ঠিক যে ভাষা দরকার—সে ভাষা হাতের কাছে পাননি বলেই—নিজেরা নিজেদের মতো ক'রে ভাষা গ'ড়ে নিয়েছেন। রোমান্টিক ধর্মে বিস্ময়, চমৎকারিত্ব প্রভৃতি গুণগুলির স্বীকৃতিও রয়েছে। একদিকে মানব মনের মুক্তির আভাস—অন্যদিকে সামান্যতম ঘাসের ফুল থেকে অব্যক্তের ইসারা পর্যন্ত সবই তাঁদের কাছে এক অপূর্ব অনুভূতির জগৎ রচনা করে। সেই জগতই তাঁদের সাহিত্য কর্মে সার্থক রূপ লাভ করেছে। রোমান্টিসিজম কি—এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে একজন বিখ্যাত সমালোচক বলেছেন—"an extraordinary development of imaginative sensibility. At countless points the universe of sense and thought acquired a new policy of response, and appeal to man, a new capicity of ministering to, and mingling with his richest and intensest life." রোমান্টিক কবিরা শুষ্ক দর্শনশাস্ত্রের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকেই মানতে চাইলেন না। তাঁদের মত হ'লো 'Poetry is philosophy and philosophy is poetry.'

রোমান্টিক আন্দোলন থেকে রোমান্টিক আদর্শবাদ, বস্তুবাদ, অতীতের পুনরুদ্ধার, ঐতিহাসিক পটভূমিকায় জীবনকে দেখা, মিষ্টিসিজম, উদ্ভট-কাব্য প্রভৃতি দেখা দেয়। শিশু মনের মাধুর্য, প্রকৃতির রহস্যময় নীরবতা, পাখীর গান, নদীর কলতান, পরিদৃশ্যমান জগতের 'অলস মোহিনী মায়া'—রোমান্টিক

মনকে অভিভূত করে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের লুসি ও রুথ-বিষয়ক কবিতা, To the Skylark, Ode-জাতীয় কবিতা, কোলরিজের The Ancient Mariner, Christabel, Kublai Khan, স্কটের Lady of the lake এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের রোমান্টিক কবিদের মধ্যে শেলির West Wind, Cloud, Prometheus Unbound, To the Skylark, কীট্‌স-এর Eve of St Agnes, Hyperion এবং Ode-জাতীয় কবিতা, বায়রণের Child Harolde, Don Juan, ল্যামের রচনা প্রভৃতি রোমান্টিকধর্মী রচনার সার্থক নিদর্শন।

আমাদের দেশে মধুসূদনের রচনায় ক্লাসিক রীতি অনুসরণ থাকলেও তাঁর হৃদয় ছিল রোমান্টিক আবেগে পূর্ণ। আমাদের দেশেও রোমান্টিক আন্দোলন উনবিংশ-শতাব্দী থেকেই শুরু হয়। অতীতের পুনরুদ্ধার, অসীমের আকুতি, কল্পনার অবাধ মুক্তি, হৃদয়-যন্ত্রনার উপশমের জন্য স্বপ্নলোক যাত্রা, বিষণ্ণতা, পলায়নী মনোবৃত্তি, মিষ্টিসিজম প্রভৃতি আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের রচনাতেও দেখা দেয়। উনবিংশ শতাব্দীতেই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হ'ল। তখন থেকে সাহিত্যকর্মে এক বিরাট ভাব প্রবাহ দেখা দিল—নতুন প্রভাতে জেগে উঠে—বাঙালী জীবন ও জগৎকে যেন নতুন চোখে দেখতে পেল। রবীন্দ্র-সাহিত্যে এই রোমান্টিক বৈশিষ্ট্য সার্থক ভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে। মনের অবাধ মুক্তির আনন্দে তিনি অনুভব করেছেন—'কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা—মনে মনে।' মুক্তি-কামনায় বেদনাবোধ ও মুক্তি পাওয়ার আনন্দ-কল্পনা দিয়ে কবির রোমান্টিক পরিবেশ গ'ড়ে ওঠে। একঘেঁয়ে জীবন যাত্রার পথ থেকে নেমে—অজানা অচেনা পথের যাত্রী হবার আনন্দেই মানুষের জীবন সার্থক হয়ে ওঠে। যদি কেউ বলে এ যে অবাস্তব—তার উত্তরে রোমান্টিক ভাবুক মন বলবে—বাস্তবের সঙ্কীর্ণতার সীমা অতিক্রম করে নিরুদ্দেশ যাত্রার যে আনন্দ— তাকে একেবারে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিই কি করে! তাই কবি কণ্ঠে শুনি—

আমি চঞ্চল হে
আমি সুদূরের পিয়াসী—

তাইতো কবি চান যে প্রলয় সমুদ্র ভেদ ক'রে—

তুফানের মাঝখানে
নূতন সমুদ্রতীর পানে
দিতে হবে পাড়ি।

বাস্তব পথ ধরেই মানুষ চলেছে অজানার দিকে। বিশ্বাসের সঙ্কীর্ণতা থেকে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে মুক্তিও কি তার কাম্য নয়!

গীতি কবিতা ঃ

কাব্য ও কবিতার সঙ্গে 'গীতি' কথাটি যোগ করলেই তার অর্থও কিছুটা বদলে যায়। গীতি কবিতা কথাটি আমরা বিশেষ অর্থেই ব্যবহার ক'রে থাকি। ইংরাজিতে lyric বলে যে কথাটি আছে বাংলায় গীতি কবিতা অনেকটা একই অর্থে প্রযুক্ত। Lyric কথাটির সঙ্গে কাজ বা Music-এর সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। Lyric এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ খোঁজার তেমন প্রয়োজন নেই—তবুও প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো যে, ওই শব্দটির সঙ্গে lyre নামক তার-যন্ত্রটির কাছাকাছি সম্পর্ক রয়েছে। প্রাচীন দিনে বাদ্যযন্ত্র-সহযোগে যে গান গাওয়া হতো তারই মার্জিত আধুনিক রূপ দাঁড়ালো lyric কথাটিতে। এই থেকেই পরের দিকে Lyricism, Lyric Poetry ইত্যাদি কথা ব্যবহৃত হচ্ছে। পরের দিকে একেবারে গান অর্থে আর তাকে ধরে না নিলেও—তার মধ্যে যে গীতি-মূর্চ্ছনা আছে—তারই আভাস দেবার জন্য কবিতার আগে গীতি—poetryর আগে lyric—কথাটি ব্যবহৃত হয়।

কবিতাকে সাধারণত এবং স্থূলত দুই ভাগে ভাগ করা হয়—একটি ব্যক্তি-নিরপেক্ষ কবিতা, অপরটি—ব্যক্তি-অনুভূতিপ্রধান কবিতা। যেখানে কবি নিজের সীমা অতিক্রম ক'রে বাইরের জগতের বিচিত্রতার রহস্য বুঝতে চান—প্রকাশ করতে চান—সেই কবিতাই ব্যক্তি-নিরপেক্ষ কবিতা আখ্যা লাভ করে। সেখানে কবির ব্যক্তি-পরিচয় গৌণ। কিন্তু আর এক ধরনের কবিতা আছে—যেখানে কবির নিজের জীবনের অনুভূতি, ভাব ও ভাবনার রূপায়ণ ঘটে। কবি নিজের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারেন না। তাঁর জীবনের বিশেষ emotion-গুলি যে আকুতি জাগায়—তাকেই তিনি কাব্যরূপ দান করেন। কবির আত্মার স্বাভাবিক প্রকাশ ঘটে—এই ধরনের ব্যক্তি-অনুভূতি-প্রধান কবিতায়। ব্যক্তিগত অনুভূতির কবিতার একটি বিশেষ কাল নিরূপণ করা সম্ভব নয়। কারণ প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক যুগে এই ধরনের ব্যক্তি-নিরপেক্ষ বা নির্ব্যক্তিক (Impersonal) এবং ব্যক্তিসাপেক্ষ বা ব্যক্তিগত

অনুভূতির (Personal feeling) প্রেরণায় কাব্য রচিত হয়েছে। গীতি কবিতা বা Lyric গ'ড়ে ওঠার মূলে সঙ্গীত থাকলেও—পরবর্তী কালে সঙ্গীতই আর একমাত্র কারণস্বরূপ রইল না। তখন জীবন-সঙ্গীতই প্রাধান্য লাভ করল। আগের দিনে সব রকম গাথাই তো কোনো না কোনো বাদ্য যন্ত্র বাজিয়ে সুর ক'রে গাওয়া হ'তো। সেদিক থেকে নির্ব্যক্তিক বা ব্যক্তিগত অনুভূতিমূলক সকল কবিতা বা পদই গাওয়া হতো। কাজেই Lyric-এর ব্যাপক অর্থটিকে গ্রহণ করতে গেলে impersonal ও personal feeling-প্রসূত কবিতার পার্থক্য বিচার সম্ভব হয় না। দু'টির পার্থক্য দেখাতে গিয়ে তখন একটিকে Lyric কবিতা—আর একটিকে শুধু কবিতা হিসাবে ভাগ করা হলো। Lyric কবিতা হলো তাই—যেখানে—'the poet is principally occupied with himself.'

গীতি কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাতে একটি ভাব বা ভাবনা—একটি emotion প্রকাশ পায়। কবিমনের সহজ ও সরল প্রকাশ তার মধ্যে ঘটে। ভাবের আবরণ-আভরণের দীনতা নেই বটে—কিন্তু তেমন বিস্ময়সৃষ্টি-কারী ঐশ্বর্যও নেই। কবির মনে যে ভাবটি দেখা দিল অথবা যে স্মৃতি বা কল্পনা জেগে উঠল তাকে ছন্দোরূপ দান করাই গীতিধর্মী কবির কাজ। একটি বিশেষ emotion-এর সার্থক প্রকাশে শুধু কবিতা কেন—নাটক-উপন্যাসও গীতিধর্মী হয়ে উঠতে পারে। নাটক-উপন্যাসে ঘটনাবস্তুর স্থান-কাল-পাত্রগত ঐক্যের কথা বলা হয়। সেখানে আমরা যে ঐক্যটি লক্ষ্য করি, তা আমাদের আকৃষ্ট করে বটে—কিন্তু তার সম্বন্ধে সচেতন থাকার জন্যে এবং তার পরিণতি সম্বন্ধে একটি সচেতনতা থাকার জন্যেই তেমন কোনো বিস্ময় সৃষ্টি হয় না। কিন্তু গীতি কবিতায় একটি সামান্যতম মুহূর্তের অনুভূতির আকস্মিক প্রকাশের দ্বারা বিস্ময় সৃষ্টি করা যায়। গীতিধর্মী কবিকে কোনো এক বিশেষ উপায় গ্রহণ করতে হয় না—তিনি নিজের মনেই—নিজের প্রেরণাতেই যা রচনা করেন—তাই পাঠকবর্গকে আকর্ষণ করে। কিন্তু emotion জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই গীতি কবিতা জন্ম লাভ করতে পারে—এরকম মনে করা সঙ্গত হবে না। ইয়েটস্ ভাবনা ও তার প্রকাশের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—

A line will take us hours may be ;
Yet if it does not seem a moment's thought,
Our stiching and unstiching has been naught.

গীতি কবিতা সম্বন্ধে আর একটি কথাও মনে রাখা দরকার। এই ধরনের কবিতায় কবির কোনো অধ্যবসায়ের পরিচয় থাকে না। জীবনের সঙ্গীতময় মুহূর্তগুলি কবিমনকে এমন ভাবে নাড়া দেয় যে, ঐ মুহূর্তগুলির আহ্বানে তাঁকে সহজ ভাবে সাড়া দিতেও হয়। এই 'সহসা' ভাবটি গীতি কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এর জন্যে কবিকে কোনো 'কসরৎ' করতে হয় না। রূপকল্পের জন্যও কবিকে ভাবতে হয় না। তাঁর ভাবকে রূপ দেবার কাঠামোটিও আগে থেকেই তৈরি থাকে—শুধু তাই নয়, ভাব—তার অনুভূতি ও রূপকল্প (form) আশ্চর্যভাবে যুগপৎ দেখা দেয়। কবির আয়াস গীতি কবিতার মূল ঝোঁককেও নষ্ট ক'রে দিতে পারে। কবিমনের অস্থিরতা, আবেগ প্রভৃতি সৃষ্টির ক্রিয়ার পূর্বেই দেখা দেয়। কবির মনে যে ভাবটি বাসা বাঁধে—তা হয়ত কোনো একটি সম্পূর্ণ চরণে অথবা একটি সমগ্র কবিতায় রূপায়িত হয়। সৃষ্টির সংকট-মুহূর্তে ভাবটিই কবিতার রূপকল্পকে গ'ড়ে নেয়। কবিতার একটি কি দু'টি শব্দ, একটি চরণ বা কয়েকটি চরণ অথবা সমগ্র কবিতায় কবির ভাবটি অস্থির ভাবে আত্মপ্রকাশের পথ খোঁজে। অনেক সময় দেখা যায় প্রথম চরণে যে কথাটি বলা হলো তাই কবিতার প্রধান বক্তব্য—তাই পরে আর যাই বলা হোক না কেন, ঐ প্রথম কথাটিই যেন ঘুরে ফিরে নানারূপে আসে। ভাবপ্রকাশের আবেগে যে কথাটি হঠাৎ বাণীরূপ লাভ করে—তার যথার্থতা কবির মনে এক অদ্ভুত ভাবাবেশ সৃষ্টি করে। তিনি কেবলই ঐ একটি কথাকে বারবার ব'লে নিজের আনন্দকে প্রকাশ করেন। গীতি কবিতায় তাই একটি ভাব বা emotion-এর প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি। তার আয়তনও খুব বড়ো নয়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলি, কীট্‌স্‌, গ্রে, কাউপার প্রভৃতির কবিতায় এই রকম আবেগ, আকস্মিকতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিকার 'অবিনয়' কবিতার গীতিধর্মিতা লক্ষণীয়। আরম্ভেই কবি বলেন—

হে নিরুপমা,
চপলতা আজ যদি কিছু ঘটে করিয়ো ক্ষমা।

পরের স্তবকে আবার শুনতে পাই—

হে নিরুপমা,
আঁখি যদি আজ ক'রে অপরাধ করিয়ো ক্ষমা।

এমনি করে কবি বারবার বলতে থাকেন—

হে নিরুপমা,
গানে যদি লাগে বিহ্বল তান করিয়ো ক্ষমা।

শেষ স্তবকেও সেই 'হে নিরুপমা'।

বাংলা সাহিত্যে গীতিধর্মী রচনার অজস্র উদাহরণ রয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলী থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত অনেক সাহিত্যিক লিরিক অথবা লিরিক-ধর্মী সাহিত্য রচনা করেছেন। চণ্ডীদাসের কণ্ঠে শুনি—

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নাম আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে ॥

ভাব-বিভোর কবি জ্ঞানদাস গেয়ে ওঠেন—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর ॥

বিহারীলালের কবিধর্মই গীতি-কবিতাশ্রয়ী। আপন মনে তিনি গান গেয়ে চলেছেন—তার না আছে কোনো প্রসাধন—না আছে কোনো সঙ্কোচ। বিহারীলাল সহজ ভাবের ভাবুক কবি। তাঁর কবিতাতেও সেই সহজ অনাড়ম্বর ভাবপ্রকাশ লক্ষ্য করি। রবীন্দ্র-রচনার গীতিধর্মিতার পরিচয় নতুন করে দেবার প্রয়োজন নেই। বহু যুগের ওপার থেকে আষাঢ় যে বাণী নিয়ে আসে—সে চিরপুরাতন বরষার বাণী। 'যে গান কানে যায় না শোনা—সে গান যেথা নিত্য বাজে'—কবি সেই 'অতলের সভা মাঝে' প্রাণের বীণা নিয়ে যেতে চান—'দিনের শেষে ঘুমের দেশের ঘোমটা-পরা' ছায়াটি কবির মনকে অভিভূত করে—তাই বারবার তিনি চেনা-অচেনার ভীড়ে প্রশ্ন জানান—'আমায় নিয়ে যাবি কে রে দিনের শেষের শেষ খেয়ায়।' 'ব্যর্থ যৌবন' কবিতায় কবি আকুল ভাবে বলেন—

'আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে।
কেন নয়নের জল ঝরিছে বিফল নয়নে।

*   *   *   *

কত উঠেছিল চাঁদ নিশীথ-অগাধ আকাশে।
বনে দুলেছিল ফুল গন্ধ-ব্যাকুল বাতাসে॥
তরু মর্মর, নদী কলতান—
কানে লেগেছিল স্বপ্ন-সমান;
দূর হতে আসি পশেছিল গান শ্রবণে।
আজি সে রজনী যায়, ফিরাইব তায় কেমনে॥

এই কবিতাংশের গীতি মাধুর্যের তুলনা কোথায়!

গীতি কবিতার উদ্দেশ্য আর সমগ্র সাহিত্য-শিল্পের উদ্দেশ্য একই—আনন্দ-রস পরিবেষন। কবিমনের অনুভূতির আনন্দকে অন্যের মনে সঞ্চারিত ক'রে দেওয়া—গীতিধর্মী কবি সচেতন ভাবে—তা না করলেও—তাঁর মূল উদ্দেশ্য হলো আনন্দরস পান—এবং সহৃদয় সামাজিকের :চিত্তে আনন্দ রস সঞ্চার।

সাহিত্যে আধুনিকতা ঃ

রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, 'নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিধে চলে না। যখন সে বাঁক নেয় তখন সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডার্ন। বাঙলায় বলা যাক আধুনিক। এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়।' সাহিত্যধারা যখনই চলতে চলতে বাঁক নিয়েছে—তখনই দেখা যায় মানবজীবনের নতুন জিজ্ঞাসা জেগে উঠেছে। আগের দিনে আধুনিকতার লক্ষণ ছিল ব্যক্তিগত খুশির দৌড়। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে এই খুশির দৌড়ের কোনো সীমা কি নেই? হ'তে পারে তখনকার দিনের সাহিত্যিকরা বাইরের জগতটাকে নিজের ব্যক্তিগত করে তুলতে চেয়েছিলেন, সেখানে বাহ্যিকতার চেয়ে তাঁদের আন্তরিকতার ঝোঁক ছিল বেশি। বাইরের সব কিছুকে তাঁরা অন্তরের যোগে দেখতে চেয়েছিলেন। পাশ্চাত্যের সাহিত্যে এই ঝোঁকটা যখন দেখা দেয়, তখন সেটাই হয়ে উঠল আধুনিক। তখন সে দেশের কাব্য পূর্বসংস্কার ছেড়ে ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের দিকে বাঁক নিয়েছিল।

বাঙ্‌লা সাহিত্যের মধ্যযুগে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর সাহিত্য একবার চিরাচরিত সংস্কারের পথ ছেড়ে নতুন পথ ধরেছিল। আবার উনবিংশ শতাব্দীর সূচনার সঙ্গে সঙ্গে নতুন চিন্তাধারা, নতুন জীবনজিজ্ঞাসা ও জীবনাদর্শ—সাহিত্য ও সংস্কৃতির মোড় ঘুরিয়ে দিল। আমাদের সাহিত্যে আধুনিকতার নতুন সুর উঠল বেজে। কিন্তু যখন দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা পরিবর্তন এসে পড়ে এবং যখন সাহিত্যে তার প্রতিকম্পন হয়—তখন আগেরটা সেকেলে হয়ে পড়ে। এসব দেখেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, ইংরেজি সাহিত্যে একসময় যা আধুনিক আখ্যা পেয়েছিল—পরে তাই মিড্‌ভিক্‌টোরিয়ান ইত্যাদি আখ্যা পায়।

কিন্তু মাঝে মাঝে যুগ ও যুগচিত্তকে কেন্দ্র করে যে আধুনিকতা দেখা দিয়েছিল তাকে অস্বীকার করবার ত উপায় নেই। সে আধুনিকতা বিশেষ যুগের উপকরণ নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তার মধ্যে শাশ্বত কল্যাণের বলিষ্ঠ প্রকাশ ঘটলে—তখন সে যতো পুরানো দিনেরই হোক না কেন—অনাগত কালের জন্যেও সে রসের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করে রাখে—অর্থাৎ সে কোনোকালেই পুরানো হয় না।

তবুও এরই ফাঁকে ফাঁকে এমন কতগুলো দুর্বল মুহূর্ত দেখা দেয়—যারা স্বাভাবিক চলার পথের বাইরে দাঁড়িয়ে অযাচিত অসৌজন্য প্রকাশ করে। যেমন, আমরা বর্তমানে সাহিত্যের যে যুগে বাস করছি তা প্রধানত রবীন্দ্রযুগ—এযুগের সাহিত্য ও সংস্কৃতির দেউলের একমাত্র পুরোহিত রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু তাঁর প্রতিভার ছায়ায় মাঝে মাঝে নতুন সুরেও জীবন বীণা বেজে উঠেছে—অনেক সময় আবার অবাঞ্ছিত সুরও জেগে উঠেছে। মানুষের জীবনের'অকথিত বাণী', 'অগীত গান' শোনাবার প্রয়াসও দেখা দিয়েছে। রোমান্টিক চোখে-দেখা জগৎ মাঝে মাঝে বাস্তব-সত্যরূপ লাভ করেছে। মোটকথা সাহিত্যে আধুনিকতা এসে পড়েছে। বিশুদ্ধ art—শেষ পর্যন্ত art for the people হয়েছে। কিন্তু আধুনিকতার নামে আমাদের সাহিত্যে যে এক ধরনের সস্তা আধুনিকতা দেখা দিয়েছে তাকে আমরা 'অতি আধুনিক' আখ্যা দিতে পারি। যেখানে গভীরতা ও দরদ কম—অথচ চটক বেশি—যেখানে 'সস্তা-বাহবা' পাবার আকুল উৎকণ্ঠা থাকে—তাকে বলা যেতে পারে 'অতি আধুনিক'। তর্ক উঠবে—আধুনিক মন ত চটক-প্রত্যাশী নয়—সেও চায়, যা আছে তারই যথাসম্ভব সত্য শুভ্র প্রকাশ ঘটুক। এই আধুনিকতার মধ্যে জীবনকে যথাযথ ভাবে দেখার বাসনা রয়েছে। পৃথিবীর বিরাট জনতার

সুখদুঃখের যথার্থ রূপচিত্র অঙ্কন—আধুনিক যুগের একটা বৈশিষ্ট্য। আধুনিক কালে সময়-সংক্ষেপের জন্য সাহিত্য-বিলাসের সুযোগ কম। আধুনিক সাহিত্যে এই বিলাসের উপকরণ কখনও মুখ্য হতে পারে না। কিন্তু আধুনিক যুগধর্ম বাস্তবকে যত রূঢ়ভাবে প্রকাশ করবার নির্দেশ দিক না কেন—তাকে সুন্দর করে প্রকাশ করতে বাধা আছে কি? 'অতি-আধুনিকতার' মধ্যে এই সার্থক সুন্দর প্রকাশের অভাবই বেশি।

আমরা জানি এক সময়ে আধুনিক বলতে যা বোঝাতো তাতে 'বিষয়ীর আত্মতাই' ছিল বড়ো কথা—পরের দিকে 'বিষয়ের আত্মতা' মুখ্য হয়ে উঠল। তখন অলংকারের সৌন্দর্যের চেয়ে সাহিত্যবস্তুর বাস্তবতার ওপরই বেশি ঝোঁক দেখা দিল। কারণ আধুনিক মন বলে 'আর্টের কাজ মনোহারিতা নয়, মনোজয়িতা'। রঙিন স্বপ্ন মাখানো মনগড়া সংসারে নিজেকে মুগ্ধ করে রাখার সময়ও তার নেই—ইচ্ছাও নেই। যা সত্যই হয়ে উঠছে—তাকে যথাযথভাবেই প্রকাশ করতে হবে। কাদামাটির পৃথিবীতে থাকি—তাই কাদামাটিকেও সাদাসিধে ভাবে জানতে হবে। অ্যাপোলোর হাসির মাধুর্য জানা আছে—এবার ব্যাঙের হাসিও জানতে হবে! অর্থাৎ মোহ ভাঙতে হবে।

এ খুবই সত্যি যে, ভোরের রক্তিম আভাস, সদ্য ফোটা ফুল প্রভৃতি জড়িয়ে একটি রোমান্টিক রূপবিন্যাস করা চলে। তারপর আলো যতো প্রখর হ'তে থাকে—মানুষের চোখের সামনের মায়াজাল ততই কেটে যায়—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এসে জীবনের অঙ্গনে ভীড় করতে থাকে। তখন অস্পষ্ট মায়ার জাল ভেদ ক'রে স্পষ্ট বাস্তবের মুখোমুখী আমাদের দাঁড়াতে হয়। এই বাস্তবকে অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই। আমাদের সাহিত্যে, শিল্পে এই বাস্তবের আবির্ভাবের সূচনায় প্রতিবাদ থাকলেও সত্য যেখানে আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত সেখানে তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করার কোনো কারণও ছিল না। এই বাস্তবকে হয়ত কেউ বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে গ্রহণ করেছেন, কেউ বা অশ্রদ্ধায় একেবারেই গ্রহণ করেন নি। কিন্তু যারা চিত্তবৃত্তির দুর্বলতা নিয়ে একে গ্রহণ করতে গেছেন তাঁরা তার বলিষ্ঠ রূপটি ধরতে পারেননি। তখন বিকৃতির নালা বেয়ে সস্তা পচা জিনিষকেও বাস্তব আখ্যা দিয়ে আধুনিকতার দোহাই পেড়ে সাহিত্যে ও শিল্পে অনেকসময় চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটাকেই আমরা বলতে চাই 'অতি-আধুনিক' এবং এটাই সমাজের একান্ত-বাঞ্ছিত নয়। কারণ মোহমুক্তির শুভ প্রয়াস ও রুচি বিকৃতির নির্লজ্জ ঔদ্ধত্য এক পর্যায়ে পড়ে না।

প্রথম মহাযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতা মানুষকে কতখানি দুঃখ জর্জরিত—কতখানি নির্মম করে তুলেছিল তা তখনকার সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতির সংকট থেকে আমরা অনুমান করতে পারি। কিন্তু যুদ্ধোত্তর বিকৃত যৌনবাদ যখন সাহিত্যের প্রধান বাহন হ'য়ে 'আধুনিক' আখ্যা পেতে থাকে তখনই তথাকথিত আধুনিকতা সম্বন্ধে আমাদের প্রশ্ন জাগে। দুঃখে আঘাতে জর্জরিত জীবনে বিশ্বের প্রতি—বিশ্ববিধাতার প্রতি একটা অবিশ্বাস এসে পড়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সেখানে যদি চিত্তবিকারকেই মুখ্য করে তোলা হয়, তাহলে বলতে হবে—বাস্তব রসের গভীরতাকে সহজভাবে বুঝতে না পারাতে রসবিকৃতিকেই বড়ো করে দেখানো হচ্ছে। সাহিত্যে জৈব পিপাসা ও লালসাকে মথিত করে দেখানোর মাঝে দুঃসাহস থাকতে পারে—কিন্তু সৎসাহসের কোনো পরিচয় আছে বলে আশা করি কেউ বলবেন না। আবার মানবজীবনের গূঢ়ৈষাকে রূপ দেবার 'অধিকার' যদি শক্তিহীন অপটুর হাতে পড়ে, তাহলে সাহিত্যে ও শিল্পে আবিলতা আসতে বাধ্য। 'অতি-আধুনিকতায়' এই শক্তি-হীনতার পরিচয় বারবার পাওয়া গেছে। আমাদের শিল্পে ও সাহিত্যে যেখানেই নির্লজ্জ ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেয়েছে সেখানে তাকে যতই 'মডার্ন্' ব'লে ঘোষণা করা হোক না কেন—তার দুর্বলতা ঢাকা পড়ে নি। অশক্তের স্পর্ধা দুর্বলতা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে! এবং পরিণামে যদি এই ধরনের শক্তিহীনের রচনা চিরন্তন আর্টের সংজ্ঞা লাভ না করে তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

আর্ট যে কোনো ভাবেই প্রকাশ পাক না কেন—তার মূল লক্ষ্য যে মানুষকে মোহমুক্ত ক'রে আনন্দ দান করা—এটা আমরা স্বীকার করি। খুব নির্ভরযোগ্য কোনো একটা বিষয়বস্তু নিয়ে তাকে শুধু যথাযথভাবে—বা একান্ত স্বাভাবিক ভাবে দেখাচ্ছি বললেই চলে না—যা বলছি তা কতখানি গ্রহণযোগ্য হ'ল তাও দেখতে হয়। অর্থাৎ এমন ভাবে বিষয়বস্তুটিকে তুলে ধরতে হবে যাতে শুধু বাইরের হাততালি নয়—অন্তরেও তার স্বীকৃতি থাকবে। এর জন্য বিষয়বস্তু বাছাই করাও দরকার। একেবারে হাতের কাছে যা পাওয়া গেল তাই উপকরণ স্বরূপ তুলে নেওয়া হ'ল—আর সব মিলিয়ে 'যেমন-তেমন' ক'রে যা-হোক-একটা-কিছু করে প্রকাশ করা হ'ল—তাতে আর সব থাকতে পারে কিন্তু আর্ট থাকতে পারে না—তা সে বিশুদ্ধ আর্টই হোক—আর art for the people-ই হোক।

জীবনে অতর্কিতে কিছু এসে পড়লে তাকে বর্জন করতে হবে এমন কথা আমরা বলিনা—অথবা তার ভালো মন্দ না বুঝে সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করতে হবে তাও বলিনা। আমরা বলি, যদি সেই অতর্কিতের আবির্ভাব অবাঞ্ছিত না হয়—তাহলে তাকে আত্ম-চেতনার ভেতর দিয়ে বিশ্ব-চেতনার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে—কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠায় যেন কল্যাণাভাস থাকে। গাণিতিক নিয়মে বিশুদ্ধ গণিত বা বিজ্ঞান শাস্ত্রের সুদূর প্রসারী আলোচনা চলতে পারে—কিন্তু বিশুদ্ধ সাহিত্য যে আলোচিত হয়না—হ'তে পারে না—এটা হয়ত 'অতি-আধুনিকরা' স্বীকার করবেন না, কিন্তু আধুনিক-পন্থীরা নিশ্চয় স্বীকার করবেন।

সুন্দরের সাধনা কথাটা একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হবে—কিন্তু কথাটা এই যে, কুরূপকে অপরূপ ক'রে গ'ড়ে না তুললেও তাকে কুশ্রীতায় ভরে দেওয়া উচিত নয়। একটু সুন্দর ক'রে প্রকাশ করতে দোষ কি! অনেকে বলবেন, যেটা মন্দ সেটাকে মন্দ বলছি—তাতে দোষ কি! তাকে মন্দ বলুন না হাজার বার—কিন্তু মন্দভাবে বলবেন না। এমন ভাবে বলুন—যাতে মন্দ জিনিসটা মানুষের চোখে শুধু সুস্পষ্ট হয়েই উঠবে না—তার উল্টো ভালোটাও তার সামনে আভাসিত হয়ে উঠবে।

রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন –

রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি
তুমি এসেছ প্রাণেশ্বরী,
প্রাতে কখন দেবীর বেশে
তুমি সমুখে উদিলে হেসে—

অথবা

বিবশ দিন বিরস কাজ
কে কোথা ছিনু দোঁহে,
সহসা প্রেম আসিলে আজ
কি মহাসমারোহে।

এখানে রসাবেশ আছে—আছে ভাব মাধুর্য। কিন্তু মদের সঙ্গে নারী, মাংস, ঠুনকো ভাড়াটে প্রেম—এতে কি রসাবেশের চেয়ে প্রচণ্ড ভোগাবেশ বেশি প্রকট হ'য়ে ওঠে না! কিন্তু যেখানে কবি—বাতিওয়ালার পথে পথে বাতি জ্বালানোর ব্যস্ততার সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের ঘরের বাতি না-জ্বলা সম্বন্ধে সচেতন অথবা চাঁদ আর পোড়ারুটির সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যে যেখানে তিনি দারিদ্র্যের

রূঢ় সত্যের প্রকাশ ঘটান—সেখানে আর্ট-লক্ষ্মী কুরূপা হন না। আমরা স্বরূপকে চাইনা বলছিনা —কিন্তু তাকে ভালো করে দেখাতে হবে—কদর্য ক'রে নয়। বর্তমান দিনে অধিকাংশ বাঙলা উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, কবিতা প্রভৃতির রসবস্তু ও বিষয়বস্তুর গৌরব বর্ধিত না হবার অনেকগুলি কারণের মধ্যে একটি কারণ হচ্ছে—বেশির ভাগ রচনাই অশক্ত, অপটু হাতের রচনা। কথাটা রূঢ় হলেও সত্য। তাই আজকাল অনেক লেখায় বাজার ছেয়ে গেলেও—তারা দুর্বল মাতার ক্ষীণায়ু শিশুর মতোই ক্ষীণজীবী। আমাদের দেশে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের দিকে আধুনিকতার একটি উদ্ধত প্রকাশ কিছুদিনের জন্য ঘটেছিল। এঁদের মধ্যে অনেকেই শক্তিমান শিল্পী ছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেকের শক্তির অপচয় ঘটেছিল ভুল পথ ধরে চলাতে। তাই দেখা গেছে, কাব্যে গল্পে উপন্যাসে অনেকেই এক জায়গাতেই রয়ে গেছেন—এঁদেরই অনেকে হয়ে উঠলেন 'অতি আধুনিক'। পেছন ফিরে তাকাবার এঁদের ইচ্ছেও ছিল না—সময়ও ছিল না। তাই তাঁদের রচিত সাহিত্যকে বলা যেতে পারে 'অঘটন-ঘটন পটিয়সী' সাহিত্য। সাহিত্য-সরস্বতীর বীণার তারে সাধারণ মানুষের জীবনের গান এঁদের অনেকেই সার্থকভাবে বাজাতে পারেননি। 'সজল মেঘের নীল অঞ্জন' মুছে নিয়ে এঁরা পড়লেন রঙীন চশমা—যার ভেতর দিকে সত্যকে যথার্থ সত্য বলে জানা দুষ্কর। যাঁরা তার ভেতর দিয়েও দেখতে পেলেন মানুষকে—তাঁদের স্বাক্ষর এখনও মুছে যায়নি। কিন্তু অনেকেই তো এড়িয়ে গেলেন—যে-পথ ধরেছিলেন সে পথের বাধাকে! তবু এটাও সত্য যে, এঁদের প্রচেষ্টাকে অস্বীকার কেউ করবেন না। নতুন দিনের আলোর আভাসের সন্ধানে এঁদের অনেকেই বেরিয়ে পড়েছিলেন। জীর্ণতা ও জড়তা মুক্তির আভাস আছে এঁদের অনেকেরই রচনায়।

বর্তমানে মানুষের আর্থনীতিক ও সামাজিক দুঃখ দুর্দশা, জীবন ধারণের তাগিদ, ত্বরা-তাড়িত যুগের তাড়া খাওয়া ভাড়াটে জীবনের মর্মান্তিক বেদনা-বোধ, পেছনে-ফেলে আসা দিনের স্মৃতির গৌরব বা লজ্জা—এই সব নিয়ে সাহিত্যে যে আধুনিকতা প্রকাশ পেতে পারে—তার সার্থক প্রচেষ্টা খুব বেশি লক্ষিত হয় না। মানুষের সুখ দুঃখ, দ্বন্দ্ব সংঘাত, জীবনসংগ্রাম প্রভৃতি ঠিক একই আছে—বরং আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কিন্তু অনেকের মতে, উপন্যাস-নাটকের সার্থক প্লট খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যাঁরা এই কথা বলেন—তাঁদের বক্তব্যের কোনো ভিত্তি আছে কি! একটি কথা অনেকে নানা ভঙ্গীতে

বলার কসরৎ দেখাচ্ছেন। জীবন-জিজ্ঞাসার দরজা জানালা সব বন্ধ করে দিয়ে কেবল একটি মামুলী রাস্তা খোলা রাখা হয়েছে। নাট্য-সাহিত্যের অবস্থা এক সময় যা হয়েছিল—তাতে মনে হতো—আর বেশিদিন এভাবে চললে শেষ পর্যন্ত নাট্যসাহিত্যে মজা পুকুরের ইতিকথা রচনা করে ক্ষান্ত হবে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় বর্তমানে কিছু কিছু সার্থক নাটক রচিত হচ্ছে।

অন্যদিকে দেখতে পাই আধুনিকতার দোহাই পেড়ে এক রকমের সস্তা আধুনিকতা পূর্ণ—যাকে আমরা 'অতি-আধুনিকতা' বলেছি—জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন এমন সব উপন্যাস গল্প রচনা সুরু হয়েছে যে আমাদের ভয় হয়—একদিন বিখ্যাত বইর বাজার যে 'বটতলা'—আজ যা বিদ্রূপের বিষয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—বর্তমান বাজারও শেষ পর্যন্ত না তাই হ'য়ে ওঠে।

তা বলে আমরা একথা বলছি না যে, সবাই লেখা বন্ধ করুন। আমাদের বক্তব্য এই যে, বাড়াবাড়িটা বন্ধ করুন—আর সেই বাড়াবাড়িকেই 'আধুনিক' নাম দিয়ে চালাবেন না। 'আধুনিক' হোক তাই—যেখানে বারেবারে মানব জীবনের সার্থকতালাভের তৃষ্ণা রূপলাভ করবে—যেখানে আত্মগতঃচেতনা বিশ্ব-চেতনায় রূপান্তরিত হবে—এবং শুধু জনতার বাইরের কোলাহলের সঙ্গে পরিচয় নয়—জনতার সঙ্গে যেখানে গভীর আত্মীয়-সম্পর্ক গড়ে উঠবে। যেটা মন্দ—তাকে শুধু মন্দ বলব না—ওই মন্দের বদলে জীবনে কি কাম্য তাও বলব। অনেক উপন্যাস ও গল্পে দেখা যায়, যে মন্দ জিনিসটাকে এত বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয় যে শেষ পর্যন্ত, মনে হয় ওটাই যেন লেখকের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। 'অতি-আধুনিকতার' উন্মত্ত ও উদ্ধত আচরণে সাহিত্যের এই কুণ্ঠা-জড়িত রূপটিই বেশি প্রকাশ পায়। সেখানে দেশ-কাল-পাত্রের প্রতি যে সুবিচার হয় না—একথা বলাই বাহুল্য। কারণ মানুষের প্রতি গভীর 'দরদ' নিয়ে, মানুষের সুখদুঃখকে সাহিত্যে রূপায়িত করতে না পারলে সার্থক সাহিত্য হবে না। এর জন্য প্রথমেই দরকার মানব জীবনের প্রতি গভীর ভালোবাসা। রবীন্দ্রনাথের কথায় 'এই ভালোবাসার দ্বারাই তো মানুষকে বিচার' করা—উচিত এবং এই সশ্রদ্ধ মানব প্রীতিই আধুনিক সাহিত্যের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই সচেতনতা নিয়ে সমাজ-জীবন পর্যালোচনা করতে পারলে—এটা ঠিক যে উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক বা কবিতার বিষয়বস্তুর অভাব ঘটবে না। জীবনকে দেখার চোখ না থাকাতে আজ বেশির ভাগ রচনায় শুধু চিত্তবৈকল্যের রূপচিত্রই প্রধান হয়ে উঠছে—তার স্পর্ধিত প্রকাশ ঘটছে—অর্থাৎ অনেক

ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি হচ্ছে—কিন্তু বলিষ্ঠ সাহিত্য গ'ড়ে উঠছেনা। মনোভূমি বনভূমিই সৃষ্টি করছে—ফুল দিচ্ছে না দেখা—ফল ফলাতে পারছে না। বাঙলা সাহিত্য ক্ষেত্রে এক ধরনের অবাঞ্ছিত 'অতি-আধুনিকতা' প্রকাশ পাচ্ছে—কিন্তু আধুনিক সাহিত্য হচ্ছে না। সৃষ্টিমূলক সাহিত্যের ক্ষেত্র থেকে কোনো কিছুকে আমরা একেবারে খারিজ করে দিতে বলছি না—আমরা বলি মোহকে, বিকৃতিকে বড়ো করে দেখিয়ে মানুষের প্রতি যেন অশ্রদ্ধা না দেখাই। সেখানে বরং একটু নিরাসক্তি থাকাও ভালো—তবুও অতিরিক্ত আসক্তিকে যেন প্রশ্রয় না দিই। অতিরিক্ত সেন্টিমেন্টালিজমও নয়—আবার অতিরিক্ত অশ্রদ্ধা-জনিত চিত্ত-বিকারও নয়, অর্থাৎ অতিরিক্ত কিছু নয়—শুধু প্রকাশাকুল জীবনকে কদর্য কুৎসিত না করাই আর্টের—তথা আর একটু সীমা টেনে বললে—সাহিত্যের উদ্দেশ্য হোক—আমরা এই চাই।

সাহিত্য পরিক্রমা ঃ

এ পৃথিবীতে যেমন Art-এর মৃত্যু নেই, তেমনি জীবনেরও মৃত্যু নেই। সুন্দর যেখানে সত্যের আলোয় অভিষিক্ত—সেখানে জীবনের স্বরূপ চিরঞ্জীব, দেশাতীত ও কালাতীত। জীবন-সত্যের সার্থক নিদর্শন রয়েছে অজন্তা-ইলোরাতে, প্যারির লুভরে, ভ্যাটিকন মিউজিয়ামে, ফ্লোরেন্সের উফিজি গ্যালারীতে। তারা সেই প্রাচীনকাল থেকে আজকের যুগ পর্যন্ত সত্যের সঙ্গে সুন্দরের রাখীবন্ধনের সাক্ষীস্বরূপ রয়েছে।

সাহিত্যও এই সত্য ও সুন্দরের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সাহিত্য শুধু জীবনের আলেখ্য নয়—জীবনের আলোচনাও। রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণের জগতে কবিমন স্বভাবতই অনির্বচনীয় অনুভূতির আলোড়ন খোঁজে। আর সেই আলোড়নকে বন্দী করে—ভাষার বন্ধনে। তারই মধ্যে নিজের স্বপ্ন-কল্পনা মিশিয়ে কবি প্রকাশ করেন জীবনকে।

মানুষ সত্য ও সুন্দরের উপাসক। মানুষের জীবনে নানাভাবে সত্য ও সুন্দরের অভিব্যক্তি ঘটে। জীবন ছাড়া সাহিত্যিক কখনও সাহিত্য রচনা করতে পারেন না। সাহিত্য যেমন জীবন ছাড়া হ'তে পারে না, জীবনও

তেমনি সাহিত্যের বাইরে নয়। যা অসত্য ও অমঙ্গলজনক, তা মানবজীবনকে সুন্দর ক'রে প্রকাশ করতে পারে না। জগতে যা কিছু সুন্দর তার মূলে রয়েছে বন্ধন-মুক্তির প্রচেষ্টা।

সাহিত্য শুধু মানব সভ্যতার নতুন প্রভাতের সূর্যসারথি নয়—সংস্কৃতি ও সভ্যতার পথ প্রদর্শকও বটে। সভ্যতার আদি যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের বিচার বুদ্ধি যে ভাবে এগিয়ে চলেছে, সাহিত্যও সেই ভাবে এবং সেই সঙ্গে অমৃতকুম্ভের সন্ধানে যাত্রা করেছে। সাহিত্যের যাত্রা শুরু না হ'লে জীবনের সাধনা শুরু হ'তো না—হ'তো না সমাজ সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় লাভ।

প্রাচীনযুগে মানব সমাজের বাস্তব সুখ-দুঃখ ব'লে বিশেষ কোনো অনুভূতি ছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে এই অজ্ঞতা দূরীভূত হ'য়েছে। সুখ দুঃখের অনুভূতি জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই এলো সৌন্দর্যবোধের শক্তি। এই সৌন্দর্যবোধের চরিতার্থতাই সাহিত্যের সবটুকু সার্থকতা। তাই যেদিন শোনা গিয়েছিল আদিকবির কণ্ঠের ছন্দিত বিরহের শোকগাথা, সেই শোকগাথার ভিতরও যে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য থাকতে পারে, সেদিন তাই অনুভূত হয়েছিল। মহাকবি কালিদাসের মেঘদূতে দেখি মানবের শাশ্বত হৃদয়বৃত্তির রূপায়ণ—আর গ্যেটের ফাউষ্টেও ঐ একই সৌন্দর্যের সাধনা।

আমাদের প্রাচীন দিনের সাহিত্যে জাতীয়তা ও তদনুবিদ্ধ প্রাণধর্মের প্রকাশ দেখা যায়। এদেশে সাহিত্যচর্চার গোড়াপত্তন হয়েছিল বহিরাগত আর্য ও এ দেশের স্থায়ী অধিবাসী অন্-আর্যদের দ্বারা। এই সময়কার রচনা প্রধানত ছিল সংস্কৃতপ্রধান, কখনও কখনও—সংস্কৃত-উদ্ভূত প্রাকৃত ভাষা। আর এই প্রাকৃত ভেঙে বাঙলা, আসামী, উড়িয়া, মৈথিলী, হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠী ইত্যাদিতে রূপ পেল। আধুনিক ভাষায় রূপ পরিগ্রহণের আগে প্রাকৃতের অর্বাচীন রূপের নাম হ'ল অপভ্রংশ। এই অপভ্রংশ ভাষা তদানীন্তন কালের কোনো কোনো রচনায় এবং বৌদ্ধ সহজপন্থী ও শৈব নাথপন্থীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এঁদের অনেকেই মাঝে মাঝে বাংলাতেও গান লিখতেন। তাঁদের রচিত গানগুলিই চর্যাগীতি নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

এর পরের যুগ—মুখ্যত অনুবাদের যুগ। রামায়ণ-মহাভারত শুধু কাব্যরস যুগিয়ে আমাদের শ্রবণ-মন তৃপ্ত করেনি—এই সরল কাব্যকাহিনীর মাধ্যমে এল নৈতিক শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক শান্তিলাভ করবার উপায়। এই কাব্যগুলি

যেমন চিত্তবিনোদনকারী—তেমনই চরিত্র গঠনের একান্ত সহায়ক। আর এখানেই সাহিত্যের সার্থকতা।

এই সঙ্গে দেবদেবীর মাহাত্ম্যকাহিনী, মঙ্গলকাব্য, পুরাণকাহিনী সাহিত্যের মধ্যে প্রতিভাত হ'য়ে মানব জীবনের গীতময় ধ্বনিকে প্রকাশ করল। তারপর এলো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল। তাতে সমাজেরও যেমন পরিবর্তন সাধিত হ'ল, সাহিত্যেরও তেমনি রূপ পরিবর্তন ঘটল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলা কাব্যে ও সাহিত্যে শোনা গেল স্বদেশ প্রেমের শুভ ঘোষণা। তা ছাড়া আধুনিক গীতি কবিতার জন্মও এই সময়ে। পশ্চিমের প্রবল প্রভাব— যে প্রভাব আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা, রুচি, বিশ্বাসকে জয় ক'রে নিয়েছিল,— তারই মধ্যে বাঙ্গালীর সবটুকু প্রাণ ধরা দিল। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের আদর্শ, হোমারের ভঙ্গি, দান্তে ভার্জিল ট্যাসো মিলটনের কল্পনাকে জড়িয়ে এই সময় কবি শ্রীমধুসূদন রচনা করলেন আধুনিক বাঙলা মহাকাব্য। এই সময়ে বাঙ্গালী জীবনে নব জাগরণ দেখা দিল—আর তার ফলে বাঙ্গালী জেগে উঠল এবং তারই প্রবল প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হ ল নব বাঙলা সাহিত্যে।

বাঙলা সাহিত্যের সূচনাকালের যে সব রচনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে, তার অধিকাংশই বাঙলার মধ্যযুগকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল। সাহিত্যে বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের দিক থেকে গতানুগতিকতার পথ ছেড়ে নতুন-ধারার প্রবর্তনে আধুনিকতার যাত্রা সুরু হয়। আধুনিকতার কোন নির্দিষ্ট ঝোঁক আছে ব'লে সবসময় স্বীকার করা সম্ভব নয়। কারণ বাস্তবমুখিনতা ও সমাজচেতনাই আধুনিকতার বড় কথা বা একমাত্র লক্ষণ নয়।

সাহিত্যে প্রত্যেক কালেরই একটা বিশের রূপ থাকে। যেমন দেখি এলিজাবেথীয় যুগের সাহিত্যে আর ভিক্টোরীয় যুগের সাহিত্য। তাইতো হেনরী জেম্‌স্‌কে ব'লতে শুনি "The roaring rushing world seems to myself with its brutal and vulgar racket all the while a less and less enticing place for living in." অর্থাৎ তিনি যেন বলতে চাইছেন যে, দেখতে পাচ্ছ না—সমাজ জীবনে ও সভ্যতায় ভাঙন ধরেছে! সুস্পষ্ট ফাটল দেখতে পাচ্ছ না বর্তমান সভ্যতার ভিত্তিমূলে! অনেক দেশ অনেক জাতিই কি এই ভাঙ্গনের মুখে হারিয়ে যাবে না! তাই তিনি নিরুপায় হ'য়ে মুক্তির সন্ধানে ছুটেছেন অতীতের মধ্যে। এরপর বার্ণার্ড শ এলেন,—ইনি সেক্‌স্‌পীয়র, ভল্‌টেয়ার, গ্যেটে, টলষ্টয়, রবীন্দ্রনাথ ও

রোমাঁ্যা রোঁলাঁদেরই সমগোত্রীয়। তাঁর সমগ্র রচনায় life force ও তাঁর ধারণাগত primordial will বা আদি ইচ্ছা—যার অভিব্যক্তিস্বরূপ এই জগৎ ও সভ্যতা ব'লে তিনি ব্যক্ত ক'রেছেন তা কোন নির্দিষ্টকালের সাহিত্য নয়—কারণ এ সাহিত্যে নেই নির্দিষ্ট কালের বা যুগের সমস্যা। জেম্‌স জয়েস ও টি, এস, এলিয়টয়ের কাছে এ জগত সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন রূপে ধরা দিয়েছে। একজন দেখেছেন সুন্দর পৃথিবীকে, আরেকজন দেখেছেন শুধু তার ধ্বংসস্তুপকে। Waste Land-এর পরিবেষ্টনী থেকে মুক্তি চাইতে গিয়ে এলিয়টের কণ্ঠে উদ্গীত হ'য়েছে—"Shantih, Shantih.Shantih"। এর পর এলেন ডি. এইচ. লরেন্স তাঁর প্যাগান ধর্ম নিয়ে। নর-নারীর যৌন সম্পর্ক বহুকাল থেকে সাহিত্যের উপজীব্য হলেও তাঁর প্যাগান মনোভাবের সাহায্যে তা আদিযুগের কামনাতে স্থান পেল। তাই "The Lady Chatterley's Lover"-এ ডি, এইচ, লরেন্সেরই মন-গড়া কতগুলি কথা স্থান পেয়েছে। তারপর পাই ভার্জিনিয়া উল্‌ফকে, এজরা পৌণ্ডকে, উইলিয়ম বাট্‌লার ইয়েটস্‌কে। এঁদের মধ্যে এজরা পৌণ্ড্ জগৎটাকে টি. সি এলিয়টের মত Waste Land হিসাবেও দেখেননি—ভার্জিনিয়া উল্‌ফের মতো শিল্পীর মনোভাব নিয়েও দেখেননি। তিনি দেখেছিলেন—ফ্যাসিবাদ আর কনফুশীয় নৈতিকতা দিয়েই যেন এ পৃথিবী ঘেরা রয়েছে।

অলডুস হাক্সলে অধ্যাত্মবাদী ও বেদান্তবাদী। ভারতীয় বেদান্তদর্শনকে প্রতিফলিত করার প্রয়াস পেয়েছেন তাঁর সাহিত্যে। এর পরই পাই—ই, এম, ফরষ্টার, উইলিয়ম সমারসেট মম, গ্রাহাম গ্রীণ্, জে বি প্রিষ্টলী প্রভৃতি প্রায় থিয়োজফিষ্টদের। ইংরেজী সাহিত্যের প্রলেটারিয়ান লেখক হাওয়ার্ড স্প্রিং, আর্থার কয়েশলার, ষ্টিফেন স্পেণ্ডার, ডব্লু, বি. অডেন প্রভৃতি মার্কসবাদী ছিলেন। তাই তাঁদের সাহিত্যে পড়েছিল বুর্জোয়া সমাজের কালো ছায়া। তাঁরা মৃত্যুকে দেখেছেন নর্তক হিসাবে।

আমেরিকান সাহিত্যিক গোষ্ঠীর মধ্যে হুইটম্যান, এডগার এলেন পো, এমারসন, লংফেলো, হেনরী জেমস্, পার্ল বাক, শেরউড এ্যাণ্ডারসন, আরনেষ্ট হেমিংওয়ের নাম সর্বাগ্রে আগে মনে পড়ে—তারপরই হেন্‌রী মিলার, রবার্ট ডানকান, টমাস পার্কিনসনের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়।

হুইটম্যান যেখানে জনতার কবি, এডগার এলেন পো সেখানে কাব্যরস পিপাসু, দার্শনিক ও শিল্পী কবি। এঁরা সকলেই বাস্তববাদী ছিলেন,—তাই

তাঁরা কল্পনাকে, ভাবধারাকে সীমায়িত করেননি,—সুদূরতায় বা লোকোত্তরতায়ও এগোতে দেন নি। অনুভূতিকে তাঁরা নিছক ব্যবহারিক ভাবেই গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যে সকল সাহিত্য রচিত হয়েছে তার মধ্যে হেনরী মিলারের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নৈরাশ্যবাদ ছিল তখনকার সাহিত্যিকদের একমাত্র গ্রাহ্য রস। মিলারে রচনায় তার অবিরল দৃষ্টান্ত পাই।

রুশ সাহিত্যের মধ্যে টলষ্টয়, টুর্গেনেভ, ডষ্টয়েফস্কী, হেব, আন্দ্রেয়েভ, বুনিন, গোর্কী প্রভৃতির রচনার দৃষ্টিভঙ্গী অতিবাস্তব। তবে গোর্কী ছাড়া আর কেউই রোমান্টিকতা থেকে একেবারে বিমুক্ত হ'তে পারেন নি। সোভিয়েট বিপ্লব সৃষ্টি করার পক্ষে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যিকদের দান অনেকখানি। পুস্কিন, গোগোল, টলষ্টয়, ডষ্টয়েফস্কী প্রভৃতির রচনায় বিপ্লবের বীজ উপ্ত ছিল। বিপ্লবোত্তর যুগে ভেরেসাত্রভ, ওলিওশা, মিখাইল শলখভ্, ফাদেয়েভ্ প্রভৃতির রচনা কম্যুনিজম্-উদ্ভূত ব'লে অতিবাস্তব আখ্যা পেতে পারে।

জার্মান সাহিত্য আলোচনা করতে গিয়ে যার যাঁর নাম সর্বপ্রথমে মনে পড়ে—তিনি হলেন গ্যেটে। জার্মান সাহিত্যের নবযুগ সুরু হয়েছিল তাঁরই রচনার মাধ্যমে। সাহিত্য-সংস্কৃতি, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পে জার্মানী—রাজনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল—কিন্তু তৃতীয় রাইখের পতনের সঙ্গে সঙ্গে জার্মানীতে যে অবসাদ নেমে আসে তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মান সাহিত্যেও সুপরিস্ফুট। জার্মানীর নাৎসী আমলে অনেক সাহিত্যিকই নাৎসী আদর্শের পরিপোষক ছিলেন, তাঁদের লেখার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে নাৎসী ভাবধারা। কিন্তু জার্মানীর পরাজয়ের পর পুরাতন নাৎসীবাদী লেখকেরা কেউ কেউ হয়ে পড়েন 'হতাশ-বাদী।'—আবার কেউ কেউ বা বিপরীতপন্থী মার্কস্‌বাদী। চিরন্তন জার্মানীর ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করে গ্যেটে, শিলার, টমাস ম্যান প্রভৃতির মতো বিশ্ববরেণ্য লেখকের পুনরাবির্ভাব ঘটলে জার্মান সাহিত্য আবার হয়ত বিশ্ব-সাহিত্যসভায় স্থান নিতে পারবে। তবে পরের দিকের লেখকদের মধ্যে রেমার্ক, হারমান স্থডারমান, ষ্টিফান জর্জ, রাইনার মারিয়া রিলকে, গাহার্ট হাউপৎম্যান, ফ্রান্ৎস্ ভেরকেল, ফ্রান্ৎস্ কাফ্‌কা, হারমান হাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাসে কি পুরানো কি নতুন যুগে—রেঁামাঁ

রোলাঁর বিশেষভাবে নাম স্মরণীয়। তাঁর আগেও ব্যালজাক, মোপাঁশা, আনাতোল ফ্রাঁস প্রভৃতি বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিকদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে ও জীবন জগতের নানা সমস্যার সম্মুখীন হ'য়ে আত্ম-অনুসন্ধান ও মানবচরিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে রোলাঁর সাহিত্য-প্রতিভা প্রকাশ লাভ করে। তাই তাঁর রচিত "জঁা ক্রিস্তফ" সর্বজনগ্রাহ্য ও সর্বজন সমাদৃত। রামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর আদর্শও তিনি জীবনে গ্রহণ করেন। রোমঁ্যা রোলা শিল্পী, তাঁর নায়ক জঁা ক্রিস্তফ্ও শিল্পী—তাঁর শিল্পীমনই পরিপূর্ণতা খুঁজেছে বিশ্বপ্রাণতায়, মানবতায় আর ঐশ্বরিক ব্যাপকতায়। এর পর সময়ের ধারাক্রমে যে সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকের নাম করতে হয় তিনি হলেন মার্শেল প্রুস্ত্। ব্যক্তিগত মনের পটভূমিতে আঁকা যুগোপযোগী ফরাসী রাষ্ট্র ও সমাজজীবনের পরিণতির ছবিরূপে মুখ্যত প্রতীয়মান হ'লেও লেখকের নিজস্ব সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিতৃষ্ণা, ঘাত-প্রতিঘাত, তৃপ্তি ব্যর্থতার কথাই তিনি লিখেছেন। প্রুস্তের সমসাময়িক আঁদ্রে জীদ, রেনা, সিডনি, কোলেৎ, মেরিয়াক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকবৃন্দ। এর পরেই রোজে মার্তাঁ, দ্যুগারের রচনার সুস্পষ্ট বাস্তবতা নতুন আঙ্গিক এবং সাবলীলতার জন্যে পাঠক সমাজের কাছে খুবই প্রিয় হয়। আদ্রেঁ মুরোয়া, লুই আরাগঁ, লা রোশেল, পল নি জঁা, জুলিওঁ গ্রীণ—প্রভৃতির লেখা প্রলেটারিয়ান ও মার্কসবাদী হলেও অনেকের মতে ফ্যাসিজমের পক্ষই বেশী সমর্থন করেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সংঘাতে ও ফ্যাসিজমের প্রভাবে অনেক সাহিত্যিক শেষে মার্কসবাদের দিকেই ঝুঁকে পড়েন। এঁদের মধ্যে সাঁ-সঁ, আরাগঁ, মার্ল প্রভৃতির নাম স্মরণ-যোগ্য। যুদ্ধবর্তী সময়ে শার্তের রচনায় আমরা পেয়েছি মাটির পৃথিবীতে মানবের মুক্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের দাবী।

এবার আমাদের প্রাচ্য সাহিত্যের কয়েকটি বিশেষ ধারার আলোচনা করা করা যাক। প্রাচ্য সাহিত্য প্রধানত যে কয়টি ভাগে বিভক্ত হয়েছে, তার মধ্যে উর্দু সাহিত্য একটি উল্লেখযোগ্য বিভাগ। উর্দু সাহিত্যের ঐতিহ্য বা tradition খুব বেশি দিনের নয়। উর্দু ভাষার বয়স প্রায় দু'শ বছরের মতো। তবে সময় ব্যাপ্তির তারতম্য থাকলেও বাংলা ও উর্দু সাহিত্য একই ধারা অনুসরণ ক'রে যে পরিণতিতে এসে পৌচেছে—সেখানে এই উভয় সাহিত্যই সমান উৎকর্ষের দাবী ক'রতে পারে। প্রথম দিকে কাব্য-সাহিত্যের টেকনিক পরিত্যাগ ক'রে এই উভয় সাহিত্যই কাহিনী রচনায়

গল্পভঙ্গির আশ্রয় নিয়েছিল। উর্দু সাহিত্যের প্রসিদ্ধ লেখকদের মধ্যে আবদুল হালিম শারার, নাজির আহ্মেদ, মুন্সি সাজ্জাদ হোসেন, প্রেমচন্দ্রের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ ক'রতে হয়। অধিকাংশ উর্দু সাহিত্যই সমাজ জীবনের চিত্র নিয়ে রচিত। অধিকাংশই পর্দা প্রথা, নিপীড়িতা নারী, ধর্মের গোঁড়ামি, পাশ্চাত্ত্য আবহাওয়ার কুপ্রভাব, সামাজিক ত্রুটিবিচ্যুতি ইত্যাদি প্রশ্ন ও সমস্যার অবতারণা ক'রেছেন। রসিদ্ উল্ খৈরী, মহম্মদী বেগম, সুদর্শন, হায়াতউল্লা আনসারী, আবিদ আলি, নিয়াজ ফতেপুরী, মির্জা মহম্মদ সৈদ, সাজ্জাদ জাহির, কাজি আবদুল গফুর—পরের দিকের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক গোষ্ঠী। প্রেম, সমাজ, নীতি ইত্যাদির গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে তাঁদের বিদ্রোহ ঘোষিত হ'য়েছে।

আমাদের বাংলা সাহিত্য ভারতীয় ভাবধারারই ক্রমবিকাশের ফল। বাংলা সাহিত্যকে প্রধানত যে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়, তার মধ্যে তিনটি ভাগ বিশেষ ভাবে আলোচ্য এই তিনটি ভাল হ'লো বৈষ্ণব বাদ (চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি), মিষ্টিসিজম বা জীবন-রহস্যবাদ এবং জাতীয়তাবাদ।

পুরানো যুগের ভক্তিবাদের সঙ্গে জীবন-রহস্যবাদ এক সূত্রে বাঁধা ছিল। যে যুগে পাশ্চাত্ত্যে হ্যামলেট, ম্যাকবেথ প্রভৃতি রচিত হচ্ছে—বাংলা দেশে তখন মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী আর শাক্ত পদাবলীর ছড়াছড়ি। পাশ্চাত্ত্যে চলছিল ক্রমওয়েল যুগের আধুনিক সাহিত্য চর্চা, আর আমাদের সাহিত্যে বাজছিল মেঠো সুরে রাখালিয়া বাঁশী। সাহিত্য রচনায় প্রথম কিছুটা নতুনত্বের ছাপ পাই ভারতচন্দ্রের রচনায়। বাংলাদেশের অন্ত্য মধ্য যুগের সমাজবিকৃতির রূপটি দেখতে পেলাম ভারতচন্দ্রের বিখ্যাত রচনা 'বিদ্যাসুন্দরে'। ভারতচন্দ্র ছিলেন যুগন্ধর সাহিত্যিক—কিন্তু তিনিও কালের প্রভাবকে এড়াতে পারেননি। তাঁর রচনাপাঠে স্বভাবতই তদানীন্তন কালের সমাজের রুচি-বিকৃতির কথা আমাদের চোখে পড়ে। তাঁর সময়েই রামপ্রসাদের আবির্ভাব ঘটে। তাঁর কণ্ঠে শুনতে পাই—

"মন তুমি কৃষি কাজ জাননা—
এমন মানব জমি রইলো পতিত
আবাদ ক'রলে ফলতো সোনা।"

এই আক্ষেপ বাঙালী জাতিরই আক্ষেপ।

উনবিংশ শতাব্দীর শুভ প্রভাতে এলেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রঙ্গলাল ও

মাইকেল মধুসূদন। একদিন মেকলে বলেছিলেন যে যারা বিজিত, তাদের বিজয়ীর সাহিত্যে দীক্ষিত হতে হবে। এক কথায় বিজিত হারাবে তার বৈশিষ্ট্য —ভুলবে তার ঐতিহ্যকে। কিন্তু আমাদের দেশে পরাধীনতার অন্তরালে সে বাণীর কোন প্রতিধ্বনি ওঠেনি। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাকে গ্রহণ করেও বাঙালী তার ঐতিহ্যকে ভোলেনি। এর কিছুদিন পরই কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্ত্য সর্বত্রই রচিত হ'তে থাকে মানবীয় অনুভূতিতে গড়া সাহিত্য। তাই পাশ্চাত্ত্যে যখন চলছিল এমিলি জোলার 'নানার' চরিত্র আলোচনা, তার কাছাকাছি সময়ে নানা নতুন আন্দোলন আলোড়নের সঙ্গে তখন বাঙলাদেশেও চ'লেছে নতুন ব্রাহ্মধর্মের প্রচার। মানুষ এরপর স্থূল থেকে সূক্ষ্মের দিকে চ'লে যাচ্ছে, নিজের জীবনের সঙ্গে ভগবানকে মিশিয়ে নিয়ে তাঁকে একান্ত আপনার জেনে ভালবাসছে। মানুষের মনের সেই সূক্ষ্ম অনুভূতি এসে আশ্রয় নিল রবীন্দ্র কাব্য ও সাহিত্যে। বহিরঙ্গের ও অন্তরঙ্গের মিলন ঘটিয়ে কবিচিত্ত তৃপ্তি লাভ করেছে কাব্যলোকে। তাই রবীন্দ্রনাথের যাত্রা কখনও মর্ত্যলোক থেকে স্বর্গলোকে কখনও বা স্বর্গলোক থেকে মর্ত্যলোকে।

এক শতাব্দীর ধর্ম বা আবেদন আরেক শতাব্দীর সঙ্গে মেলে না। তার কারণ সমাজ পরিবেশ মানব সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে এসে বদলে যায়,—ফলে সেই সমাজের ছাপ সেই যুগের সাহিত্যের মধ্যে পড়ে। জীবনের মধ্যে যেমন কল্পনা আছে, তেমনি জড় বাস্তবও আছে। মানুষের কল্পনা জীবনকে অনেকটা রসিয়ে দেয় ব'লেই জীবনকে সুন্দর করে তোলার জন্যে মানুষের এত প্রয়াস—এত ব্যাকুলতা। এই সযত্ন প্রয়াসই সাহিত্যকে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যায়।

য়ুরোপের বুকে দেখা দিল প্রথম মহাযুদ্ধ। যুদ্ধের ফলে য়ুরোপীয় সমাজের চিন্তা-ধারার আমূল পরিবর্তন হ'ল। যে সাহিত্যে এই চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটেছে—সে সাহিত্যরই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তাই দেখি, মধু-বঙ্কিমের সাহিত্য-লোকে বিচরণ করেছে আমাদের অভিজাত আর মধ্যবিত্ত শ্রেণী। শরৎচন্দ্র এগিয়ে এসে শোনালেন নিপীড়িত সমাজের মর্মব্যথা। সেই পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ ক'রে শরৎচন্দ্রের আগে পর্যন্ত—কেউ যেন এই সমাজের মর্মকথা এত স্পষ্ট এত সুন্দর ক'রে বলেন নি। পরের দিকের রচনাতেও দেখি যন্ত্রযুগের অভাবগ্রস্ত দরিদ্রজীবনের সার্থক মর্মস্পর্শী চিত্র। প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধ সান্যাল, বিভূতিভূষণ

বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, সরোজ রায়চৌধুরী, তারাশঙ্কর, সুবোধ ঘোষ, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকে বাঙলার সমাজ-সংসারের নানাদিক—নানাসমস্যা নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন। এঁরা সামাজিক বিবর্তনকে বিশ্লেষণ করে দেখাবার জন্যে অধিকতর উৎসুক। আজকের দিনে টলষ্টয়ের সাহিত্যের ধর্মবুদ্ধি, আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ মানবিকতার উচ্চাদর্শ, মানবচিত্তকে ততখানি হয়ত অভিভূত করবে না; মানুষ হয়ত এখন 'পো'-সাহিত্যের জীবন রহস্যের অর্থ অনুসন্ধান করে না, অথবা যোকভের সাহিত্যের জীবনকে বুঝতে চায় না, কিংবা মোপাসাঁর সাহিত্যের জীবনের অসঙ্গতির অভিজ্ঞতার সঞ্চয় ক'রেও বিস্ময়াপন্ন হয় না। গণতন্ত্র ও মধ্যবিত্ত জীবনাদর্শ আজকের সাহিত্যের বিষয়বস্তু। জীবনের গভীর নৈরাশ্য ও অবক্ষয় আজকের মানুষকে অতীতের স্বপ্নালুতার ভাবলোক থেকে কঠোর বাস্তবের ধূলি ধূসরিত পথে টেনে এনেছে। তাই অতীত সাহিত্যের সঙ্গে এ যুগের সাহিত্যের বিরাট ব্যবধান। মার্কিন কবি হুইট্‌ম্যানের বাণীর প্রতিধ্বনি আজকের সাহিত্যে শুনতে পাই—

A little while we die,
    Shall not life thrive as it may,
For no man under the sky
    Live thrice out-living his day!

মানুষ চায় অসীমের মাঝে সীমার সুর। অপরূপের মাঝে রূপের পরশ। তাই জীবন-বোধের অপূর্ণতাকে বিকাশ করার জন্য সাহিত্যের প্রয়োজন। সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য সাধনা,—আর এ সাধনা যখন সিদ্ধির পথে এগোয়, তখন সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের নিবিড় সংযোগ ঘটে। তবে বাস্তব জীবনের চিত্রাঙ্কণে দেশ-কাল ভেদ থাকতে পারে, কিন্তু মনের ধর্মকে তো কখনও অস্বীকার করা যায় না। তা না হ'লে কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'-এর প্রেম-প্রীতি অথবা ম্যাক্সিম গর্কীর "মাদার"-এর মাতৃস্নেহ আমাদের অভিভূত করতে পারত না।

দেশে দেশে সামাজিক মানুষের মধ্যে নানা বৈষম্য থাকতে পারে। কিন্তু মহৎ সাহিত্য দেশকালের গণ্ডী ভেদ ক'রে বিশ্বমানবের রসপিপাসু চিত্তে আপনার চিরস্থায়ী আসন লাভ করে। এই সাহিত্যের সঙ্গে অতীত-বর্তমানের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে—এবং তার ভিত্তিতেই সে ভবিষ্যতের হৃদয়ে আসন্ন

পাবার দাবি রাখে। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মৌলিকতা অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'সাহিত্য যখন অক্লান্ত শক্তিমান থাকে তখন সে চিরন্তনকেই নূতন করে প্রকাশ করতে পারে। এই তার কাজ। একেই বলে ওরিজিন্যালিটি। যখনি সে আজগবিকে নিয়ে গলা ভেঙে মুখ লাল করে, কপালের শিরাগুলোকে ফুলিয়ে তুলে, ওরিজিন্যাল হতে চেষ্টা করে. তখনি বোঝা যায়, শেষ দশায় এসেছে।'

কালিদাসের মেঘদূত, গ্যেটের ফাউষ্ট, হোমারের ইলিয়ড, অডেসি সর্বকালের সর্বদেশের মানুষের মন হরণ করেছে। বিভিন্ন দেশের সাহিত্যিকের অভিজ্ঞতা দেশ বিশেষের বিভিন্ন পরিবেশের মাধ্যমেই গ'ড়ে ওঠে। নিজস্ব সমাজ প্রভাবই প্রধানত সাহিত্যের নিয়ামক। সাহিত্যের সত্য ও জীবনের সত্যের পার্থক্য জানতে গিয়ে- আমরা প্রথমেই দেখতে পাই—সাংসারিক জীবের অপূর্ণতার শেষ নেই। মানুষের জীবনে চাওয়া পাওয়ার মধ্যে রয়েছে—চিরন্তন অসহযোগ আন্দোলন। সে যা চায় না, পাওয়ার ঘরে তার বোঝা পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে; আর যা পায়, তা সে চায় না। এই চাওয়া-পাওয়ার অসমতার অন্তরালেই জীবনের ট্র্যাজেডি রহস্যঘন ভাবে অবস্থান করে। এই ট্র্যাজেডিই মানুষকে প্রেরণা দেয়—এই ট্র্যাজেডিই জীবনকে সুন্দর ক'রে গ'ড়ে তোলে।

মানুষ গঠন করেছে সমাজ, আর সে সমাজের ছায়া পড়েছে মানুষের মনে, সমাজ সচেতন সাহিত্যিকের রচনায়। মানবজীবনকে সাহিত্যই নিত্যকালের ক'রে বাঁচিয়ে রাখে। যে পঞ্চভৌতিক দেহ ধূলায় মিশে যায়—তার প্রাণশক্তিকে চিরসজীব করে রাখে সাহিত্য। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'মানুষ সাহিত্য সৃষ্টি করে আপনাকে চিরজীবী করার জন্য। যুগ ও কালের শত রূপান্তরের বাধা অতিক্রম করিয়া তাহার ভাবনা যাহাতে ভবিষ্যতে বাঁচিয়া থাকে, ইহাই তাহার প্রধানতম অন্তর কামনা। সাহিত্য সেই কামনা প্রভূত পরিমাণে রূপায়িত করে এবং মরলোকে ক্ষণজন্মা পুরুষদের ললাটে অমরত্বের জয়তিলক অঙ্কিত করে।'

হ্যুগো, টলষ্টয়, ইবসেন, গর্কি, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র প্রভৃতি প্রতিভাধর সাহিত্যশিল্পীগণ সাহিত্য সৃষ্টির দ্বারা মানব সমাজকে তাঁদের জীবনাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করেছেন। পরার্থপর মনুষ্যত্বের বাণী প্রচারে শেলী, ব্রাউনিঙ, টলষ্টয়, জোহানবয়েরের নাম উল্লেখযোগ্য। এইসব সাহিত্যশিল্পী

মানবজীবনকে ভাবী-কালের পথে সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত ক'রে স্বর্গের স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন। সুতরাং দেখা যায় সাহিত্য অনাগত মানবজীবনকে স্বাগত সম্ভাষণ ক'রে তার ঘরসংসারও রচনা ক'রে দেয়।

সত্যকে আবিষ্কার করাই সাহিত্যের একমাত্র ধর্ম নয়, সত্যকে রূপ দেওয়াতেই তার সিদ্ধি। সাহিত্যের প্রকাশ ঘটেছে বস্তুর রূপ রসের উপলব্ধির যথার্থ প্রকাশ ও অভিব্যক্তির জন্যে। স্রষ্টার বিচিত্র অনুভূতির রূপায়ণে ও ভাবের ব্যঞ্জনায়, জীবন ও জগৎ সাহিত্যের মধ্যে সার্থকভাবে প্রকাশ লাভ করেছে। মানব-মনের বৈচিত্র্যের সঙ্গে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে— অনুভূতিকে আনন্দ কল্যাণের শিখরে অথবা সার্বভৌম জীবন-তত্ত্বের সোপানে উত্তীর্ণ করিয়ে দেওয়াই সাহিত্যের প্রধান কাজ।

প্রত্যেক জাগ্রত মানবাত্মার কাছে জীবন একটি বিপুল সমস্যা। অন্তর ও বাইরের সুসংগত মিলন বা সামঞ্জস্য সন্ধান করাই জাগ্রত মানবাত্মার ধর্ম। সব সময়ই সে অপূর্ব জীবনাদর্শের তথ্য ও তত্ত্ব জানতে চায়, পেতে চায়। আর এই চাওয়া-পাওয়ার চরম পরিণতি বা প্রকাশ সাহিত্যে পাওয়া যায়।

পৃথিবীতে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সভ্যতার পথে অনেকখানি এগিয়ে যায়। জীবনকে সুন্দর করবার জন্যেই সে সৃষ্টি করেছে শিল্প, সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে! সাহিত্য মানুষের সেই সাধনা-সৃষ্ট সভ্যতার একমাত্র সুযোগ্য বাহন। এরই জন্যে ডক্টর ব্রেজার বলেছিলেন, "To live and to cause to live, to eat food and to beget children, these were the primary wants of men in the past, and they will be the primary wants of men in future. Other things may be added to enrich and beautify human life, but unless these wants are first satisfied, humanity must cease to exist."

জীবনকে সুন্দর ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত করার জন্যে সাহিত্যের দান অপরিসীম। বাংলার বিখ্যাত সাহিত্যশিল্পীর কথার প্রতিধ্বনি ক'রে বলতে হয়, "সাহিত্য সত্য, সুন্দর ও শিবের উপাসক।"

প্রবন্ধ শিল্প :

সাহিত্যের বিরাট ভাণ্ডারে শুধু কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটকই নয়—দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতিও স্থান পেয়েছে। তবুও সবাই লক্ষ্য করবেন যে, শেষোক্ত বিষয়গুলি বিশুদ্ধ সাহিত্যের পঙ্‌ক্তিতে তেমন সমাদর লাভ করে না। কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতিকেই আমরা বিশুদ্ধ সাহিত্য ব'লে গ্রহণ ক'রে এসেছি। তার কারণও আছে। অনেকের মতে, ইতিহাস দর্শন প্রভৃতিতে ঐতিহাসিক বা দার্শনিকের ব্যক্তিগত দিকের পরিচয় তেমন কিছু থাকে না। বরং ব্যক্তিত্বের বিকাশ যত কম ঘটবে ততই তাদের কৌলীন্য বজায় থাকে। কিন্তু যে বিষয়গুলিকে আমরা যথার্থ সাহিত্য বলে গ্রহণ করি তার মধ্যে আমরা রচয়িতার পরিচয় খুঁজে বা'র করতে চেষ্টা করি। সৃষ্টির মধ্যে আমরা যেমন স্রষ্টার বিশেষত্বটাই বড়ো করে দেখি—সাহিত্যের মধ্যেও আমরা তেমনি শিল্পীর ব্যক্তিত্বের প্রকাশকে বড়ো করে দেখি।

বাজার থেকে নানা রকমের আনাজ, মাছ প্রভৃতি এলো—কিন্তু যতক্ষণ না তাদের ভালো ক'রে কেটেকুটে নিয়ে রুচিকর ক'রে খাবার হিসেবে রান্না করা হচ্ছে—ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের কোনো সার্থকতা নেই। আবার এও অনেক সময় দেখা যায় যে, ব্যক্তিবিশেষের রান্না করা খাবার মুখে দিয়েই আমরা বলি, 'আজ নিশ্চয় অমুক– এই খাবার তৈরি করেছেন—রান্নার আস্বাদেই বুঝতে পারছি।' যতক্ষণ সব বিছিন্ন অবস্থায় থাকে ততক্ষণ আমরা তার বিশেষ কোনো পরিচয় পাই না—আর যখন সব মিলে একটি বিশেষ খাবারের রূপ পায়—তখন আমরা তার মধ্যে নতুন একটা কিছু পেলাম। যিনি খাবার তৈরি করেছেন তাঁর তৈরি করার বিশেষত্বও সেই সঙ্গে আমাদের কাছে প্রকাশ পেল।

সাহিত্যে আমরা রচয়িতার ব্যক্তিত্বের প্রকাশকে খুঁজি। তার বিষয়বস্তু কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা বিচার করার সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্যিক বিষয়বস্তুকে কি ভাব ও ভঙ্গিতে প্রকাশ করছেন তাও আমরা লক্ষ্য করি। সাহিত্যিক যে বিষয়বস্তু গ্রহণ করলেন—তার গুরুত্ব বা লঘুত্ব কতখানি—এই আলোচনার চেয়েও তিনি কিভাবে বিষয়বস্তুটিকে রূপদান করছেন—সেই কথাটিই যেন প্রধান হয়ে ওঠে। খাঁটি শিল্পীর পরিচয় ওইখানেই। ভোরের আলো, গোধূলীর রক্তচ্ছটা, পাখীর কাকলী, নদীর কলতান, মেঘমেদুর দিনের রূপ

—সব কালেই এক। কুঁড়ি, ফুল, নবকিশলয়, ঝরাপাতা প্রভৃতির আকৃতি ও প্রকৃতির তেমন কোনো পার্থক্য নেই। নরনারী জীবনের প্রেম-মিলন-বিরহের ধারাও প্রাচীনদিন থেকে একই ভাবে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। এসব ব্যাপার প্রাচীন যুগেও যে ভাবে দেখা দিয়েছে—এখনও সে ভাবেই দেখা দেয়। কিন্তু এরই আড়ালে যে ভাবসত্যটি রয়েছে—নিত্যকালের শিল্পী প্রাণ তাকে নিত্য নতুন করে খুঁজে পেয়েছেন—এবং তারই উদ্দেশ্যে বলেছেন—'ওগো মধুর প্রহর শেষ হয়ে এলেও তোমার শেষ যে কোথাও নেই'। শিল্পী সেই রূপকে আমাদের সামনে অপরূপ করে তুলে ধরেছেন—এমন কি নিতান্ত তুচ্ছকেও —অভাবনীয় সুন্দররূপ দান করেছেন। তাই ব্যাঙও 'দাদুরি' রূপে বর্ষার কাব্যকে অপূর্ব মাধুর্য মণ্ডিত ক'রে তোলে—তৃণের প্রাণের বেদনাও কবির কাব্যে মূর্ত হয়ে ওঠে। তাই আমাদের সাহিত্যে বর্ষা আজও পুরানো হয়নি —প্রেমের অনির্বাণ দীপশিখা আজও উজ্জ্বল অম্লান রয়েছে। শিল্পীর ব্যক্তিত্বের মাধ্যমেই—সাহিত্যে চিরপুরাতন যুগে যুগে চিরনতুন হয়ে ওঠে। ব্যক্তির প্রকাশ ঘটে বলেই সাহিত্যে রসের অভাব কখনও ঘটে না। সাহিত্যে শিল্পীর আত্মপ্রকাশই আমাদের কাম্য। তাই অনেক সময় দেখি, অনেক রচনা গুরুত্বপূর্ণ গবেষণামূলক হয়েও রসোত্তীর্ণ না হওয়ায়, শিল্পীর ব্যক্তিত্বের সার্থক প্রকাশ না ঘটায়—বিশুদ্ধ সাহিত্য পদবাচ্য হতে পারেনি।

সাহিত্যের নানা বিভাগের মধ্যে প্রবন্ধ নামক একটি বিভাগও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাহিত্যে পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধ কি—একে কতখানি সাহিত্য-মর্যাদা দেওয়া যায়—তা নিয়ে পণ্ডিতব্যক্তিরা নানা মত প্রকাশ করেছেন। প্রবন্ধ শিল্প পাশ্চাত্য জগতের রেনাশাঁসের একটি শুভ ফলস্বরূপ। প্রবন্ধের প্রথম শিল্পী মতাইন (Montaigne) রেনাশাঁসের একজন সার্থক প্রতিনিধি। আধুনিক সাহিত্যে প্রবন্ধ রচনা এতই প্রাধান্য লাভ করেছে যে, তার স্বরূপ ও মূল্য সম্বন্ধে আমাদের অবহিত থাকা প্রয়োজন। কিন্তু তার কোনো একটা বিশেষ সংজ্ঞা নিরূপণ করার যে প্রাথমিক কয়েকটি বাধা আছে তার মধ্যে প্রধান হ'ল —বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য ও রীতিভঙ্গির পার্থক্য। প্রবন্ধ সাহিত্য বা Essay literatureকে স্বতন্ত্র সাহিত্য শিল্প বলা যায় কিনা—সে সম্বন্ধেও অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন। জনৈক লেখক প্রায়ই বলতেন, 'কবিতা, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি যারা লিখতে পারে না—অথচ একটা কিছু না লিখলে নামও জাহির করা যায় না —তারাই শেষ পর্যন্ত প্রবন্ধ লেখার প্রয়াস পায়।' অর্থাৎ তাঁর মতে প্রবন্ধ

রচয়িতাকে original হ'তে হয় না—original লেখার জন্য মাথাও ঘামাতে হয় না—তাঁরা নানা লেখকের এবং নিজেদের মামুলী চিন্তাগুলিকে সমবেত ক'রে একটা যা-হোক আলোচনা জাতীয় লেখাকে প্রবন্ধ ব'লে প্রচার করেন। শুধু তিনি কেন—ইংরেজি সাহিত্যে প্রবন্ধ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে Crabbe বলেন 'The essay is the most popular mode of writing,…… it suits the writer who has neither talent nor inclination to pursue his inquiries farther, and……the generality of readers who are amused with variety and superficiality.'

প্রবন্ধ সাহিত্য সম্বন্ধে এইসব মতের সঙ্কীর্ণতা খুবই সুস্পষ্ট—এবং সব সময় গ্রহণযোগ্য নয়। শুধু অযোগ্য অপটু হাতের প্রবন্ধ রচনা সম্বন্ধে এই মন্তব্য আমরা মেনে নিতে পারি। কিন্তু সব প্রবন্ধ রচয়িতাই talent-বর্জিত নন। প্রবন্ধ-রচনার মৌলিকতা অনস্বীকার্য—তা শুধু কবিতা উপন্যাস নাটকেরই একচেটে নয়।

প্রবন্ধের স্বরূপ বিচার কি করে করা যায়—তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। ইংরাজি সাহিত্যে বেকনের প্রবন্ধগুলিকে জ্ঞানগর্ভ ভাবের সংক্ষিপ্ত প্রকাশ বলা যেতে পারে। অন্যদিকে ফরাসী সাহিত্যের মতাইনের (Montaigne) রচনাকে রস-প্রধান বলা যায়। এডিসনের প্রবন্ধে 'the thought is thin and diluted, and the tendency is now towards light didacticism and now towards personal gossip.' লকের 'Essay concerning Human Understanding—দার্শনিক তত্ত্বের ভারে ভারাক্রান্ত। ল্যামের প্রবন্ধ আর মেকলের প্রবন্ধ বিচার করে দেখলে দেখা যায়, একদিকে একজনের রচনায় স্বভাব সুকোমল হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ ঘটেছে—অন্যদিকে আরেকজনের রচনায় ঘটেছে বুদ্ধি-দীপ্ত গর্বিত হৃদয়ের প্রকাশ। প্রবন্ধ সম্বন্ধে কোনো সমালোচক বলেন—'As a form of literature, the essay is a composition of moderate length, usually in prose,which deals in an easy, cursory way with the external conditions of a subject, and in strictness, with that subject only as it affects the writer'. আবার ডাঃ জনসনের মতো বিখ্যাত প্রবন্ধকার ও পণ্ডিত বলেন যে, প্রবন্ধ 'is a loose sally of the mind, an irregular, undigested piece, not a regular and orderly composition'.

বর্তমান কালের প্রবন্ধ সাহিত্যের বিচারে ডাঃ জনসনের এই মত সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর irregularity কথাটি মেনে নিলেও ভাবনাসম্পর্ক-রহিত কথাটি মেনে নেওয়া যায় না। বিশেষ করে undigested কথাটি মতাইন,এডিসন, ল্যাম, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য নয়।

সেনেকার রচনাকেও (Epistles) বেকন 'essay' বলেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই মত অনেকেই গ্রহণ করেননি। তিনি নিজেই স্বীকার করেন যে 'the word is late,though the thing is ancient.' মতাইনই (Montaigne) এক ধরনের রচনার নামকরণের জন্যে এই essay শব্দটি ব্যবহার করেন। সেই essay ছিল এক ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা-সূচক রচনা—যেখানে কোনো বিষয়ের assay বা বিশ্লেষণই ছিল প্রধান কথা। এই শব্দটির অর্থের পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রেখে Oxford English Dictionary-তে প্রবন্ধ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—'a composition of modern length on any particular subject or branch of a subject…originally implying want of finish, but now said of a composition more or less elaborate in style, though limited in range.' কবি সমালোচক মোহিতলাল বলেন, 'সাহিত্যে ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের যতগুলি পন্থা আছে, তাহার মধ্যে এক হিসাবে ঐ Essayই উৎকৃষ্ট পন্থা। ..ইহাতে লেখক আমাদের সহিত একেবারে মুখামুখি কথা কহিতে পারেন।…আমি সাধারণ মানুষ হইলেও আমার যদি বলিবার মতো কিছু থাকে, তাহা যদি আমারই ভাবনা বা আন্তরিক অনুভূতি হয়, তবে তাহা প্রকাশ করিবারও একটি পন্থা চাই—Essay সেই রূপ একটি পন্থা।'

প্রবন্ধ-সাহিত্যের কয়েকটি বিশেষ লক্ষণের আলোচনা প্রয়োজন। অধ্যাপক মর্লি ইংরাজি প্রবন্ধের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—'The History of Essay writing in modern literature begins with Montaigne and then passes to Bacon. Each used the word 'essay' in its true sense as an assay or analysis of some subject of thought. Bacon's essay of life, generally in many forms, with full attention to its outward circumstances. Montaigne's essay was of the inner life of man as it was to be found in the one man's life that he knew.'

দু'জন বিখ্যাত লেখকের প্রবন্ধ রচনায় যে বাইরের দিক ও আন্তর দিকের প্রকাশ ঘটেছে তা অধ্যাপক মর্লির উক্তি থেকে আমরা বুঝতে পারি। প্রবন্ধের অন্যান্য লক্ষণগুলির কথা বলতে গিয়ে—প্রথমেই বলতে হয়, প্রবন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসা করা বা অধিকতর বিস্তার ঘটানোর কোনো অবকাশ নেই। প্রবন্ধ যেখানে বড়ো হয়েছে সেখানেই ইংরাজি 'essay' কথাটির পরিবর্তে Treatise বা Dessertation বলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, প্রবন্ধে শেষ কথা বলা সম্ভব নয়। কারণ আমরা জানি , প্রবন্ধে যে বিষয়ের অবতারণা ঘটানো হয়—তার গোড়া থেকেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে। কাজেই সেখানে ফলকথা কথা বলা সম্ভব নয়। তৃতীয়ত, সংক্ষিপ্ততা প্রবন্ধের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এক কথায় বলা যায়—প্রবন্ধ কখনও আকারে বড়ো হবে না। কথার বোঝা বাড়ালেই ভাব প্রকাশের ব্যাঘাত ঘটবে। কাজেই কোন বিষয়বস্তু গ্রহণ করা হ'ল এবং কতটা বাহুল্য বর্জিত হয়ে কিভাবে তা প্রকাশ পাচ্ছে—সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। যে বিষয়টি গ্রহণ করা হয়েছে—লেখক তাতেই নিজেকে নিবদ্ধ করে রাখবেন—এবং যতখানি বলছেন—তার মধ্যে কিছুটা সম্পূর্ণতার আভাস থাকতে পারে। চতুর্থত, প্রবন্ধে প্রবন্ধকারের স্বাধীনতা থাকা চাই এবং তাতে মামুলি বাঁধা নিয়মের-বেশ কিছুটা ব্যতিক্রমও ঘটতে পারে। দু'চারটি কথা স্বাধীনভাবে বলার ইচ্ছা থেকেই প্রবন্ধ শিল্প গ'ড়ে ওঠে। জনসন কথিত irregularity কিছুটা যে নেই তা নয়—সেই সঙ্গে 'want of finish'ও অনিবার্যভাবে থাকে। পঞ্চমত, প্রবন্ধের বিষয়বস্তু কি হবে—এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়—যে কোনো বিষয়ই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হ'তে পারে। তুচ্ছ ধূলিকণা থেকে বিরাট সৌরজগত—ক্ষুদ্র নুড়ি থেকে মানুষ—যে কোনো বিষয় নিয়েই প্রবন্ধ রচিত হ'তে পারে। ষষ্ঠত, বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, লেখক যেন নিজের মতটি জোর করে পাঠকের উপর চাপাতে না যান। কবিতা যেমন মনকে আকৃষ্ট করে—প্রবন্ধেরও ঠিক ওই ধরনের আকর্ষণ থাকা বাঞ্ছনীয়। সজীব বা তীক্ষ্ণ যাই হোক না কেন—যথাসম্ভব হালকা ভাবে বক্তব্য বিষয়টিকে উপস্থাপিত করতে হবে। কিন্তু 'হালকা' বলাতে কেউ যেন মনে না করেন যে তার মধ্যে চাপল্য থাকার কথা বলা হচ্ছে। বক্তব্য বিষয় যেন অতিরিক্ত গুরুর-গম্ভীর হয়ে না পড়ে—এবং আগেই বলেছি—লেখক যেন নিজের মত জোর ক'রে পাঠকের ঘাড়ে চাপিয়ে না দেন। সারগর্ভ উপদেশের পরিবর্তে অনুভূতি জাগিয়ে তোলাই প্রবন্ধের প্রধান দায়িত্ব।

তারপর প্রশ্ন আসে—প্রবন্ধে ব্যক্তির প্রভাব কতখানি থাকবে! প্রবন্ধের বিষয়বস্তু যা-ই হোক না কেন—প্রবন্ধে ব্যক্তিগত উপাদান অবশ্যই থাকবে। যথার্থ প্রবন্ধ সাহিত্য ব্যক্তিগত হতে বাধ্য গীতিকবিতায় যে আত্মপ্রকাশের কথা আমরা বলি—প্রবন্ধেও অনুরূপ ভাবটি থাকতে হবে। মতাইন তাঁর নিজের প্রবন্ধ আলোচনা প্রসঙ্গে এক জায়গায় বলেছেন যে, তাঁর প্রবন্ধগুলি লেখকের সঙ্গে সমপ্রকৃতি সম্পন্ন (consubstantial)। তিনি নিজেই বলেছেন যে তিনি নিজেকেই তাঁর রচনার বিষয় হিসাবে নির্বাচন করেছেন —কারণ একমাত্র নিজেকেই তিনি সার্থক ভাবে জানেন। একে কি আত্মাভিমান-বর্জিত অস্মিতা (egotism) বলা যায় না! বেকনের রচনাতেও দেখতে পাই—তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার দ্বারা যা প্রমাণিত নয়—তাকে তিনি কিছুতেই গ্রহণ করতে রাজী নন। ল্যাম্‌-এর ব্যাপারেই দেখা যায় যে, তিনি তাঁর রচনায় এমন সহজ সরল ও সরসভাবে নিজেকে প্রকাশ করেন—এমন ভাবে পাঠকদের সঙ্গে ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে কৌতুক করেন—যাতে মনে হয় তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে যেভাবে ব্যবহার করতেন—পাঠকদের সঙ্গেও যেন সেভাবেই ব্যবহার করছেন। মনে হয়, তিনি যেন মতাইনের মতোই বলতে পারেন 'I speak unto paper as unto the first man I meet'. ল্যাম-এর Essay of Elia তার উজ্জ্বল নিদর্শন।

এর পরেই আসে প্রবন্ধে অহংবোধ বা অহংজ্ঞানের কথা—একে ইংরাজিতে বলা হয়েছে egotism—যা অনেক প্রবন্ধকারের রচনাতেই পাওয়া যায়। তবে egotism মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে পাঠকের পক্ষে তা রুচিকর হয় না। নিজের বিষয় বলতে গেলেই যে অন্যায় হয় এ কথা কেউ বলবেন না। কারণ 'A modest truthful man speaks better about himself than about anything else and on that subject his speech is likely to be most profitable to his hearers. Certainly, there is no subject with which he is better acquainted and on which he has a better title to be heard.—এবং এই ধরনের egotism-এর মধ্যেই প্রবন্ধকারের রচনার চমৎকারিত্ব বিদ্যমান। কেবল 'the egotism that over-crows you is offensive. প্রবন্ধকার তাঁর নিজের ভাবনা চিন্তা পাঠকের সামনে তুলে ধরেন—কি ক'রে তাঁর মধ্যে ঐ ভাবনা-

চিন্তাগুলি এলো—তাও তিনি বলে দেন। পাঠকের কাছে তাঁর নিজের গোপন করার কিছুই নেই। তাঁর মনের সব দরজা জানালাই তিনি উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। পাঠকের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব গ'ড়ে ওঠে। রচয়িতার রসবোধ, মেজাজ বা হিউমার গাম্ভীর্য, কল্পনা, সংস্কার প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়েই পাঠক রচনার মধ্যে প্রবেশ-অধিকার লাভ করেন।

ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তর্কচ্ছলে এও বলা যেতে পারে যে, যখন আমরা কারও সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে তর্ক বা আলোচনা করতে থাকি তখন সেখানে নিজের মতটি প্রতিষ্ঠিত করবার একটি বিশেষ ঝোঁক দেখা দেয়। নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয় সম্বন্ধে কাউকে উপদেশ দিতে গেলে তো আর কথাই নেই। এই ধরনের আলোচনায় ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটলেও—সেখানে সহজ আনন্দের প্রকাশ ঘটে না। বরং সেখানে আত্মপ্রকাশের চেয়ে আত্মম্ভরিতাই বড়ো হ'য়ে ওঠে। আমরা এখানে সেই ধরনের প্রবন্ধের কথাই আলোচনা করছি—যা পড়তে পড়তে আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে লেখকের আন্তর-পরিচয়ও লাভ করি। সেখানে লেখকের কসরৎ, যুক্তি-প্রতিষ্ঠার অক্লান্ত প্রয়াস, বেশি জানার অহঙ্কার ও অকারণ গাম্ভীর্য নেই। সেখানে রচয়িতার মন যেন মন্তাইনের মতো বলে, 'I have had no consideration at all either to my service or to my glory,·· ··· I have dedicated it to the particular commodity of my kinsfolk and friends, so that, having lost me (which they must do shortly), they may therein recover some traits of my conditions and humours, and by that means preserve whole, and more life like, the knowledge they had of me······I desire therein to be viewed as I appear in my own genuine, simple and ordinary manner, without study and artifice : for it is myself I paint :······myself am the matter of my book' (The Begining of the English Essays).

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে প্রবন্ধকে Subjective ও Objective দুই ভাগে ভাগ ক'রে—তারও আবার নানা উপবিভাগ দেখানো হয়েছে। Subjetive প্রবন্ধের পর্যায়ে ব্যক্তিপ্রধান, গল্পচ্ছলে রচিত, পত্র-লেখার ছলে রচিত, সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ—আর Objective প্রবন্ধ রয়েছে উপদেশাত্মক বা নীতিগর্ভ,

বিজ্ঞানবিষয়ক, সামাজিক, চরিত্রপ্রধান প্রবন্ধ প্রভৃতি নানা উপবিভাগ আছে। এত ভাগ করা সত্ত্বেও খাঁটি প্রবন্ধ রচনা 'কোটিকে গোটিক' হয়। তাই তো রবার্ট লিন্ড্ বলেন—'As to what makes a good essay, I do not think anyone ever has discovered, or ever will discover, the recipe. It is a kind of lucky dip into experience or with fantasy—often into both. The ordinary essayist dips again and again, and seldom bring up anything worth showing to his neighbours. Lamb dipped again and again, and almost invariably came back with a parcel of treasure'. প্রবন্ধ রচনার নানা নিয়ম বেঁধে দেওয়া যেতে পারে। হয়ত নতুন প্রবন্ধ রচয়িতাদের এও বলে দেওয়া যেতে পারে যে, প্রবন্ধ রচনার সময় প্রকাশভঙ্গি, রসবোধ, স্থৈর্য, ধৈর্য, আত্মাভিমানশূন্য আত্মপ্রতিকৃতি অঙ্কন প্রভৃতির সার্থকতার দিকে তাঁদের সতর্কদৃষ্টি রাখতে হবে। কিন্তু ভাব-গভীরে ডুব দিতে না পারলে সবই ব্যর্থ হয়ে যায়। তাই যদি দেখি 'many essayists have written only one or two good essays, just as many poets have written only one or two good poems'—তাতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই।

বিজ্ঞানবিষয়ক, দর্শনবিষয়ক আলোচনাগুলিকে প্রবন্ধ বলা হলেও আমরা সাহিত্য-বিষয়ক রচনাকে যে হিসাবে প্রবন্ধ বলে থাকি—বিজ্ঞান-দর্শন বিষয়ক রচনাকে সেই বিচারে একই পর্যায়ভুক্ত করা যুক্তিযুক্ত হবে না। কেউ যদি বলেন বক্তব্য বিষয়ে সাহিত্য-সৌরভ (Literary flavour) থাকলেও কি হবে না! উত্তরে বলা যায়—না—তা হলেও নয়। কারণ সাহিত্য-গন্ধী অন্যবিষয়ক রচনা এবং সাহিত্যবিষয়ক রচনা এক নয়। শেষোক্ত ধরনের রচনায় বিষয়বস্তু বা গবেষণার ভার মুখ্য হয়ে ওঠে না—যেমন হয়নি রবীন্দ্রনাথের রচনায়। বিষয়বস্তুর সঙ্গে রচয়িতার নিজের ভাবনা-বেদনাকেও পাঠকের সামনে তুলে ধরা হয়। যেখানে বক্তব্যের সীমার ঊর্ধ্বেও একটি বিশেষ রসের আস্বাদ লাভ করা যায়— সেখানেই প্রবন্ধ যথার্থ শিল্প রূপ লাভ করে। বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক রচনাতেই এই শিল্পগুণ বর্তমান। 'একা', 'মানব মন' প্রভৃতি রচনায় আমরা তাঁর কবিমনের পরিচয় পাই।

প্রবন্ধ জাতীয় রচনায় মানব মনের সকল জিজ্ঞাসারই সমাধান হ'তে পারে। এই প্রবন্ধ সাহিত্যের মধ্যে অনেকে গীতি-মাধুর্যও খুঁজে পেয়েছেন।

অনেকে প্রবন্ধকারকে কবির সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রবন্ধের মধ্যে গীতিকবিতার (lyric) সাদৃশ্যও খুঁজে পেয়েছেন। খাটি প্রবন্ধকার কবির মতোই তার অভিমত স্বাধীন ভাবেই ব্যক্ত করেন। তত্ত্ব কথার ভারে প্রবন্ধকার তাঁর রচনাকে ভারাক্রান্ত করেন না—পাঠকেও পীড়িত করেন না। কবির কাব্যে যতখানি তত্ত্ব থাকে সার্থক প্রবন্ধকারের রচনায় তার বেশি থাকে না—তার বেশি আমরা প্রত্যাশাও করি না। প্রিচার্ড (Pritchard) ও স্মিথ (Alexandar smith) প্রবন্ধের মধ্যে গীতি কবিতার সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। একটু দীর্ঘ হ'লেও এখানে দুজনের মন্তব্যই প্রয়োজন বোধে উদ্ধৃত করছি। প্রিচার্ড প্রবন্ধ সম্বন্ধ আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন:

"So lyric and essay are both pre-eminently expressions of personality, but whereas one is the embodiment of rare moments of passion and exaltation, the other is the expression of those quiet every-day moods, when one is at leisure and peace, yet not all at ease……Just because it is so apt an expression of everyday personality, the essay is the most elusive of literary forms."

স্মিথ এই প্রসঙ্গে আরও একটু এগিয়ে গিয়ে বলেন—

The essayist is a kind of poet in prose, and if questioned harshly as to his uses, he might be unable to render a better apology for his existance than a flower might. The essay should be pure literature as the poem is pure literature. He plays with death as Hamlet plays with Yorick's skull, and he reads the morals which are folded up in the bosoms of roses.……He finds his way in to the Elysian fields through portals of the most shabby and common place.

গীতি কবিতায় রয়েছে অন্তরের তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম অনুভূতির উজ্জ্বল প্রকাশ—যা কবির ব্যক্তিত্বকে হঠাৎ অপূর্ব অদ্ভুত ঔজ্জ্বল্য দান করে। কিন্তু সাধারণ জীবনে এই তীব্র অনুভূতি সহজে ধরা দেয় না। প্রতিনিয়ত মানুষের জীবনে যে অনুভূতির প্রবাহ ব'য়ে চলেছে—তার তীব্রতা ততটা না থাকলেও জীবন ও জগতের বৈচিত্র্যানুভূতির বলিষ্ঠ ও সুন্দর প্রকাশ ঘটার আর একটি পথও

রয়েছে। সেই পথ—প্রবন্ধের পথ। সার্থকভাবে প্রকাশ করতে পারলে—অনুভূতিগুলিও শিল্পরূপ লাভ করতে পারে। এই অনুভূতি—মানুষেরই অনুভূতি। তাই রচনাতেও রচয়িতার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটবেই।

কাব্য, নাটক প্রভৃতি আমাদের জীবনের অনন্যসাধারণ মুহূর্তগুলিকে অপরূপ ক'রে তোলে। আর প্রবন্ধ-সাহিত্য জীবনের চলার পথের সাধারণ-অসাধারণ প্রত্যেকটি মুহূর্তকেই সুন্দর করে প্রকাশ করে। একটি ভাবের উর্ধ্বলোকে নিয়ে যায়। আর একটি সেই পথেরই মহিমা প্রকাশ করে। প্রবন্ধ যখন শিল্পরূপ লাভ করে তখন তার মধ্যে আমরা মামুলি বাঁধা ছক-কাটা কথা শুনতে চাই না—চাই আরও একটু বেশি। সেখানে শুধু কথা নয়—একটু সুরও যোগ করে দেওয়া হয়। খাঁটি প্রবন্ধের মধ্যে আমরা বস্তু-তান্ত্রিকতা এবং সম্পূর্ণতা ততখানি পাই না। লেখক প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ-ভাবে আলোচনা করলেন কিনা তা-ই বড়ো কথা নয়—রচনায় তাঁর মনের প্রতিক্রিয়া কতখানি সার্থকভাবে প্রকাশ পেল – তাঁর ব্যক্তিত্ব কতখানি ধরা পড়ল—তারই পরিচয় আমরা পেতে চাই। অভিজ্ঞতার গভীরে ডুব দিয়ে যিনি ডুবুরীর মতো মুক্তা আহরণ করে মালা গেঁথে উপহার দিতে পারেন—তিনিই খাঁটি সাহিত্যিক। এর জন্যে প্রয়োজন—আন্তরিকতা। হৃদয়ের গভীর থেকেই তার প্রকাশ।

পৃথিবীর সকল দেশের সাহিত্যের ইতিহাসে অন্যান্য সাহিত্যের বয়সের তুলনায় প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত কনিষ্ঠ। সাহিত্য-শিল্পীরা তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেননি। সেই জন্যে প্রবন্ধের অবস্থাও এক সময়ে ছিল অসচ্ছল মধ্যবিত্তের মতো। পরের দিকে আবার প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রাঙ্গনে অনেকে ভীড় জমালেন। আমাদের বাংলা সাহিত্যেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। প্রবন্ধের আদর্শও তার গঠন-রীতি আমরা ইংরাজী সাহিত্যের মাধ্যমেই পেয়েছি। আমাদের সাহিত্যে সবরকমের আলোচনামূলক রচনাই প্রবন্ধের এলাকায় ভীড় ক'রে আছে। এক সময়ে পাশ্চাত্যের সাহিত্যেও তাই ছিল। পরে সেখানে নানাজাতীয় প্রবন্ধরচনার বর্ণভাগ করা হয়েছে। সাহিত্যিক-প্রবন্ধগুলিকে সাধারণ প্রবন্ধ থেকে কিছুটা আলাদা ক'রে দেখা হয়। ইংরাজীতে বিভিন্ন জাতীয় প্রবন্ধের essay, treatise, discourse, dissertation,: criticism, study, article প্রভৃতি নানারকম নামকরণ হয়েছে। যে-সব আলোচনা impersonal নয় —যাতে লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটেছে—সেই ধরনের রচনাকে essay

বলা হয়েছে। আর অন্যান্য জাতীয় রচনাকে treatise, discourse, study, article ইত্যাদি বলা হয়েছে। সাময়িক পত্রের প্রবন্ধ-জাতীয় রচনাগুলি article নামে খ্যাত। আমাদের সাহিত্যে সবগুলিকেই 'প্রবন্ধ' নামে অভিহিত করা হয়। এ ছাড়া সন্দর্ভ, নিবন্ধ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হলেও সবই প্রায় সমার্থক হয়ে পড়েছে। আমাদের সাহিত্যেও নানা জাতীয় রচনার পৃথক নামকরণ প্রয়োজন। Subjective essay জাতীয় রচনাগুলিকে প্রবন্ধ বলাই শ্রেয়। অন্যগুলিকে বিচার, জিজ্ঞাসা, সমালোচনা প্রভৃতি নাম দিলে মন্দ হয় না। অনেকে ক্ষেত্রে এখন উল্লিখিত ধরনের নতুন নামকরণ হচ্ছে।

আমাদের স্কুল কলেজে essay বা প্রবন্ধ যেভাবে পরীক্ষা পত্রে লিখতে দেওয়া হয় তাতে পরীক্ষার্থীরা তার যথার্থ মূল্য নিরূপণ করতে পারে না। বিজ্ঞানের অগ্রগতি, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা,ধর্মঘট থেকে শুরু করে সাহিত্য ও সমাজ জীবন, বাংলা কাব্যে বর্ষাঋতু প্রভৃতি পর্যন্ত যে কোনো বিষয় নিয়ে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ বা নিবন্ধ লিখতে দেওয়া হয়। সেখানে কি প্রবন্ধ-শিল্পের পরিচয় চাওয়া হচ্ছে—না বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কতখানি জ্ঞান আছে তা চাওয়া হচ্ছে—না দু'টিই প্রত্যাশিত—এই প্রশ্নগুলি বিষম সমস্যার সৃষ্টি করে। এসব রচনায় লেখকের নিজের কোন পরিচয় এমন কি প্রবন্ধেরও কোনো বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রায় সবাই এক ধরনের লিখছেন। দৈবাৎ যদি বা কোনো নতুন ধরনের লেখা পাওয়া যায় তো—তাতেও বিপদ কম নয়। তথ্যকে অতিক্রম করে কোনো অভিনবত্ব এসে পড়লে সবাই মনে করবেন এ আবার কি বিপদ—পাঁচজনের পরিচিত চলার পথ ধ'রে কেন চলছে না! এখন এমন দাঁড়িয়েছে—আমরা স্বাতন্ত্র্যকে যেমন ভয় পাই—তেমনই অপর কারও মধ্যে তা দেখলে সন্দেহ করতে থাকি। কেউ মৌলিক কিছু বলার চেষ্টা করলেই—অমনি 'প্রশ্ন করি' প্রমাণ আছে কি!

বিশুদ্ধ সাহিত্যিক-প্রবন্ধের সার্থক পরিচয় আমরা রবীন্দ্রনাথের নানা রচনার মধ্যে পেয়েছি। তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধই বিশুদ্ধ সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে উঠেছে। এদের বলা যায়—সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্য, বিচিত্র প্রবন্ধ, সাহিত্য, সাহিত্যের পথে এমন কি পঞ্চভূতেও (short-story essay) এর সার্থক দৃষ্টান্ত মিলবে। মানুষের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সুন্দর আত্ম-প্রকাশকে যদি মেনে নিই—যদি তার পথে কোনো বাধা সৃষ্টি না করি—তাহলে প্রবন্ধ সাহিত্য ব্যক্তিত্বের সুন্দর ও সার্থক প্রকাশে আরও উৎকর্ষ

লাভ করবে সন্দেহ নাই। একমাত্র ভরসা যে বর্তমানে কোনো কোনো লেখক প্রবন্ধের এই সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন। অনেকের রচনা শুধু নির্ব্যক্তিক, নীতিগর্ভ আলোচনা-উপদেশেই পর্যবসিত হচ্ছে না। চিরকালের জীবন ও জগতকে তাঁরা নতুন করে দেখতে পান—সামান্যতম মুহূর্তের আনাগোনার পথের ধারেই তাঁদের সাধনা চলে। এই বাঞ্ছিত ফল-স্বরূপ আনন্দের যে শুভ প্রকাশ তা প্রবন্ধকে সার্থক শিল্প রূপে গ'ড়ে তুলবে—এরকম আশা করা নিতান্ত অন্যায় বা অযৌক্তিক হবে না।

সমালোচনার কথা ঃ

সম্যক্ দৃষ্টি না থাকলে সম্যক্ আলোচনা সম্ভব নয়। কিন্তু সম্যক্ দৃষ্টিও তো এ জগতে সুলভ নয়। তাই এই জগতের যতখানি রহস্য মানুষের কাছে ধরা পড়ে—ততখানির অনুভূতি ও জ্ঞানকে নিয়েই মানুষ তার অন্তর্জীবনকে গ ড়ে তুলছে। এই অন্তর্জীবনের প্রকাশ ঘটছে তার ধর্মে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, সাহিত্যে।

Mathew Arnold সাহিত্যকে criticism of life বলেছিলেন। মানুষের জীবনটাই একটা সমালোচনা—বিশ্বজীবন ও জগতের উপর যেন একটি মন্তব্য। মানুষ তার সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যে জীবন ও জগতকে দেখার বৈচিত্র্য ও পার্থক্যকে যুগে যুগে প্রকাশ ক'রে চলেছে। জীবনের প্রকাশ-বৈচিত্র্যে প্রায় সময়ই মৌলিক সত্যের ইঙ্গিত থাকে। মানুষ যতখানি দেখতে পায়, বুঝতে পারে—তাই নিয়েই সে 'সমগ্র'কে ধারণা করতে চায়। আমাদের যে সাহিত্য-সৃষ্টি—তা আমাদেরই জীবনকে সার্থক ক'রে প্রকাশ করবার ঐকান্তিক প্রয়াস নয় কি! সাহিত্যে সাহিত্যিকের জীবন সম্বন্ধে অনুভব ও জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে। সাহিত্যিকের দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্নতা ও গভীরতা তাঁর জীবনানুভূতির ফলস্বরূপ সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করে।

বিশ্ববৈচিত্র্যের মধ্যে যেমন সমন্বয়ের চেষ্টা রয়েছে ব্যক্তিজীবনেও তেমনই সমন্বয়ের চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায়। জীবনে যে অনুভূতি, যে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়—তাকে একটি বিশেষ রস-মাধুর্যে পরিপূর্ণ ক'রে সম্পূর্ণতা দান করার—অর্থের পরিপূর্ণতায় ভ'রে তোলবার প্রয়াস মানব জীবনে লক্ষিত হয়। বিশ্ববৈচিত্র্যের আড়ালে যে বিরাট 'এক' নীরবে কাজ করে চলেছেন—

তাঁর কাজের ছন্দের সঙ্গে মানুষ নিজের জীবনের ছন্দকে মিলিয়ে চলতে চায়। যে সত্য তার কাছে প্রতিভাসিত হয়—সেই সত্যের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের একটি আকুল প্রচেষ্টা মানব জীবনে লক্ষ্য করি।

কিন্তু বিশ্বজীবনের গতির ছন্দে, সুরের সঙ্গে আমাদের জীবনের ছন্দ, সুর কি সব সময় মেলে! মনে হয় মেলে না—এবং মেলে না বলেই তো জীবনের তার বেসুরো বেজে ওঠে—জীবনে দেখা দেয় নানা দ্বন্দ্ব সংঘাত ও বিশৃঙ্খলা। কিন্তু সব সময় সব মানুষের জীবনে যে বেসুরো বাজে তাও তো নয়—তা হ'লে সত্যের প্রকাশ-প্রয়াস যে ব্যর্থ হয়ে যেতো!

তাই দেখি ব্যক্তিজীবনে কখনও কখনও মুহূর্তের জন্যে হলেও সত্যের রূপটি ধরা পড়ে। যাঁরা সেই সত্যকে সাহিত্যে, শিল্পে প্রকাশ করেন—তাঁরা শুধু জীবনের আলোচনাই করেন না—জীবন সমালোচনাও করে থাকেন। এঁদের আমরা বলি স্রষ্টা—এঁরাও প্রত্যেকে আলোচক। তাঁদের বিশেষ দৃষ্টি ও অনুভূতিকে তাঁরা নিজেদের মন্তব্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁদের মন্তব্য রূপে রেখায়, সঙ্গীত মাধুর্যে অপূর্বতা লাভ করে। এঁদের মধ্যে যাঁরা সমালোচক—তাঁরা সেই অপূর্ব সৃষ্টিকে সত্যের কষ্টি পাথরে যাচাই করে নেন।

সাহিত্য স্রষ্টা গভীর ধ্যানদৃষ্টিযোগে সত্যকে লাভ করেন। গভীর অন্তর্দৃষ্টি থাকলে সাহিত্যিকের সৃষ্টি—সত্যরূপ লাভ করবেই। এ ছাড়া সত্যানুসন্ধানের আরও একটি পথ আছে—সে হচ্ছে অভিজ্ঞতার পথ। সেই পথে চলতে গেলে বুদ্ধি ও বিচারের প্রয়োজন। প্রত্যেক সাহিত্যিকের সৃষ্টি তাঁর বিশেষ মনোভাবের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে—এবং এই মনোভাব তাঁর সৃষ্টির মধ্যেও অনেকখানি ধরা পড়ে। কিন্তু বিশ্ব-সত্যের সঙ্গে তা কতখানি সম্পর্ক রেখে চলেছে—তার পরিচয়ের জন্যে সমালোচকের দ্বারস্থ হ'তে হয়। একমাত্র সমালোচকই সাহিত্যিকের আলোচনার বিষয়কে সমালোচনার দ্বারা আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তোলেন। সব সময় যে সাহিত্যিক বা তাঁর সৃষ্টির অখণ্ড পরিচয় আমরা তাঁর রচনার ভিতর থেকেই স্থূল ভাবেই পাব—এ মনে করা সঙ্গত নয়। এর জন্যে সমালোচকের পথ ধ'রে চলতে হবে। সেই পথ ধ'রে চললেই স্রষ্টার সৃষ্টির একটি সার্থক পরিচয় পাওয়া যেতে পারে।

মানুষ সমালোচনার ভিতর দিয়েই তার সংস্কারকে, বুদ্ধিকে, চিন্তাকে মার্জিত করে জীবনের পথে এগিয়ে চলেছে। বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের ইতিহাস থেকে এও আমরা জানতে পারি যে—সব দেশের সাহিত্যই বহুল পরিমাণে

আলোচনার সহায়তায় গ'ড়ে উঠেছে। আলোচনা মানুষের বুদ্ধিকে, বিচার শক্তিকে মার্জিত ও শাণিত ক'রে তোলে—জীবনে একটি গভীর রসবোধকেও জাগিয়ে তোলে। এই আলোচনা মানুষের জীবনে সাহিত্য সৃষ্টির তাগিদও এনে দেয়। সাহিত্যিক তাঁর শিল্পসৃষ্টির ভিতর দিয়ে পাঠকের চিত্তে যেমন সূক্ষ্ম রসবোধ জাগিয়ে তোলেন—তেমনই পাঠক আছেন ব'লেই সাহিত্য-শিল্পী বিশাল ও গভীর সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা লাভ করেন।

সাহিত্যে 'সমালোচনা' বলে যে কথাটি প্রচলিত—ইংরাজীতে তাকেই criticism বলা হয়। এই সমালোচনা বলতে গোড়াতেই আমরা ধ'রে নিই—সাহিত্য বিচারের এক ধরনের রীতি বা নিয়ম। একজন সমালোচকের কাজ হচ্ছে—তিনি কোনো লেখকের কোনো রচনা নিয়ে তার ভালো মন্দ বিচার করেন এবং শেষ পর্যন্ত তার ওপর একটা মন্তব্য করেন। কিন্তু সমালোচনা বলতে গেলেই শুধু কি এই বোঝায়! আরও একটু পরিষ্কার ক'রে বললে সমালোচনা কথাটির অর্থ হ'ল—কবিতা,নাটক, উপন্যাস প্রভৃতিতে মানব জীবনের নানাদিকের আলোচনা রয়েছে—সমালোচনা হচ্ছে ওই কবিতা, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতির বিশদ আলোচনা। ইংরাজ সমালোচকের মতে 'If creative literature may be defined as an interpretation of life under the various forms of literary art,critical literature may be defined as an interpretation of that interpretation and of the forms of art through which it is given.'

বর্তমান দিনে সমালোচনা কত রকমেরই হচ্ছে। কখনও লেখকের সমালোচনা—কখনও লেখকের রচনার সমালোচনা—কখনও বা সমালোচকের সমালোচনা। অনেক সময় এমনও হচ্ছে যে, অনেকে মূল গ্রন্থ না পড়ে সমালোচকের আলোচনা নার ওপর নির্ভর করেই ওই গ্রন্থ সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নেন। অনেকের মতে,গ্রন্থ সম্বন্ধে এই ধরনের অভিজ্ঞতা লাভের বিপদও কম নয়। সমালোচকের মনোভাবের দ্বারা অনেক সময় আমরা এতই প্রভাবিত হ'য়ে পড়ি যে, মূল গ্রন্থ বা,লেখক সম্বন্ধে আমরা নিজস্ব কোনো মত গ'ড়ে তুলতে পারি না। সমালোচনা সাহিত্য সম্বন্ধে উক্ত প্রকার একটা বিরুদ্ধ মনোভাব কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়। কিন্তু খাঁটি সমালোচনা সম্বন্ধে এইটুকু জোর ক'রে ক'রে বলা যায় যে, তা-ও কবিতা, নাটকের মতো creative literature-এর পর্যায়েই পড়ে। সাহিত্য জীবনকে কেন্দ্র ক'রেই গ'ড়ে ওঠে। এই কথাটি

মেনে নিয়েই যদি বলি—সমালোচকও যখন সাহিত্যে সাহিত্যিকের জীবন-প্রতিফলনকে আলোচনার দ্বারা আমাদের কাছে পরিস্ফুট করে তোলেন—তখন তিনিও কি সাহিত্য-স্রষ্টার পর্যায়ে এসে পড়েন না! তাঁর সঙ্গে কি তখন কবি, নাট্যকার বা ঔপন্যাসিকের কোনো পার্থক্য থাকে! তাই সমালোচকের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যকে আমাদের পক্ষে অস্বীকার করার কোনো সঙ্গত কারণ থাকে না—যখন তিনি যথার্থই বলেন—'True criticism also draws its matter and inspiration from life, and in its own way it is likewise creative.'

ওজন-ভারী সমালোচকদের নিয়ে অনেক সময় আমাদের বিপদে পড়তে হয়। আগেই বলেছি যে অনেকের সমালোচনার প্রভাব আমরা এড়াতে পারি না। এঁরা হচ্ছেন—তাঁরাই। তাঁদের মতামত ও সিদ্ধান্ত আমাদের ওপর এমন প্রভাব বিস্তার করে যে, আমরা সেই মতামত ও সিদ্ধান্তকেই আমাদের বলে মেনে নিতে বাধ্য হই। তখন যদি কোনো গ্রন্থ পাঠ করতে যাই —তার সম্বন্ধে নিজে কোনো মতামতও দিতে পারি না —এমন কি গ্রন্থখানিও সমালোচকের চোখ দিয়ে দেখি—তাঁর মন দিয়েই অনুভব করি। অনেকেই বলবেন যে এ ধরনের প্রভাব খুব স্বাস্থ্যকর নয়। এতে নিজের চিন্তার স্বাধীনতা একেবারেই থাকে না। আমরাও এই বিষয়ে দ্বিমত নই। তবে এই সঙ্গে এই কথাও ভেবে দরকার যে—জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই অন্যের অভিজ্ঞতার ওপরও অনেক সময় নির্ভর করতে হয়। এই বিশাল বিশ্বের কতটুকুই বা সারাজীবন ধ'রে জানতে পারি! প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যতই থাক না কেন—পরোক্ষ অভিজ্ঞতাও আমাদের জীবনে কম জায়গা জুড়ে নেই। একথা আমরা মেনে নিতে বাধ্য যে -কি সংস্কৃত, কি ইংরাজী, কি বাংলা—কি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অনেক সাহিত্য-রচনার সঙ্গেই প্রত্যক্ষ পরিচয় আমাদের ঘটেনি—এমনকি ক্ষুদ্র এ জীবনের মধ্যে আর নাও ঘটতে পারে। তখন সমালোচকের সমালোচনাই আমাদের একমাত্র ভরসা। তিনি নানা সাহিত্য, নানা শিল্পের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। অনেক সময় আমাদের ভ্রান্ত ধারণাকেও সংশোধন করে দেন। তাঁর সমালোচনার ভিত্তিতেই আমাদেরও বোধশক্তি ও রসদৃষ্টি জাগ্রত হয়।

সমালোচনা সার্থক হলে তার দ্বারা প্রভাবিত হওয়া তেমন কোনো দোষের নয়। সমালোচক কি করেন! তিনি গ্রন্থ ও গ্রন্থরচয়িতার শিল্পকৃতি ও

উদ্দেশ্যের গহনে প্রবেশ করেন। রচনায় সৌন্দর্য—তার গূঢ়ার্থ—তার উদ্দেশ্যকে আমাদের সামনে বিশ্লেষণ করে দেখান। তার সত্যরূপটি আমাদের সামনে তুলে ধরেন। এমন কি লেখক জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে, সংকেতে বা স্থূলভাবে যা বলেছেন—তাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। রচনার বিষয়বস্তু, তার উদ্দেশ্য—তার শিল্প রূপ—তাঁর বিচারে নতুন ভাব ও ভাবনা জাগায়। এইসব ভেবেই Walter Pater সমালোচকের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেছিলেন: ,To feel the virtue of the poet or the painter, to disengage it, to set it forth—these are the three stages of the critic's duty.' সাহিত্য সত্যের সমালোচনা করতে গিয়ে সমালোচক নিজের মনের মতো করেই তা করবেন। কখনও বা শুধু লেখকের বিশেষ গ্রন্থের আলোচনা করবেন—কখনও বা লেখকের অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে উক্ত গ্রন্থখানির তুলনামূলক আলোচনা করবেন অথবা সমসাময়িক বা আগে-পরের অন্যান্য লেখকের রচনার সঙ্গে তুলনা করেও আলোচনা করতে পারেন। কিন্তু যদি এমন হয় যে, সমালোচক বিশেষ কোনো কারণে বিশেষ কোনো লেখক বা তাঁর রচনা সম্বন্ধে সমালোচনা করতে গিয়ে তার উপযুক্ত মূল্য দিলেন না— বা তার ভুল আলোচনা করলেন—তখন সেই ধরনের সমালোচনা পাঠকের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়। অনেকে ইচ্ছা ক'রেই—ভালো জিনিসকেও মন্দ ব'লে রায় দেন। পাঠক যদি এই ধরনের সমালোচনার দ্বারা প্রভাবিত হন তা হ'লে পাঠকের গ্রন্থ সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞানও হবে না—সমালোচনাও সার্থক সমালোচনা রূপে স্বীকৃত হবে না। কারও হয়ত বিশেষ কোনো লেখক বা বিশেষ কোনো যুগের সাহিত্য সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ মনোভাব রয়েছে। স্বভাবত তাঁর সমালোচনাও অনেক সময় অপক্ষপাত হয় না। তিনি বিশেষ লেখক বা যুগের সবই ভালো দেখেন। লেখকের ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও তাদের যথাসম্ভব এড়িয়ে যান। হয়ত অনেক অখ্যাত লেখকও তার আলোচনায় প্রাধান্য লাভ করেন। এই ধরনের সমালোচনা অনেক সময় পাঠকের প্রভূত-ক্ষতিও করে।

সমালোচক কোনো রকম পক্ষপাতিত্ব না দেখিয়ে—সাহিত্য সমালোচনার সময় ভালো মন্দ দুইই বিচার করে দেখাবেন। যাঁরা গবেষণামূলক আলোচনা করেন—তাঁরা অনেক সময় নানা তথ্য পাঠকের সামনে তুলে ধরেন। মনে হয়, এখানেই তাঁদের কাজ শেষ হয়ে যায় না। তাঁরা আহৃত তথ্যকে শুধু গুছিয়ে না দিয়ে—কি আছে—কি হওয়া উচিত প্রভৃতি জিজ্ঞাসার সন্তোষজনক

উত্তর দিয়ে—তবে অব্যাহতি পেতে পারেন । যা আছে তাকে তিনি নিজের খেয়াল খুসিতে বিকৃত করে দেখাবেন না। একজন বিখ্যাত সমালোচকের মতে 'he must be disinterested and free from bias of all kinds—bias of individual tastes, bias of education, bias of creed, sect, party, class, nation.'

অনেক সময় সমালোচনা ক্ষেত্রে দু'টি ব্যাপার আমরা লক্ষ্য করি। কখনও সমালোচক শুভবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে নিষ্ঠাসহকারে সাহিত্য ও সাহিত্যিকের সমালোচনা করেন। কখনও আবার দেখা যায় যে, সমালোচক নিজের পাণ্ডিত্য, বুদ্ধির প্রাখর্য, চিন্তার গভীরতা পাঠকের সামনে তুলে ধরতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েন। এই ধরনের সমালোচনায় বিস্ময় থাকতে পারে, কিন্তু তার স্থায়ী কোনো মূল্য নেই। সমালোচকের দায়িত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন—তা আমাদের মেনে নিতেই হবে। তিনি বলেন—'যেমন সাহিত্যের রচনায় এক একজনের প্রতিভা সর্বকালের প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করে, সর্বকালের আসন অধিকার করে, তেমনি সমালোচকের প্রতিভাও আছে। এক একজনের পরখ করিবার শক্তিও স্বভাবতই অসামান্য হইয়া থাকে। যাহা ক্ষণিক, যাহা সংকীর্ণ, তাহা তাঁহাদিগকে ফাঁকি দিতে পারে না,—যাহা ধ্রুব, যাহা চিরন্তন, এক মুহূর্তেই তাহা তাঁহারা চিনিতে পারেন। সাহিত্যের নিত্যবস্তুর সহিত পরিচয় লাভ করিয়া নিত্যত্বের লক্ষণগুলি তাঁহারা জ্ঞাতসারে এবং অলক্ষ্যে অন্তঃকরণের সহিত মিলাইয়া লইয়াছেন—স্বভাবে এবং শিক্ষায় তাঁহারা সর্বকালীন বিচারকের পদ গ্রহণ করিবার যোগ্য।'

'আবার ব্যবসাদার সমালোচকও আছে। তাহাদের পুঁথিগত বিদ্যা। তাহারা সারস্বত-প্রাসাদের দেউড়িতে বসিয়া হাঁকডাক, তর্জন গর্জন, ঘুষ ও ঘুষির কারবার করিয়া থাকে—অন্তঃপুরের সহিত তাহাদের পরিচয় নাই। তাহারা অনেক সময় গাড়িজুড়ি ও ঘড়ির চেন দেখিয়া ভোলে।...তাহারা পোষাক চেনে, তাহারা মানুষকে চেনে না। তাহারা উৎপাত করিতে পারে, কিন্তু বিচার করিবার ভার তাহাদের উপর নাই।'

সমালোচনা ক্ষেত্রে একই বিষয় নিয়ে অনেকেই নানা মন্তব্য করে থাকেন। অনেক সময় কোনো বিষয়ের সমালোচনার সমালোচনাও হয়ে থাকে। এই ধরনের সমালোচনা দোষের নয়। প্রত্যেক সমালোচকের নিজস্ব মতামত আছে এবং তিনি তাঁর মতামত দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করতে পারেন। তাঁর

সেই মত বা সিদ্ধান্ত চরম বলে স্বীকার করা হয় না বলেই—আবার সেই বিষয়ের নতুনভাবে আলোচনা হয়। সমালোচনা ক্ষেত্রে এরকম হওয়াই স্বাভাবিক।

ইংরাজি সাহিত্যে সমালোচনা ধারা অনেক কাল থেকেই চলে আসছে। জনসন, ফ্রান্সিস জেফ্রে, সিডনি স্মিথ, গিফোর্ড, লকহার্ট, হ্যাজলিট, ল্যাম, কোলরিজ, হাণ্ট, ডি-ক্যুইন্সি, কার্লাইল প্রভৃতির নাম সমালোচক হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমাদের সাহিত্যে উন বিংশ শতাব্দী থেকে সাহিত্য-সমালোচনা শুরু হয়। সাহিত্য সমালোচক হিসাবে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, রামগতি ন্যায়রত্ন, চন্দ্রনাথ বসু, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি অনেকেই বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন রবীন্দ্রনাথ—সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি এক বিশেষ রীতির উদ্ভাবক। তাঁর সমালোচনার বৈশিষ্ট্য—তাঁর কথাতেই বলা যায়—তা বিশ্লেষণ নয়—ব্যাখ্যা। তার পরে প্রমথ চৌধুরী, মোহিতলাল থেকে আরম্ভ করে বর্তমান কাল পর্যন্ত অনেক সমালোচকের রচনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত। এর মধ্যে দুর্বল সমালোচনা যে নেই তা বলি না—তবে অনেক সমালোচনাই খুবই আশাপ্রদ। বর্তমানে অনেকে বিজ্ঞান-সম্মত দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তিনিষ্ঠা নিয়ে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনাও করছেন। তবে অনেক আলোচনাকে যথার্থ সাহিত্য সমালোচনা বলা যায় না। বাংলা-সমালোচনা ক্ষেত্রে এমন এক ধরনের তরল সমালোচনা এখন দেখা দিয়েছে—যার জীবৎকাল মৌসুমী ফুলের মতো। চটক আছে—কিন্তু স্থায়িত্ব নেই। অথচ আমরা সমালোচনা সাহিত্য বলতে স্থায়ী সাহিত্য-কর্মকেই বুঝি—যার সঙ্গে কাব্য নাটক উপন্যাস প্রভৃতির আকৃতি ও প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকলেও—তাদের মতোই তার শিল্পকৃতি ও রসরূপকে আমরা অকুণ্ঠায় মেনে নিই।

ব্যঙ্গকৌতুক ও হাস্যকৌতুক ঃ

উল্লিখিত নামকরণ নিয়ে অনেকে হয়ত ভাববেন আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি—পূর্বাহ্নেই তার বর্ণভাগ করা হয়েছে। এই ভাবনা আংশিক ভাবে সত্য। আমরা Wit ও Humour এবং তাদের কাছাকাছি অন্যান্য বিষয়ের স্বরূপ নির্ধারণের একটা চেষ্টা করছি। সাহিত্যে রতি, হাস, করুণ প্রভৃতি নানা রসের প্রয়োগ ঘটে। প্রত্যেকটি রসের মধ্যে দিয়েই আমরা আনন্দ রসের লাভ করে থাকি। হাস্যরসও এক ধরনের রস যা আমাদের নির্দোষ প্রীতি লাভের সহায়ক। জীবজগতে মানুষই একমাত্র হাসতে জানে। অন্যান্য জীবের মধ্যেও এক প্রকার অনুভূতি কিংবা এক প্রকার সংস্কার যে নেই তা নয়—তবে জীবনের হাস্যকর অস্বাভাবিকতা ও অসঙ্গতির ভেতর থেকে আমোদ পাবার মতো রসবোধ (sense of humour)—একমাত্র মানুষের মধ্যেই আছে।

জীবনের নানা হাস্যকর অসঙ্গতি-জাত হাস্যরস মানব সভ্যতার গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দিয়েছে বলে মনে হয় না। মানুষ যখন থেকে সামাজিক হিসাবে পরিচিত হলো—তখন থেকেই তার এই রসবোধ হয়ত দেখা দিয়েছিল। সামাজিক মানুষের জীবনে তখন নিজের আত্মীয়স্বজন বা প্রতিবেশীর নানা রকম হাস্যকর অসঙ্গতি, স্বাভাবিক নিয়মের হাস্যকর ব্যতিক্রম, বোকামী প্রভৃতি হাসির কারণ হতো। এই ধরনের অসঙ্গতি প্রভৃতির জন্যে হয়ত তারা পরস্পরকে নিয়ে মজা করত। সাহিত্য সৃষ্টির পর থেকে এই রসবোধ সাহিত্যেও স্থান পায়। আদি মহাকাব্যগুলিতেও কতকগুলি চরিত্র হাসির খোরাক জুগিয়েছে। তবে তা অনেক সময় স্থূল কমিক (comic) পর্যায়ে এসে পড়েছে। প্রাচীন দিনের নাটকেও এই হাস্যরসের অবতারণা ঘটেছে। প্রথম দিকে ব্যক্তিগত খোলাখুলি বিদ্রূপ—ব্যঙ্গ কৌতুকের (satire ও fun) মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। তারপর থেকে হাস্যকর ভ্রান্তি প্রভৃতি হাস্যরসের রসদ জোগায়।

জীবনের হাস্যকর অসঙ্গতি থেকেই হাস্যরসের উৎপত্তি। কিন্তু যিনি:খাঁটি হাস্যরসিক হবেন—তাঁর উদার জীবনদৃষ্টি না থাকলে চলে না। হাস্যরসিক জীবনের অসঙ্গতির বিরুদ্ধে কোনো তীব্র অভিযোগ নিয়ে হাস্যরসের সৃষ্টি করেন না। তিনি শুধু জীবনের হাস্যকর ব্যতিক্রমগুলির দিকে আমাদের দৃষ্টি

আকর্ষণ করেন। ইংরাজিতে আমরা Fun, Wit, Humour, Satire, Irony, Jest, Ridicule প্রভৃতি অনেকগুলি শব্দ হাস্যরসের বিভিন্ন প্রকৃতি বোঝাবার জন্যে ব্যবহৃত হয়। বাংলাতেও হাস্যকর ব্যাপার বোঝাবার জন্যে—কৌতুক, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, ঠাট্টা, রসিকতা, হাসির কথা, মজা প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। সাহিত্যক্ষেত্রে আমরা সাধারণত fun, wit, humour, satire, irony কথাগুলি বেশি ব্যবহার ক'রে থাকি। প্রত্যেকটি শব্দের অর্থগত ও গুণগত পার্থক্য রয়েছে। এর মধ্যে fun অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের। একটি উদগ্র শক্তি, স্বাস্থ্যকর ও সুস্থ মন ও আপেক্ষিক লঘুতা বা স্ফূর্তি fun-এর মধ্যে থাকে। Wit এক ধরনের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গ। সংস্কৃত-মার্জিত-তীক্ষ্ণবুদ্ধিদীপ্ত বাকচাতুর্য Wit-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। Satire ও Irony এদের চেয়ে একটু আলাদা—ঐ দু'য়ের মধ্যে তেমন কোনো আমোদ বা তামাসার ব্যাপার থাকে না—তাতে wit-এর বুদ্ধিদীপ্ত হাসি থাকে না। তার উদ্দেশ্য একটু অন্য ধরনের। কবি-সমালোচক মোহিতলাল বলেন, "উভয়ের অভিপ্রায়—বিদ্রূপ; কিন্তু তফাৎ এই যে—Satire খোলাখুলি বিদ্রূপ, Irony চাপা বিদ্রূপ; ইহাতে একটি বক্র-ভঙ্গি বা শ্লেষ থাকে; আবার শ্লেষের কারণ অনুসারে Ironyর প্রকার ও মাত্রাভেদ ঘটে। Satire স্পষ্ট ও খোলাখুলি বিদ্রূপ হইলেও, ইহা যখন একটু বক্রভঙ্গিযুক্ত হয়, তখন ইহাকে Sarcasm বা টিটকারী বলা যাইতে পারে; তখনও কিন্তু ইহা Irony নয়…।' আগে যে Jest কথাটি বলেছি—তাকে এক কথায় ভাঁড়ামিই বলা যেতে পারে। কিন্তু humour কথাটি বিশুদ্ধ হাস্যরস বোঝাবার জন্যেই ব্যবহৃত হয়। এই humour-কেই deepest form of laughter বলা হয়েছে। গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সহানুভূতি থেকেই এর উৎপত্তি। হাসি ও কান্নার সীমান্তের ব্যাপক ও গভীর অভিজ্ঞতা থেকেই তার সার্থক প্রকাশ।

বিশেষ অথচ উদার মনোভাব—বিশেষ অথচ উদার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশুদ্ধ হাস্যরসের উৎপত্তি। এখানে হাস্যরসিক স্রষ্টার ভূমিকায় অবতীর্ণ। তিনি মানব জীবনের অসামঞ্জস্য, অস্বাভাবিক আতিশয্য, বোকামী, আত্মম্ভরিতা, অতিরিক্ত লোভ প্রভৃতি দেখে—কোনোরকম উত্তেজিত বা বিক্ষুব্ধ না হ'য়ে—মানুষের ঐসব ত্রুটি নিয়ে যখন হাস্যরস সৃষ্টি করেন তখনই তা homour হয়ে ওঠে। জগৎ ও জীবনের প্রতি স্রষ্টার একটি সহৃদয় মনোভাব থাকতে হবে। হাস্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করতে গিয়ে হাস্যরসিক কখনও এমন কিছু সৃষ্টি

করবেন না যার মধ্যে আঘাত আছে, আক্রোশ আছে। আবার এই হাস্যরস বা humour যিনি উপভোগ করবেন—তাঁরও উপভোগ করার মতো ক্ষমতা থাকা চাই। এই ক্ষমতাকে বলা যাক—রসবোধ। হাস্যরসিক ও রস-ভোক্তা দুইজনের পরিমিতি বোধও থাকা চাই। মাত্রা অতিক্রম করে গেলে খাঁটি humour হবে না। আবার অন্যদিকে হিউমারের মধ্যে যে হাসি ও অশ্রুর একটা নিকট-সম্পর্কের কথা পূর্বে বলেছি—তারও ভারসাম্য বজায় না থাকলে humour-ই নষ্ট হ'য়ে যায়। হৃদয়াবেগের মাত্রা যেন বেড়ে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। হাস্যরসিক জীবনকে জ্ঞানের আলোকে বেশ ব্যাপক ও গভীর ভাবে দেখতে পান। তিনি কবি না হলেও কবিদৃষ্টি তাঁর আছে। তবে তাঁর আবেদন বুদ্ধির কাছেই বেশি। Wit এবং humour—দুইই জীবনের অসঙ্গতি হেতু কৌতুকহাস্যের এক এক ধরনের অভিব্যক্তি। এই দুয়ের পার্থক্য দেখাতে গিয়ে জি, কে, চেষ্টারটিন বলেন, The man who sees the consistancy in things is a wit……the man who sees the inconsistancy in things is a humourist.' এখানে consistancy in things বলতে— আপাত সম্পর্কহীন ভাবনা বা বিষয়ের মধ্যে হঠাৎ কোনো সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া এবং বাক্‌বৈদগ্ধ্যের দ্বারা তাকে প্রকাশ করার মধ্যে Wit এর পরিচয়কেই বোঝাচ্ছে। আর inconsistency in things অর্থে কর্মে ও চিন্তায়, কর্মে ও ব্যবহারে বৈসাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া এবং তাকে সহৃদয়তার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করার মধ্যে humour-এর পরিচয়কেই বোঝায়। Wit-এর যে বুদ্ধিদীপ্ত প্রকাশ দেখতে পাই—তা আমাদের সচকিত করে তোলে। কিন্তু humour আমাদের চিত্তকে কিছুটা ব্যথিত ও অশ্রুসজল ক'রে তোলে। Wit ও Humour সম্বন্ধে ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মন্তব্যটি প্রনিধানযোগ্য। নানা বিচার বিতর্কের পর wit ও humour সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হয়েছে,তার সম্বন্ধে তিনি বলেন, 'Wit হইতেছে বুদ্ধির তরবারি খেলা, নিঃসম্পর্কিত বস্তু বা চিন্তার মধ্যে বিদ্যুৎ ঝলকের ন্যায় অতর্কিত সাদৃশ্য আবিষ্কার,—humour-এ বুদ্ধির তীব্র দীপ্তির সহিত সহানুভূতির করুণ শীতলস্পর্শের এক প্রকার অপরূপ সম্মিলন, মুখের হাসি ও চোখের জলে মিশিয়া এক প্রকার অপূর্ব ইন্দ্রধনুর বর্ণ-বৈচিত্র্য সৃষ্টি; Wit-এ বুদ্ধির স্বচ্ছন্দলীলা আমাদের চোখ ধাঁধাইয়া দেয় ও সপ্রশংস বিস্ময়ের উদ্রেক করে।…ইহার ঘাত-প্রতিঘাতে কতকটা দ্বৈরথযুদ্ধের নির্মম শক্তি

বিকাশের পরিচয় মেলে—ইহার আক্রমণে এক প্রকার নিষ্ঠুরতা, মানুষের সুকুমার ভাবপ্রবণতার প্রতি একটা উদ্ধত ঔদাসীন্যের সুর ধ্বনিত হয়। humourএর গভীর সহানুভূতি বুদ্ধির তীক্ষ্ণ চোখ ঝলসান চাকচিক্যের উপর একটা স্নিগ্ধ শ্যাম আবরণ পরাইয়া দেয়।' উদাহরণ স্বরূপ সেক্‌স্‌পীয়রের প্রথম যুগের নাটক ও রেষ্টোরেশন যুগের নাটককে তিনি Wit-এর পর্যায়ে ফেলেছেন, আর সেক্‌স্‌পীয়রের শেষ বয়সের নাটক ও ল্যাম-এর রচনাকে humour-এর দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রহণ করেছেন। humour প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, এর গভীর আবেদনের একটি কারণ এই যে, 'ইহার পশ্চাতে একটা বিশিষ্ট মনোবৃত্তি, জীবন সমালোচনার একটি মৌখিক, গতানুগতিকতা-বর্জনকারী ভঙ্গির পরিচয় মিলে। দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে জীবনের যে সমস্ত বৈষম্য ও অসঙ্গতির সম্বন্ধে আমাদের মন অসাড়, অচেতন হইয়া পড়িয়াছে, আমাদের চিরাচরিত জীবন যাত্রার মধ্যে যে সমস্ত বিচার-বিভ্রম ও ভ্রান্ত মতবাদ অখণ্ডনীয় সত্যের মতো দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, humourist-এর হাসির খোঁচা এক ঝলক অতর্কিত আলোকের মতো সেই সমস্ত ভ্রান্তি ও অসঙ্গিতকে এক মুহূর্তে সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল করিয়া তোলে……। Humourist তাঁহার হাসির সাহায্যে আমাদের বুঝাইয়া দেন যে, যেখানে আমরা গম্ভীর সেখানে আমরা হাস্যাস্পদ, যাহা আমাদের নিকট উপহাস্য, তাহা প্রকৃতপক্ষে সহানুভূতির অধিকারী।'

Wit-এর তীক্ষ্ণতা বাক্‌বৈদগ্ধ্যে। সেখানে আমরা একটি মার্জিত বুদ্ধির পরিচয় পাই। কিন্তু হাসির ভিতর দিয়ে অন্যকে বিদ্রূপ করা—বাইরে হাসি থাকলেও যেখানে ভিতরে আঘাত থাকে—সেই ধরনের হাসিকে আমরা শ্লেষ বিদ্রূপ বলতে পারি। মানুষের ত্রুটি বিচ্যুতিকে নির্মমভাবে কষাঘাত করাই এই ধরনের আপাতহাস্য-বিদ্রূপের বৈশিষ্ট্য। একজন ইংরাজ সমালোচক এই ধরনের শ্লেষ বিদ্রূপ সম্বন্ধে বলেন—

'Folly is the natural prey of the Comic spirit, known to it in all her transformations, in every disguise; and it is with the springing delight of hound after fox, that it gives her chase, never fretting, never tiring, sure of having her, allowing her no rest.'

এই ধরনের হাসির ব্যাপারের সঙ্গে খাঁটি humour-এর কোনো সম্পর্ক

নেই। Humour-এর মধ্যে করুণ রস সহজেই স্থান পায়। কিন্তু তার মাত্রা ছাড়ালেই বিপদ—তাহলেই আর humour হবে না। একটা নির্লিপ্ততা বা উদাসীনতা না থাকলে humour-এর সহজ প্রকাশে বাধা দেখা দেয়। Emotion ব্যাপারটা হাস্যরসের প্রধান অন্তরায়। যাকে নিয়ে বা যে বিষয় নিয়ে আমরা হাসছি—তার প্রতি সহানুভূতি থাকবে না একথা বলি না—কিন্তু যদি সেখানে emotion-এর মাত্রাধিক্য ঘটে যায়—যিনি humour সৃষ্টি করছেন বা যিনি humour-রস উপভোগ করবেন উভয়েই যদি বেশি sentimental হন—তাহলে খাঁটি humour সেখানে পাওয়া যাবে না। সেক্‌স্‌পীয়র, ল্যাম্‌, ডিকেন্স, মার্ক টোয়েন প্রভৃতির রচনায়—আমাদের দেশে দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার, শরৎচন্দ্র, রাজশেখর বসু প্রভৃতির রচনায় এই ধরনের humourএর পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য এঁদের অনেকে ররচনায় wit এবং প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ বিদ্রূপ যে নেই তা নয়।

দীনবন্ধুর রচনায় humour সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাতেও এই humour-এর উজ্জ্বল নিদর্শন রয়েছে। তবে তাঁর কোনো কোনো রচনাতে wit ও satire-এর পরিচয়ও পাওয়া যায়। 'কমলাকান্তের দপ্তর,' 'লোক রহস্য' প্রভৃতিতে তাঁর হাস্যরস, বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গ এবং স্পষ্ট ও চাপা বিদ্রূপের সার্থক পরিচয় পাওয়া যায়। 'কমলাকান্তের দপ্তরের' ঢেঁকি, বড় বাজার প্রভৃতি প্রবন্ধের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ রয়েছে। 'লোকরহস্যের' বাবু, গর্দভ, বাংলা সাহিত্যের আদর প্রভৃতি রচনাতেও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ রয়েছে। অন্য দিকে কমলাকান্তের উদরসর্বস্বতা, প্রসন্ন গোয়ালিনীর সঙ্গে তার সম্পর্ক, জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে তার মনোভাব—বাস্তব জগতের সঙ্গে তার অসঙ্গত হাস্যকর সম্পর্ক প্রভৃতি আমাদের মনে যে হাস্যরসের সৃষ্টি করে—তাকেই আমরা humour বলি। কমলাকান্ত রসিক ব্যক্তি। তিনি রসিকতা করাও ভালোবাসেন—তা সে রসিকতা নিজেকে নিয়েই হোক কিংবা অন্য কাউকে নিয়েই হোক। বিড়াল, প্রসন্ন,ডিউক অব ওয়েলিংটন—সবই তাঁর কাছে যেন এক সূত্রে গাঁথা। হিউমার-বোধেই তিনি জীবন দর্শনের বড়ো বড়ো কথা বলে যান—আবার সাধারণ ব্যাপারকেও অসাধারণ ক'রে তোলার হাস্যকর প্রয়াস পান। বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক উপন্যাসেও এই ধরনের সরস কৌতুকপ্রদ বর্ণনা রয়েছে। তাঁর বিদ্যাদিগগজ (দুর্গেশনন্দিনী) প্রভৃতি চরিত্র তার সার্থক দৃষ্টান্ত। Humour-এর বেদনাবোধ Cervantes-এর Don Quixote-

এও পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের রচনায় humour ও wit—দুই ধরনের হাসির খোরাকই পেয়েছি। বৈকুণ্ঠের খাতায় humour উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত আবার চিরকুমার সভায় wit-এর ছড়াছড়ি। প্রভাতকুমারের রচনায় humour-লক্ষণই বেশি। তাঁর উপন্যাস, ছোট গল্প প্রভৃতির মধ্যে যেগুলি humour-লক্ষণযুক্ত—সেগুলিই আমাদের কাছে বেশি উপভোগ্য। যেখানে তিনি-গম্ভীর হ'তে চেষ্টা করেছেন—সেখানে তিনি তেমন সার্থকতা লাভ করেননি। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কেউ কেউ বলেন যে, তাঁর রচনার মধ্যে humour-এর চেয়ে ironyর ভাগই বেশি—কারণ তিনি একটু বেশি sentimental হয়ে পড়ায় খাঁটি হিউমার সৃষ্টি করতে পারেননি। আমাদের মনে হয়—তাঁর রচনায় irony ও যেমন আছে—তেমনি humour-ও রয়েছে। 'দেনাপাওনার' শিরোমণির নিষিদ্ধ মাংস জোর ক'রে খাইয়ে দেবার ভয়, 'বামুনের মেয়ের' সন্ধ্যার বাবার ক্যাষ্টর অয়েল খাওয়া, শ্রীকান্তের গহর চরিত্র প্রভৃতিতে humour-এর লক্ষণ সুস্পষ্ট। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনায় humour ও wit দুইই পাওয়া যায়। রাজশেখর বসু মহাশয়ের (পরশুরাম) রচনায় wit'ও আছে—satire'ও আছে। তবে satireএ যে তীক্ষ্ণতা থাকে—তাঁর রচনায় ততটা নেই। তাছাড়া জীবনের হাস্যকর অসঙ্গতি জনিত কৌতুকোচ্ছল হাসির ছবিও তিনি সার্থকভাবে অঙ্কন করেছেন। বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের নতুন সংস্করণ পেলাম রাজশেখর বসু মহাশয়ের রচনায়। এর অনেক আগে এমন কি বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ থেকেই মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র এবং অন্যান্য মঙ্গলকাব্য রচয়িতাদের রচনাতেও হাসির খোরাক পেয়েছি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে কবিওয়ালারা, উনবিংশ শতাব্দীতে ঈশ্বর গুপ্ত, পরের দিকে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকের রচনায় আমরা নানা প্রকারের হাসির রসদ পেয়েছি। কোথাও স্নিগ্ধোজ্জ্বল হাসি—কোথাও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ, কোথাও হিউমারের প্রসন্ন রূপ, কোথাও বা বুদ্ধিদীপ্ত মার্জিত বাকচাতুর্য। বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের রসদ প্রখ্যাত লেখকদের রচনায় পাওয়া গেলেও মনে হয়—বাঙালীর সামাজিক, আর্থিক, রাজনীতিক পরিবেশ হাস্যরস রচনার প্রেরণা বা অবকাশ তেমন এনে দিতে পারেনি। তাই এখনও এই ধরনের রচনার ক্ষেত্র—শিল্পী-বিরল বললে অত্যুক্তি হবে না।
